তরুণের স্বপ্ন

(প্রথম পর্ব্ব)

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

বৈশাখ—১৩৫৩

চলন্তিকা নাটক-নভেল এজেন্সি
২১৬, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীঅসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়
ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী
২১৬, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

দাম ৩॥০ টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দীপালী প্রেস
১২৩/১ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা।

জয়হিন্দ্!

অনেকের ধারণা,

নেতাজী বেঁচে আছেন।

এই উপন্যাসে—

সেই চির-অমর ও চির-তরুণ দেশ-প্রেমিকের—

দীর্ঘজীবন কামনা করি!

তরুণের স্ব[illegible]

এক

তরুণ দেশোদ্ধারের [illegible] এম, এ, কিন্তু তার টেবিলে [illegible] একে অনেকগুলি ইতিহাসের বই [illegible] ফরাসীর বিপ্লব, রাশিয়ার বলশেভি[illegible]

[illegible] অরুণ। সে পড়ে মেডিক্যাল [illegible] পরীক্ষা দিয়েছে এবার—ফলাফল জান্‌তে পা[illegible]

[illegible] তরুণ ও অরুণ ছিল—উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু। বাইরের [illegible]-বিতর্কে তারা যতই বিরোধিতা করুক—ভিতরের বন্ধুত্ব ছিল তাদের অতি প্রগাঢ়, মর্ম্মপ্রধান। সজীব ও স্বচ্ছন্দ বিরোধিতার জন্যেই বোধ হয় তারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট থাকতো।

তরুণ ভাব্‌তো—দেশের কথা আগে, নিজের কথা পরে। অরুণ ভাব্‌তো—নিজের কথা আগে, দেশের কথা পরে।

তরুণ বল্‌তো—পরাধীন দেশে মানুষ তৈরি হয় না। অরুণ বল্‌তো—এমন অনেক মানুষ তৈরি হয়েছে—যারা স্বাধীন দেশের

যে-কোনো মানুষের চেয়ে খাটো নয়। তরুণের দাবী—জাতির মুক্তি; অরুণের দাবী—ব্যক্তির উন্নতি। মোটের উপর এই দুই মতবাদের মূলসূত্রে কোনো সত্যিকার বিরোধ ছিল না বলেই, বোধহয় তাদের [illegible] তায় কোনো বিচ্ছেদ ঘটেনি।

[illegible] য়ালাবাগের পর—গুর্জ্জর-কেশরী আস্‌ছেন বাংলা [illegible] আন্দোলনের বাণী নিয়ে। তরুণ ও অরুণ জনাকী [illegible] জড়িয়ে আছে। গান্ধীজী নাব্‌লেন—এক [illegible] তরুণ অপলকচোখে দেখ্‌তে লাগলো তার [illegible]

অরু [illegible] দেখছিস্ তরুণ ?

চমক ভেঙে [illegible] বিস্ময়!

—তার মানে ?

—ওই তো তালপাতার [illegible]

দুই বন্ধু কথা বল্‌ছিল—ফিস্ ফিস্ [illegible]
ব'লে উঠলো—তেজস্বিতাই মানুষকে 'মানুষ' [illegible] যদি আজ তোমাদের মত তরুণদের প্রাণে প্রাণে [illegible] জেলে দিতে পারে—তা'হলে ভারতের পরাধীনতা দুঃস্বপ্ন!

তরুণ বিস্মিতভাবে চেয়ে দেখ্‌লো—লোকটির মাথাভরা দুধের মত সাদা চুল। হাতে একটা ত্রিভঙ্গ পাহাড়ীবেতের লাঠি। বয়সের ভারে মেরুদণ্ড একটু বাঁকা হ'য়ে নুইয়ে পড়লেও—শারীরিক দুর্ব্বলতার কোনো চিহ্ন নেই। হাত ও পায়ের মোটা হাড়গুলি সুস্থ ও সবল মাংসপেশী দিয়ে জড়ানো। তার উপর দিয়ে ভেসে উঠেছে যৌবনো[illegible]

রক্তচাঞ্চল্যের সাক্ষীরূপে মোটা মোটা শিরাগুলি। পরিধানে একখানা ছোট খদ্দরের ধুতি—কাঁধে একটা মোটা খদ্দরের চাদর।

তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—কে আপনি?

বৃদ্ধ সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে, অরুণের দিকে চেয়ে বললেন—তোমার বন্ধু তরুণকে আমি দেখেই চিনে ফেলেছি কিন্তু! ভুল করিনি তো?

তরুণ বললো—আমি তো আপনাকে চিনতে পারলাম না?

একটু হেসে বৃদ্ধ বললেন—কি করে চিনবে দাদু? পঁচিশ বছর আমি নিরুদ্দেশ! আমার নাম অবিনাশ রায়। তোমার মা ছিলেন আমারি মেয়ে…

—ও—দাদু! তরুণ পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো।

—বেঁচে থাকো ভাই!

—আমরা তো জানতাম……

কথাটা সম্পূর্ণ বলতে তরুণ একটু ইতস্তত করছিল। হো হো ক'রে খুব খানিকটা হেসে রায়মশাই বললেন—তোমরা জানতে যে আমি মারা গেছি? সে কথাটা মিথ্যে নয় দাদু! লোকে যাকে 'ফুলবাবু' ব'লে ডাকতো—যাঁর জুতো ছিল চোদ্দ জোড়া—আর সেই জুতো-ঝাড়া, জামা-গিলে-করা, আর কাপড়-কোঁচানোর জন্যে একজোড়া ছিল চাকর—তার এই খালি পা আর খদ্দরের ধুতি কি মৃত্যুর চেয়েও বেশী নয়?

তরুণ বললো—আপনাকে আমি দেখিনি কখনো…

রায়মশাই হেসে বললেন—আমিও তো কখনো দেখিনি তোমাকে! তবুও এই জনসমুদ্রে চিনে ফেললাম কি করে বলো তো?

—কি জানি, তাতো ঠিক বুঝতে পারছিনে…

—তোমার ওই চোখেমুখে তোমার মার চেহারার অতি পরিষ্কার একটি ছাপ্ আছে। বৃদ্ধের চোখদুটি সজল হয়ে উঠ্‌লো। চোখ মুছে বল্‌তে লাগ্‌লেন—তোমাদের যে প্রফেসরটি সেদিন মারা গেলেন, তার কাছে জেনেছি তোমার সব খবর। তার ছেলে শৈলেনকেও তো তুমি চেন ?

—হ্যাঁ চিনি…

—তোমার এই বন্ধুটি 'তরুণ' বলে ডাকতেই, আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। শৈলেনদের বাড়িতে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়।

তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—দেশে একবার যাবেন না দাদু ?

রায়মশাই খুব সহজভাবে বল্‌লেন—নিরুদ্দেশ হয়েছি ব'লে দেশের বাইরে তো কোথায়ও যাইনি ভাই। ছোট দেশটাকে একটু বড় ক'রে দেখে নিয়েছি মাত্তর। গঙ্গা পার হয়ে এই হাওড়া-ষ্টেসানে কখনো আসিনা। তার কারণ, তোমার মাকে মনে পড়ে। বড্ড কষ্ট হয়। আচ্ছা, আজ তা'হলে আসি ? কালই একবার দেখা করো আমার সঙ্গে, শৈলেনদের বাড়িতে। অনেক জরুরী কথা আছে। সকালের দিকে। যাবে তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবো…তরুণ আবার তাঁর পাছুঁয়ে প্রণাম করলো। রায়মশাই চলে গেলেন।

অরুণ কেন-যেন একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিল। তার সে অন্যমনস্কতার কারণ তরুণ ঠিক্ বুঝ্‌তে পারলো না। তবু জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা অরুণ! আমার দাদুকে যে তুই চিন্‌তিস্—সে কথা তো কখনো বলিস্‌নি আমাকে ?

—ওই অদ্ভুত লোকটি যে তোর দাদামশাই, তা' আমি জানবো কি ক'রে ?

—তা' বটে। সত্যিই লোকটি খুব অদ্ভুত!

মহাত্মা গান্ধী বহুক্ষণ ষ্টেসান থেকে বেরিয়ে গেছেন। তরুণ ও অরুণ ফিরে এলো তাদের মেসে।

মেস্‌বাড়িটা খুব পুরানো। ইলেকট্রিক তারগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মেন ফিউজ হ'য়ে যায়। এরূপ দুর্ঘটনায় অভ্যস্ত মেস-মেম্বরদের শিওরে দু'চারটে ক্যাণ্ডেল্ সর্ব্বদাই থাকে। ম্যাচ্ ঠুকে তরুণ একটা ক্যাণ্ডেল ধরালো।

অরুণের সিট্ পাশের ঘরে। সে একখানা চিঠি হাতে নিয়ে এসে বল্‌লো—এই যে তরুণ! তোর বাবা চিঠি লিখেছেন···

—কি চিঠি দেখি? চিঠিখানা হাতে নিয়ে তরুণ পড়তে লাগ্‌লো। কিছুদূর পড়েই বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলো—এর মানে কি অরুণ? বাবা তো জানেন তোর সঙ্গে লীলার বিয়ে ঠিক হ'য়ে আছে। প্রফেসর চক্রবর্ত্তীর কাছেই তিনি সে কথা শুনেছিলেন। তবু আজ আমাকে কেন লিখ্‌ছেন—মেয়ে দেখ্‌তে? আমার মতামতই বা কেন জান্‌তে চাইছেন? আমি তো কিছু বুঝতে পারছিনে?

—বুঝ্‌বার কি কোনো প্রয়োজন আছে? অরুণ বল্‌লো। লীলাকে যে দেখ্‌ছে সেই বল্‌ছে—'তার মত মেয়েকে যে বিয়ে করবে, সে খুব ভাগ্যবান'! এমন মেয়ের মাথা তো একটু বিগ্‌ড়ে যাবেই!

হাস্‌তে হাস্‌তে তরুণ বল্‌লো—লীলার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্ বুঝি?

একটু বিরক্তভাবে অরুণ উত্তর দিল—কে বল্‌লো ঝগড়া করেছি?

—তবে?

—তবে আবার কি? পরশু হঠাৎ লীলা আমাকে অনুরোধ জানালো

—তাদের বাড়িতে যেন আর না যাই। আজ তোর বাবার চিঠি পেয়ে বুঝতে পারছি—ব্যাপার কি?

অন্যমনস্কভাবে তরুণ বল্‌লো—লীলাকে আমি বহুদিন দেখিনি অরুণ! সেই ছোটবেলায় যখন···

বাধা দিয়ে অরুণ বল্‌লো—কেন মিছে কথা বলছিস্ বল্ তো? হাঁসপাতালে সেদিন প্রফেসর চক্রবর্ত্তী যখন অপারেশন-টেবিলেই মারা গেলেন···

—লীলা কি সেখানে ছিল?

—যা, যা, ন্যাকামো করিস্‌নে। ওদের তরফ থেকে বিয়ের প্রস্তাবটা যখন এসেছে—তখন একবার কেন—একশোবারও যদি দেখ্‌তে চাস্—সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আন্‌বো···

—মিছেমিছি আমার উপর কেন চট্‌ছিস অরুণ! সত্যি বলছি—সেদিন লীলাকে আমি দেখিনি সেখানে···

ভুরু কুঁচ্‌কে অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়ে অরুণ বল্‌লো—নার্সের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছিল কে? সেই শিশির-ভেজা পদ্ম-পাপড়ীর মত রাঙা চোখদুটির দিকে তুই যে অবাক হয়ে চেয়েছিলি, তা' বুঝি আমি দেখিনি ভাব্‌ছিস?

অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ ক'রে তরুণ বল্‌লো—সেই কি লীলা? বলিস্ কি? আমি ভেবেছিলাম—প্রফেসর চক্রবর্ত্তীর কোনো আত্মীয়া হবেন তিনি···লীলা তো বেশ বড়টি হয়েছে···

প্রফেসর চক্রবর্ত্তীর ছেলে শৈলেন, অতি ছোটবেলা থেকেই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। মেয়ে লীলাকে তিনি ভালবাস্‌তেন, যত্ন করে লেখা-পড়াও শিখিয়েছিলেন। অতি প্রিয়তম ছাত্র অরুণের সঙ্গে লীলাকে

বিয়ে দেবেন—তাঁর এ সঙ্কল্পের কথাও প্রকাশ করেছিলেন সকলের কাছে। হঠাৎ বাবার মৃত্যুর পর, কেন যে লীলা ভয়ানক খাপ্পা হয়ে উঠেছে অরুণের উপর—তরুণ তা' বুঝতেই পারছে না।

পরদিন বিকেলে অরুণকে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেল তরুণ—মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা শুনতে।

শ্রদ্ধানন্দপার্কে বিরাট জনসভা। রাস্তার ট্রাফিক বন্ধ। পার্শ্ববর্ত্তী কোঠাবাড়িগুলির দোতালা-তেতলা পর্য্যন্ত মানুষ ঝুলতে লাগলো—বাদুড়-ঝোলার মত!

সভায় লাউড্‌স্পীকার ছিলনা। নেতৃবৃন্দ প্রাণপণে চিৎকার করেও জনতাকে শান্ত রাখতে পারছেন না। জাহাজের বাঁশী যতই মোটা হোক—বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে সে তো একটি বালকের মুখের ভেঁপু বৈ আর কিছুই নয়?

মহাত্মাকে তখন তোলা হ'লো একটা টেবিলের উপর। জোড়হাতে গণ-দেবতাকে নমস্কার জানিয়ে একটি হাত তুলে তিনি ইঙ্গিত করলেন—'শান্ত হও!' হঠাৎ যেন একটা ম্যাজিক হয়ে গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে জন-কোলাহল এমনভাবে থেমে গেল যে—সেখানে একটা স্ূঁচ-পতনের শব্দও যেন শোনা যায়।

তরুণের শ্বাস রুদ্ধ, দৃষ্টি মুগ্ধ, মন একাগ্র। অরুণ কিন্তু তরুণের সে ভাব দেখে হাস্‌ছিল।

মহাত্মা বল্‌ছিলেন—ভারতের বর্ত্তমান শাসনযন্ত্র 'স্যাটানিক'! শয়তানের কারসাজি!

তরুণ চম্‌কে উঠলো। এত বড় একটা নির্ভিক উক্তি সে তো আজ পর্য্যন্ত শোনেনি কোনো ভারতবাসীর মুখে? লর্ড আরউইন যাঁকে

প্যান্টের পকেটে পুরে রাখ্‌তে পারেন, যেন একটা ডলি পুতুল! কেন তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন এভাবে আসমুদ্র-হিমাচল আন্দোলিত করতে— উন্মাদ ঝটিকাবর্তের মত? বৃটীশ বুলেট ও বেয়নেটের ভয় কি ওঁর নেই? মনে পড়লো গীতার বাণী—'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ!' এই মহাত্মাগান্ধীই কি তবে ভারতীয় কৃষ্টির মূর্ত্ত্য প্রতীক? আত্মোপলব্ধির জ্বলন্ত বহ্নি-শিখা! ভাবপ্রবণ তরুণ তদ্গতচিত্ত ও স্তম্ভিত।

গান্ধীজী বল্‌ছিলেন—এই শয়তানীর সঙ্গে সহযোগিতা করা পাপ। অতএব স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত, সব ছেড়ে আজ তোমরা বেরিয়ে এসো। বৈদেশিক শিক্ষাপদ্ধতির উদ্দেশ্য—এ দেশে এমন একটা গোলামখানা তৈরি করা, যেখানে একটাও মেরুদণ্ড-সোজা আত্মনির্ভর মানুষ তৈরি হবে না। তৈরি হবে, শুধু তাদেরি প্রয়োজনের মানুষ— যেন ঠিক কলকব্‌জাওয়ালা সুইচ-টেপা মেসিন!

দূর থেকে কে-একজন বলে উঠলো—আপনি নিজে কি বৈদেশিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত নন্?

গান্ধীজী স্বীকার করলেন—হ্যাঁ। তবে, বিদেশী লেখাপড়া শিখে আমি আজ এই জ্ঞান লাভ করেছি যে—কোনো ভারতবাসীর উচিত নয় সে লেখাপড়া আর শেখা···

হঠাৎ অরুণ জিজ্ঞাসা করলো—আমরা মেডিক্যাল ছাত্র। জনসেবার এই প্রয়োজনীয় শিক্ষা ত্যাগ করে, আমরাও কি বেরিয়ে আস্‌বো?

মহাত্মা অতি দৃঢ়তার সঙ্গে উদ্‌দ্দভাবে বললেন—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভারতকে অন্তঃসারশূন্যকরা অতি দুরারোগ্য ক্ষয়রোগের নাম হচ্ছে— 'পরাধীনতা'। তার চিকিৎসা করতে হবে সকলের আগে।

সভা-অন্তে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তরুণ ফিরে এলো মেসে। সন্ধ্যায়

পর সে তার ঘরের আলোটাও জাল্‌লো না, বা বইয়ের পাতাও উল্‌টালো না। খাটিয়ার উপর চোখ বুজে পড়ে রইলো—যেন অভিভূত স্বপ্নাবিষ্ট।

ঘরে ঢুকে অরুণ বল্‌লো—কি রে! আলো জাল্‌বি না নাকি?

তরুণ একটু হেসে বল্‌লো—ভিতরের আলো জ্বলে উঠেছে অরুণ! তাই বাইরের আলোটা আর জাল্‌বো না ভাব্‌ছি···

—ছিঃ, 'কেরিয়ার'টা মাটি করিস্‌নে তরুণ। গান্ধী মহারাজের ও-সব সেন্টিমেন্ট্যালিজিম্ আখেরে কোনো কাজে লাগ্‌বে না। জাতি-হিসেবে গড়ে উঠ্‌তে হ'লে—বৈদেশিক শিক্ষা ও সভ্যতাকে আঁকড়ে ধরতেই হবে। ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়ালি ও ইকনমিক্যালি যে-কোনো স্বাধীন জাতির সমকক্ষ হতেই হবে। তবে তো পাকা হবে আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তি? অবুঝ্ বালকের মত লাফিয়ে পড়ে, আজই যদি তুই আর আমি—বৃটীশ-সিংহের কেশর ধ'রে টানাটানি করি, তা'তে পশুরাজের মুখে একটু সুড়্‌সুড়ি লাগ্‌তে পারে—আমরাও খুব হাততালি ও বাহবা পেতে পারি, কিন্তু ফলটা কি হবে, শুনি? আমাদের এই অতি পুরাতন দালানের ফাটল দিয়ে পরাধীনতার শিকড়-গুলি যে কত দূর ছড়িয়ে পড়েছে—সে খবর কি রাখিস্? তুই কি ভাবিস্ —শুধু 'বন্দে মাতরম্' আর 'গান্ধীজীকি জয়' শুনে পাকাপোক্ত বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ভয় পাচ্ছে? কেন তোর এ দুর্ব্বুদ্ধি······

বাধা দিয়ে তরুণ বল্‌লো—থাম্ থাম্—তোর ও বক্তৃতা ঢের শুনেছি। মহাত্মার ভিতর আজ আমি কি দেখেছি জানিস্? ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার মূর্ত্তপ্রতীক! "প্লেন্ লিভিং ও হাই থিংকিং"এর তেজোদ্দীপ্ত মহিমা! পাশ্চাত্য ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়ালিজিম্ আমাদের টেনে

নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে। বরফের দেশে যারা বাস করে, শ্রমশিল্পের প্রতিযোগিতায় তাদের পিছনে আমাদের থাকৃতেই হবে। আমরা হবো—তাদের প্রয়োজনের মালগাড়ী। মালিকের তাগিদে—বোঝাই হ'য়ে, ইঞ্জিন যেখানে টেনে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাবো পাতানো রেলরাস্তার উপর দিয়ে। ডাইনে বা বাঁয়ে চল্‌বার স্বাধীনতা কেন পাবো আমরা? এমন কান ধ'রে টেনে-নিয়ে-যাওয়া মালগাড়ীর চেয়ে, ঝাঁকামুটে কি ঢের ভাল নয়? পরের বোঝা টান্‌লেও—সে দেখে নিজের চোখে, হাঁটে নিজের পায়ে। ভারতবাসী হিসাবে—যদি আমরা অন্ন-সমস্যার জন্যে 'দেশের মাটি', আর বস্ত্র-সমস্যার জন্যে 'চরকার' উপর নির্ভর ক'রে দাঁড়াতে পারি, মনটাকে রাখ্‌তে পারি—পাশ্চাত্য বিলাস-ব্যসনের বহু উর্দ্ধে! তা'হলে আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল কি এই মুহূর্ত্তে খ'সে পড়ে না?

অরুণ একটু হেসে বল্‌লো—শুধু অন্ন আর বস্ত্র ছাড়া, তুই কি আর কিছুই চাস্ না?

তরুণ বল্‌লো—চাই বলেই তো আমি পরাধীন। তাই তো বল্‌ছি—আজ একটা স্বাধীন ও স্বরাট্ মানুষ দেখে এলাম—মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে! জেলের লৌহ-বেষ্টনী তাঁকে আঁট্‌কে রাখ্‌তে পারবেনা। বিশ্ববাসী তাঁর আত্মিক শক্তির খেলা দেখ্‌বে—বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে!

রায়মশাই ঘরে ঢুক্‌লেন—কি গো, তোমরা অন্ধকারে কেন? আলো জ্বালো…আলো জ্বালো… …

—আসুন দাদু! বলেই তরুণ অতি ব্যস্তভাবে একটা ক্যাণ্ডেল ধরালো। তারপর অত্যন্ত অপরাধীর মত বল্‌লো—মাপ্ করবেন দাদু!

আমি কথা ঠিক রাখিনি। আপনাদের ওখানে আজ যেতে পারিনি। গিয়েছিলাম মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা শুনতে······

রায়মশাই একটু হেসে বল্‌লেন—বেশ করেছ, বেশ করেছ। পাপাত্মা দাদু তোমার এ পর্য্যন্ত না এসে পারলেন না। মহাত্মা গান্ধী নিশ্চয়ই আসতেন না। মহাত্মার বক্তৃতা তো শুনেছ? এখন পাপাত্মার বক্তৃতাও একটু শোনো······

—বলুন, বলুন······

—মহাত্মা বলেছেন দেশের কথা। আমি বলবো নিজের কথা। ভাল না-লাগলেও একটু ধৈর্য্য ধরে শুনতে হবে। তোমাদের প্রফেসর নীলমণি চক্রবর্ত্তী আমাকে 'কাকাবাবু' বলে ডাকতেন। মৃত্যুকালে নীলমণি আমার হাত দু'খানা ধ'রে—অনুরোধ জানিয়ে গেছে—তার মেয়ে লীলা যেন একটি সৎপাত্রে পড়ে। তাই শৈলেনকে দিয়ে তোমার বাবার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম······

তরুণ হেসে উঠ্‌লো—আমাকে একটি 'সৎপাত্র' ঠাওরালেন কেন বলুন তো?

রায়মশাই বললেন—সে বিষয়ে আমার কোনো অপরাধ নেই দাদু! বুড়োদের সদসৎ-বিচার আজকালকার তরুণ-তরুণীরা কি মানে? মেয়ের বাবা সৎপাত্র ঠাউরেছিল ওই অরুণকে—মেয়ে নিজে ঠাওরাচ্ছে—তরুণকে। আমি নাত্‌নীর পক্ষ থেকে দূতীয়ালি করতে এসেছি মাত্তর······

—বুঝতে পারছিনে, লীলা আপনার এত আদরের নাত্‌নী হ'লো কি করে? তরুণ বল্‌লো। লীলাদের সঙ্গে আপনার এত ঘনিষ্ঠতার কারণ কি?

রায়মশাই তরুণের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—শুনতে চাও? বলেছি তো, আমি ছিলাম খুব বড়লোক! ফুলবাবু! সন্ধ্যার পর ল্যাণ্ডো হাঁকাতাম কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়ে। হঠাৎ একদিন দেখি—একটি ছেলে—নিবিষ্ট মনে বই পড়ছে লাইট্‌পোষ্টের আলোতে দাঁড়িয়ে। অনুসন্ধানে জান্‌লাম—ছেলেটি পড়ে বিদ্যাসাগরে—থাকে এক বস্তীর খোলার ঘরে। আর, সকালে-বিকেলে করে টিউসানী! পড়াশুনায় আগ্রহশীল এমন একটি গরীবের ছেলেকে মানুষ করবার আগ্রহ জাগ্‌লো আমার মনে……

বিস্মিতভাবে তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—তিনিই কি আমাদের প্রফেসর চক্রবর্ত্তী?

রায়মশাই বল্‌তে লাগ্‌লেন—হ্যাঁ। তিনিই তোমাদের প্রফেসর নীলমণি চক্রবর্ত্তী। আমার লাগামহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনে যদি কোনো সৎকাজ করে থাকি, দাদু! এ কথা বল্‌তেও আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে—নীলমণিকে আমি রাজার হালে রেখে বি, এ,—এম্‌, এ,—পাশ করিয়েছিলাম। তারপর সে—পি, এচ্‌, ডি, হলো—তোমাদের প্রফেসর হলো—আমি কিন্তু হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়লাম—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সেজে……

চোখ দুটো মুছে রায়মশাই আবার বলতে লাগলেন—অধ্যয়ন আর অধ্যাপনাই ছিল নীলমণির জীবনের ব্রত। তাই তো স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে উদাসীন থেকে এমন অকালে মারা গেল সে। আর, এই বুড়োর ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে গেল—তার উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, ও পরমালক্ষ্মী মেয়েটির দেখাশোনার ভার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রায়মশাই আবার চোখ মুছলেন।

তরুণ ও অরুণ অবাক্ হ'য়ে শুনছিল সেই খদ্দরপরা খেয়ালী বুড়োর বৈচিত্রময় জীবন-কথা।

হঠাৎ অরুণ জিজ্ঞাসা করলো—আপনার নিজের আর কে আছে?

—কেউ নেই! হতাশ ভাবে রায়মশাই বললেন। ছিল একটি মাত্র মেয়ে—ওই দাদু-ভাইকে একমাসের রেখে—সেও আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে···রায়মশাই চোখের জল আর সামলাতে পারলেন না।

কিছু সময় চুপ করে ব'সে থেকে—তিনি বলতে লাগলেন—পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া অনেক ছেলে-মেয়ে নিয়ে, আমি একটা প্রকাণ্ড সংসার গড়ে তুলেছি কোনো দূর পাড়াগাঁয়ে। সেই পল্লী-আশ্রমেই বারোমাস থাকি। উপস্থিত নীলমণি আমাকে কী মুস্কিলেই ফেলে গেছে! তার মাতাল ছেলেটা টাকাপয়সা উড়িয়ে দিচ্ছে! লীলার মত পরমালক্ষী মেয়েকে এই বিপদে ফেলে—সে দিকে যাই কি করে? তাই তো ছুটে এসেছি—দাদু! তুমি আমাকে উদ্ধার করো···তরুণের হাত দু'খানা চেপে ধরলেন তিনি।

—আমি লীলাকে বিয়ে করবো না। খুব স্পষ্টভাবে বললো তরুণ।

—কেন বলো তো? রায়মশাই জিজ্ঞাসু ভাবে চেয়ে রইলেন মুখের দিকে।

তরুণের দৃষ্টি অবনত। এ-সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট 'না'-ছাড়া সে আর কিছুই বলতে রাজী নয়। কিন্তু রায়মশাই ছাড়লেন না। একটু খোঁচা দিয়ে বলতে লাগলেন—দেখো দাদু! লীলার মত রূপগুণের মেয়েকে কোনো বিয়ের ছেলেই অপছন্দ করতে পারে না—তা আমি জানি। তবু তোমার আপত্তির কারণটা কি বলো তো?

—আমি এখন বিয়ে করতেই রাজী নই···কোনো মেয়েকেই নয়। মাপ করবেন আমাকে···

—কেন, তাইতো জান্‌তে চাচ্ছি? বিয়েকে ভয়-করা, পুরুষের পক্ষে ভয়ানক কাপুরুষতা। আমাদের বৌ মানে 'সহধর্ম্মিণী'—ওদেশের 'ওয়াইফ্' নয়। অতএব, ভয়ের কোনো কারণ নেই তো!

একটু হেসে তরুণ বল্‌লো—যদি কিছু মনে না করেন—তা'হলে একটা কথা বলি···

—বলো, বলো, খুব স্পষ্ট সোজাকথা শুনতেই ভালবাসি আমি···

—ওয়াইফ্ বদ্‌লানো যায়—আর সহধর্ম্মিণী থাকেন আমরণ ঘাড়ের বোঝা হ'য়ে···

রায়মশাই চম্‌কে উঠ্‌লেন। চোখ দুটো বড় ক'রে বল্‌লেন—কী সর্ব্বনাশ! তোমরা কি এই সতীলক্ষ্মীর দেশটাকে—মেনকা-রম্ভা ও তিলোত্তমার দেশ গড়ে তুল্‌তে চাও?

তরুণ ঠিক তেম্‌নি হাস্‌তে হাস্‌তেই বললো—সতীলক্ষ্মী বিয়ে করা মানে তো ক্ষয়-রোগে আক্রান্ত হওয়া? দুজনেই খুব হাস্‌তে লাগ্‌লো।

—হুঁ—বটে? রায়মশাই অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বল্‌লেন—জলে-না-নেবেই ওস্তাদ সাঁতারু সেজে ব'সে আছ? কী আশ্চর্য্য!

হঠাৎ ভাবটা বদ্‌লে, হাত দুটো কচ্‌লে তরুণ বল্‌লো—না, না, কিছু মনে করবেন না দাদু! আপনার সঙ্গে একটু······

—বুঝেছি—তা'হলে পরিহাস রেখে, আসল কথাটা কি তাই বলো······

হাত জোড় ক'রে তরুণ বল্‌লো—লীলাকে আমি বিয়ে করবো না।

বা, সে-সম্বন্ধে কোনো কৈফিয়ৎ দিতেও পারবো না। আমাকে মাপ করবেন……

—কৈফিয়ৎটা তুমি না-দিতে পারলেও, আমি জানি। তোমার এই বন্ধু অরুণ লীলাকে ভালবাসে। বন্ধুর ভালবাসার পাত্রীকে তুমি বিয়ে করতে চাও না—এই তো? কিন্তু, তোমাকে আমি একটা কথা বলে যাচ্ছি—তোমার সঙ্গে বিয়ে না-হলে, সে আজীবন কুমারী থাকবে—তবু অরুণের বৌ হবে না। অরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু বিব্রতভাবে তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—অরুণ-সম্বন্ধে হঠাৎ তার এ মত-পরিবর্ত্তণের কারণটা কি বলুন তো? .

—ঠিক জানি না। শুনেছি—নীলমণির মতে—পাত্র-হিসাবে তোমার চেয়েও অরুণ ঢের ভালো। তুমি নাকি স্বপ্ন-বিলাসী, অরুণ বাস্তববাদী। তুমি স্বাস্থ্যহীন—অরুণ স্বাস্থ্যবান। তাই নীলমণি খুব সুযোগ দিয়েছিল অরুণকেই লীলার সঙ্গে মিশ্‌বার। কিন্তু ফল ভাল হ'লো না।

—কেন এমন হলো—তা'তো বুঝতে পারছিনে?

একটু চিন্তাক'রে রায়মশাই বল্‌লেন—আমার মনে হয়—দূরের ঠাকুর—নিকটের কুকুর! যার হাতে খাইনি—রাঁধুনী-হিসাবে সেই খুব ভালো। তোমাদের ইংরেজিতেও তো একটা কথা আছে—'ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রিড্‌স্ কনটেম্‌ট্!'

—তাহলে বিয়ের 'ফ্যামিলিয়ারিটি' ঘটলে—আমিও তার কাছে অত্যন্ত কনটেম্‌টেড্ হবো? এ বিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ নেই? এমন—চঞ্চলমতি মেয়েকে আমার ঘাড়েই বা চাপাতে চান্ কেন?

বাধা দিয়ে রায়মশাই বল্‌লেন—ভুল বুঝোনা ভায়া! আমি শুধু লীলার কথাই বলিনি। সব মেয়ে ও সব ছেলেদের কাছেই—'নিকটে

তরঙ্গ, দূরে রজত-রেখা' ! তাই তো আমাদের দেশে বিয়েটাকে বাঁধা হয় দায়িত্বজ্ঞান ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির দড়িদড়া দিয়ে। ওদেশের মত 'লভ'কে প্রাধান্য দিলে—পাক্ষিক, মাসিক, বা বাৎসরিক হাত-বদলাইয়ের ব্যবস্থাটাও চালু রাখ্‌তে হবে বৈকি ! আমাদের ব্যবস্থা হচ্ছে—বিয়ের পর লীলা জানবে—তুমি তার জন্মজন্মান্তরের স্বামী—স্বয়ং শালগ্রাম তার সাক্ষী—এ বন্ধন অচ্ছেদ্য ! আমাদের বিয়ে একটা ধর্ম্মসংস্কার— 'লভে'র খোস্‌-খেয়াল নয়।

—এমন ধ'রে-বেঁধে সংস্কৃত-করার ব্যবস্থাটা তো অরুণের সঙ্গেও চল্‌তে পারে ? এ 'দূরের রজত রেখা'কে টানাটানি করছেন কেন ?

রায়মশাই একটু ভেবে বল্‌লেন—হ্যাঁ, অরুণের সঙ্গেও চল্‌তে পারতো, নীলমণি যদি বিলিতি-ভুলটা না করতো। বিয়ের আগেই— 'লভ্‌' তৈরি করতে যাওয়া মানে—ঘোড়ার পিছনে গাড়ী না-বেঁধে— সাম্‌নে বাঁধা। বৈবাহিক জীবনে 'লভ্‌'টা তো অপ্রয়োজনীয় নয় ? বিয়ের পরে তা' গড়ে উঠবে—পরস্পরের ত্যাগবুদ্ধির মহিমায় ভরে উঠবে—আর, তার মাধুর্য্য ফুটে উঠ্‌বে—সন্তানের কলহাস্যে ! বিয়ের লাগাম মুখে না-বেঁধে—আগেই 'লভ্‌' গড়ে তুল্‌বার ব্যবস্থা—প্রাচ্য পণ্ডিতরা সমর্থন করেন নি……

হঠাৎ তরুণ অধৈর্য্যভাবে হাত জোড় করে ব'লে উঠ্‌লো—আপনার যুক্তিতর্কের কাছে মাথা নোয়াচ্ছি দাদু ! কিন্তু আমাকে মাপ করবেন— লীলাকে আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারবো না…

বুঝ্‌লাম—বলেই রায়মশাই উঠে দাঁড়ালেন। তাহলে এখন আসি… আর কিছু না-বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

লীলা ব'সেছিল তার পড়ার ঘরের টেবিলের সামনে—কপালের একপাশে একটা সদ্য আঘাতের ক্ষত-চিহ্ন নিয়ে। ধারা বেয়ে রক্ত পড়ছিল। সুন্দর মুখখানির বাঁ-দিককার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তাক্ত। বড় বড় চোখ দুটি লালাভ ও বাষ্পাকুল!

মদ্যপানে উন্মত্ত শৈলেন এসে টাকা চেয়েছিল। লীলা দেয় নি। হাতে ছিল মদের গ্লাস্—তাই ছুড়ে মেরেছিল শৈলেন। আর একটু নীচেয় লাগ্‌লে লীলার চোখটা যেতো। মাধুরী-ঝি হাউ-মাউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছিল, কিন্তু লোক-জানাজানির ভয়ে লীলা তাকে চোখ-রাঙিয়ে ধমক দিয়েছে! শৈলেনও টল্‌তে টল্‌তে পালিয়ে গেছে। বাড়িটা এখন যেন জনশূন্য—কোথাও একটি টু-শব্দ নেই।

ব'সেই আছে—যেন পাথরের মূর্ত্তি! মাধুরী
[illegible] গেছে—টিনচার-আইডিনের শিশি ও বোরিক কটন—
[illegible]কানো হুঁস্ নেই! একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে টেবিলের
[illegible]য়-রাখা দুইখানি ফটোর দিকে। একখানি তরুণের,
[illegible] গাম্ভীর।
[illegible] বলে গেল—দিদিমণি একটি ভদ্রলোক এসেছেন—
[illegible]া করতে চান্……

—বাইরের ঘরে ব'সতে বল্…… অন্যমনস্কভাবে এই সাধারণ-ভদ্রতার পরিচয়টুকু দিয়ে—তেমনি ভাবেই চুপটি ক'রে বসে রইলো সে। যেন ভোলানাথের ধ্যানেমগ্ন পাষাণী-মেয়ে পার্ব্বতী! রক্তের দাগ মুছে,

যৌবনরাগে উৎফুল্ল লাবণ্যময়ী তার নষ্ট-সৌন্দর্য্য পুনরুদ্ধারের কোনো চেষ্টাই করছে না।

হঠাৎ লীলার চোখমুখ যেন—যুদ্ধরত সৈনিকের মত অসম্ভব দৃঢ় হ'য়ে উঠ্‌লো। বাঁ-পায়ের গোঁড়ালি দিয়ে মেঝেয় একটা আঘাত ক'রে অস্ফুটস্বরে ব'লে উঠ্‌লো—ড্যাম্ ইট্! তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, পিঠ্‌ভ'রে-ছড়িয়ে-পড়া একরাশ কালোচুল বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে বল্‌লো—আজই! হ্যাঁ, আজই এর একটা 'ফাইনাল্' করবো……

পিছন দিক্‌বার দেওয়ালে ঠাঙানো ছিল একটা বড় আয়না। ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে চাইতেই লীলা দেখ্‌লো—আয়নার ভিতর তরুণ!

তরুণ বহুক্ষণ বাইরের ঘরে অপেক্ষা করেছে। তারপর অধৈর্য্য ভাবে এসে দাঁড়িয়েছে সাম্‌নের দরজায়। অন্যমনস্ক লীলা তা' লক্ষ্য করেনি। এখন আয়নার ভিতর চোখে চোখ পড়তেই সর্ব্বাঙ্গে তার শিহরণ জেগে উঠ্‌লো। গত তিনদিন দিবারাত্রি সে শুধু তরুণের কথাই ভাব্‌ছে। মাতাল দাদার সংসর্গ ত্যাগ করে, বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে চায় সে। কিন্তু কোথায় যাবে? এই চিন্তাই তাকে পাগল ক'রে তুলেছে!

দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে, ঘাড়টা একটু নীচু ক'রে, ভাবে লীলা বল্‌লো—ভিতরে আসুন……

লীলাকে তরুণের মনে আছে—একটি ফ্রক্‌পরা আজ সে বড় হয়েছে—বি, এ, পাশ করেছে—রূপ ও গুণের ডালি সাজিয়ে বেচারা অরুণকে পাগল ক'রে তুলেছে। তাকে দেখেই তরুণের মনে হ'লো—এমন একটি ফুটন্ত গোলাপের জন্য পাগল-হওয়া, অরুণের পক্ষে অস্বাভাবিকও হয়নি—অসঙ্গতও হয়নি। সত্যিই লীলা অপূর্ব্ব

সুন্দরী! সৌন্দর্য্যের সঙ্গে যৌবনোচিত স্বাস্থ্য-সমাবেশ, নারীকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করে। লীলা তার কতখানি অধিকারী হয়েছিল—তরুণ তা' জান্‌তো না! কিন্তু হঠাৎ তার কপালের একপাশে রক্তের দাগ দেখে, তরুণ চম্‌কে উঠ্‌লো—ওকি! রক্ত কেন?

অতি বিনীতভাবে লীলা আবার বল্‌লো—দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন কেন তরুণবাবু! ভিতরে এসে, বসুন……

—তোমার কপালে রক্ত কেন লীলা?

একটু হেসে লীলা বল্‌লো—কপালের মালিক কপালকে দেখ্‌তে পান্ না। তাই তো কপালের আর এক নাম অদৃষ্ট! আপনি আস্‌বেন ব'লেই বোধহয় আজ আমার অদৃষ্ট কেটেছে……হঠাৎ কথাটা বলে ফেলেই লীলা অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে পড়লো! মেঝের দিকে চেয়ে রইলো ঘাড়টা নীচু ক'রে।

ঘরে ঢুকে চেয়ারে বস্‌তে বস্‌তে তরুণ বল্‌লো—বুঝলাম না। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলো……

চেষ্টাকৃত হাসির সাহায্যে লজ্জাকে অস্বীকার ক'রে লীলা বল্‌লো—আপনি কখনো আসেন না আমাদের বাড়ীতে। আজ হঠাৎ কি মনে ক'রে বলুন তো?

—আমি খুব বিস্মিত হচ্ছি লীলা, তুমি আমাকে চিন্‌লে কি করে? পথে-ঘাটে দেখা হ'লে তোমাকে আমি নিশ্চয়ই চিন্‌তাম না।

—তা' জানি। একটু বসুন। এই নোংরা রক্তের দাগটা ধুয়েই আস্‌ছি………আইডিন্ ও বোরিক নিয়ে লীলা খুব ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল।

তরুণ বহুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—লীলা ও অরুণের

কথা। অরুণের মত স্বাস্থ্যবান সুপুরুষকে কেন লীলা অপছন্দ করে? লীলার প্রতি অরুণের অনুরাগ যে কত অকৃত্রিম—তরুণ তা' জানে। তরুণ মনে করে—লীলার কাছে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবু লীলার এ আকর্ষণ কেন? রায়মশাই বলেন—সে নাকি 'দূরের রজত-রেখা'! তাই কি সত্যি?

টেবিলের উপর ছড়ানো ছিল—কয়েকখানা মাসিক-পত্রিকা। তাদের দু'একখানাতে তরুণ মাঝে মাঝে কবিতা ও প্রবন্ধ লেখে। কিছু দিন আগে—একখানা মাসিকে তরুণের একটি কবিতা বেরিয়েছে। মাসিকখানা খুলেই সে দেখ্‌লো—তার সেই কবিতার চারটি লাইন লাল কালি দিয়ে দাগানো······

হাতের সাথে হাত-মিলাতে নাইবা তুমি পারো—
মনের সাথে মন-মিলালে যদি,
পাহাড় ভেঙে পথ ক'রে আজ ছুটবে তোমার পানে
হে বাঞ্ছিত! আমার প্রেমের নদী!

দি আইডিয়া! তরুণ চম্‌কে উঠ্‌লো! তার এই কবিতাই কি লীলাকে আজ তার দিকে আকৃষ্ট করেছে? তরুণ ভাব্‌তে লাগ্‌লো। শীগ্‌গীরই তার আর-একটা কবিতা বেরুবে·········সে লিখেছে······

নয়নের জলে যত ব্যথা আছে—
বুকের শোণিতে নাই তত,···
ব্যাধ কাঁদে বিঁধি—বলাকার বুক—
উঁচু-মাথা করি অবনত!

—হঠাৎ একটা মাসিকের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লো—একটি

মোটা চিঠির কভার—টিকিট লাগানো। শিরোনামায় লেখা 'তরুণ ব্যানার্জ্জি'! বোধহয় ঠিকানা জানা নেই ব'লে পোষ্ট করা হয়নি।

তরুণ ভাব্‌লো—চিঠিখানা কি তাকেই লেখা? 'তরুণ ব্যানার্জ্জি' যদি আর কেউ থাকে? টিকিট-লাগানো আঁটা-চিঠি—খুলে-দেখা কি অন্যায় হবে না? তাকেই যদি লিখে থাকে, ঠিকানা লিখে পোষ্ট করেনি কেন? তার ঠিকানা তো লীলা জানে? সে যে আজ আস্‌বে, একথা নিশ্চয়ই লীলার জানা ছিল না! তবে এ চিঠি কার?

হঠাৎ লীলা পেছন থেকে ব'লে উঠ্‌লো—কভারটা ছিঁড়ে, পড়ুন্ না—? আমি ততক্ষণ—চা তৈরি ক'রে আনি……বলেই একটু চাপা দুষ্টু-হাসি মুখে নিয়ে লীলা বেরিয়ে গেল। কখন যে সে এসে ঢুকেছিল ঘরে—তরুণ তা জান্‌তেও পারে নি।

বৈশাখের বিকেল বেলা। আকাশ ঘিরে মেঘ জমে উঠেছে! সন্ধ্যার আগেই অন্ধকার এসে সান্ধ্যদীপ্ জ্বাল্‌বার তাগিদ্ দিচ্ছে। একটা জান্‌লা ঠেলে তরুণ দেখ্‌লো—আকাশে কী ঘনঘটা! শীগ্‌গীরই মেসে ফিরতে হবে। কিন্তু কভার-ছেঁড়ার অনুরোধটা তো উপেক্ষা করা চলে না? খোলার চেয়েও ঢাকার ভিতর মানুষের কৌতূহলের খোরাক থাকে বেশী।

কভার ছিঁড়ে তরুণ দেখ্‌লো—এপিট্-ওপিট্ খুব ছোট-ছোট লেখা, পুরো সাতপাতা চিঠি! যেন কোনো মাসিকের জন্যে লেখা গভীর তথ্যপূর্ণ বিস্তৃত একটি প্রবন্ধ। আলোর স্যুইচ খুঁজ্‌বার জন্যে তরুণ চাইতে লাগলো চারিদিকের দেওয়ালে। এমন সময় মাধুরী এক প্লেট্ খাবার এনে রাখ্‌লো—টেবিলের উপর।

—ঘরের আলোটা জেলে দাও তো? তরুণ বললো। সে ঠিকই

বুঝেছিল—মাধুরী, ঝি। কিন্তু সুইচ—টিপ্‌তেই দেখ্‌লো—মাধুরীর বয়স খুব অল্প, আর তার বেশভূষার মধ্যে—শুচিতা-রক্ষার পারিপাট্যও আছে খুব। তাকে ঝি ব'লে সম্বোধন করতে আর সাহসী হলো না সে, একটু থতমত খেয়ে বললো—আপনি কি বল্‌তে পারেন—লীলার কপালে আঘাত লাগ্‌লো কি করে ?

ভদ্রঘরের মেয়ে মাধুরী। হঠাৎ তাকে দেখ্‌লেই মনে হবে—লীলার কোনো আত্মীয়াই বা হবেন। অত্যন্ত সরল ও চঞ্চল মেয়েটি খুব বেশী কথা বলে। শুধু অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেই প্রশ্নকারীকে বিপন্ন করে না, কথা ফুরিয়ে গেলেও এককথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বহুবার বল্‌বার গেঁয়ো আর্টটা চমৎকার জানে।

লীলার কপালের ক্ষতচিহ্ন যে মাতাল শৈলেনের কুকীর্ত্তি ! এ কথাটা তরুণকে বোঝাবার জন্যে—প্রথমেই সে বল্‌তে লাগ্‌লো শৈলেনের উচ্ছৃঙ্খলতার ঐতিহাসিক তথ্য। শৈলেন আগে খুব ভালছেলে ছিল—পরে এক পাঞ্জাবী-ভূত এসে তার কাঁধে ভর করলো। সে দিনরাত শৈলেনকে মোটর গাড়ীতে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতো। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শৈলেনের মাথাটাও ঘুরে গেল।

তারপর, লীলার ধৈর্য্য ও সহ্যের ভৌগলিক বিবরণ ! কোন্ জেলার মেয়ে লীলা, কোন্ জেলায় বিয়ে হলে শাশুড়ী পাবে মনের মতন। কোন্ জেলার বুড়ী শাশুড়ীরা রুজ ও লিপ্‌ষ্টিক্ ব্যবহার করে, কিন্তু কচি পুতের বৌকে সাবান-পাউডারও মাখ্‌তে দেয়না।

ক্রমে সুরু হলো—নিজের দুর্গতির পুরাবৃত্তি। পাঁচ-বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। মুখে কথা ফুটতেই—সে খুব কথা বল্‌তে ভাল-বাস্‌তো। কিন্তু মহাবিজ্ঞা-শাশুড়ী নাকি দিনরাত ঘোম্‌টা পরিয়ে ঘরের

কোণে বসিয়ে রাখতেন তা'কে। কারো সঙ্গে একটি কথা বল্‌বার অনুমতি দিতেন না, এমন কি গো-বেচারা স্বামীর সঙ্গেও না। পেটে যার বহুকথা গজ্‌গজ্ করে—সে কি ক'রে পারে—এমন কঠোর মৌনব্রত পালন কর্‌তে? ক্রমে মাধুরী সাবালিকা হলো—তবু তার ঘোম্‌টার বহর একটুও খাটো হ'লো না, বা জিহ্বার লাগাম একটুও শিথিল হ'লো না। কি আর করবে? বাড়ীর পিছনে ছিল একটা নির্জ্জন জঙ্গল। সেখানে একটি ঝোঁপের আড়ালে ব'সে আপন মনে বকতে সুরু কর্‌লো সে। হঠাৎ ধুমাবতী-শাশুড়ী একদিন তা' দেখে ফেল্‌লেন। আর যাবে কোথায়? তা' থেকেই সাব্যস্ত হ'লো মাধুরীর চরিত্রের দোষ! নিশ্চয়ই ওই জঙ্গলের আঁড়ালে লুকিয়ে থাকে—পর-পুরুষ!

—বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে……ঝাঁটা হাতে আরম্ভ হলো, ছিন্নমস্তা শাশুড়ীর ভীষণ তর্জ্জন-গর্জ্জন। এইভাবে একে একে শ্রীশ্রীশাশুড়ী-ঠাকুরাণীর দশমহাবিদ্যা রূপদর্শন ক'রে—মাধুরী তার পাতানো-মামার সঙ্গে পালিয়ে এলো কলকাতায়। তার স্বামী নাকি এখন একটি বোবা মেয়ে বিয়ে করেছেন।

হঠাৎ কি যেন ভেবে তরুণকে মাধুরী জিজ্ঞাসা কর্‌লো—আপনার মা আছেন?

তরুণ বল্‌লো—না।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মাধুরী বল্‌লো—বাঁচা গেলরে বাবা!

তরুণের মা-থাক্‌লে মাধুরীর মৃত্যু-ভয়ের কারণটা ছিল কি—সেকথা বুঝ্‌তে না পেরে তরুণ অবাক্ হয়ে চেয়ে থাক্‌লো তার মুখের দিকে। হঠাৎ লীলা ছুটে এলো একটা জান্‌লার ধারে। প্রসঙ্গটাকে আর

বেশীদূর অগ্রসর হতে না দিয়ে, চোখের ইসারায় মধুরীকে ডেকে আন্‌লো বাইরে।

মাধুরীর অভিভাষণের প্রারম্ভেই তরুণ বুঝেছিল—লীলার কপালে আঘাত করেছে—মাতাল শৈলেন। অমানুষ দাদার নির্ম্মম অত্যাচারের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে—সে ছিঁড়ে ফেল্‌লো চিঠির কভারখানা। সমস্ত মনটা তার—তখন ভ'রে উঠেছিল—গভীর সহানুভূতির আবেদনে।

প্রথম একটি পাতা লীলা লিখেছে—সে কি চায়? তার জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা কি? তারপর কেন সে অরুণকে পছন্দ করে না—তার কৈফিয়ৎ।

লীলার মতে—অরুণ স্বার্থান্বেষী। সে চায় ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি—বাড়ি, গাড়ী ও রায়বাহাদুরী! বিধি-নির্দ্দিষ্ট দুর্ব্বলের পরাধীনতা খুব স্বাভাবিক ও সঙ্গত। দুর্ব্বলের সবলতার অভিনয়, ও পরাধীনের স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টাকে অরুণ মনে করে, হিষ্টিরিয়া-রোগীর আক্ষেপ! মহাত্মা গান্ধী নাকি মিথ্যাশ্রয়ী ও ভণ্ড! তরুণের মহাত্মা-প্রীতিকে অরুণ পরিহাস করে, নানা ভাবে ও ভঙ্গিতে। নারীকে সে মনে করে পুরুষের ভোগ-বিলাসের উপকরণ-মাত্র। এক কথায়, এইরূপ মনস্তত্ত্ববিশিষ্ট অরুণকে সহ্য করা লীলার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে।

তারপর তরুণের কথা—পুরো পাঁচ পাতা! তরুণ-সম্বন্ধে সে কি জেনেছে ও বুঝেছে। কোথায় কিভাবে তরুণকে সে কতবার দেখেছে ও কত মূল্যবান বাণী শুনেছে তার। তরুণের লেখা কবিতা ও প্রবন্ধ লীলার প্রাণে কী গভীর দাগ কাটে! দেশ-প্রেমিক ও সুকবি তরুণের প্রকৃতি কত মধুর—ব্যবহার কত সহৃদয়—সবই সে জেনে নিয়েছে। যদিও তার বারো-আনা জ্ঞাতব্যই যে অরুণের জোগানো, একথা সে

অস্বীকার করেনি। তবে, অরুণ করেছে—তরুণের নিন্দা, আর লীলার মন ভ'রে উঠেছে—অতি উচ্চ-প্রশংসার মাদকতায়।

দুই বন্ধুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে, নিজের ভাবপ্রবণ মনের দুর্দ্দমনীয় অকর্ষণ নিয়ে, লীলা আজ জীবন-সঙ্গিনী হ'তে চায় তরুণের—অরুণের নয়। এই টুকুই হ'লো পুরো সাতপাতা চিঠির মর্ম্মকথা।

চিঠির মারফতে তরুণ আজ লীলাকে খুব পরিষ্কার ভাবেই চিন্‌লো ও বুঝ্‌লো। কিন্তু উপায় কি? তরুণ তো ভুলতে পারছে না অরুণের সেই সঙ্কল্প—'লীলাকে না-পেলে সে সুইসাইড্ করবে!' চিঠিখানা ভাঁজ ক'রে আবার কভারে পূরে, তরুণ চুপ করে বসে রইলো নিজের মাথাটাকে চেপে ধরে। এ সমস্যার সমাধান কি?

বাইরে তখন ভয়ানক ঝড় উঠেছিল। রাস্তার ধুলোবালি উড়িয়ে ঝোড়ো-হাওয়া আরম্ভ করেছিল—প্রচণ্ড মাতামাতি! চরিদিকে কী ভয়ানক দুমদাম্ শব্দ! ঝড়ের একটানা গোঁঙানির সঙ্গে—সারা বাড়ীর দরজা-জান্‌লাগুলো যেন জুড়ে দিয়েছিল শৈলেনের মতই উচ্ছৃঙ্খল মাংলামো।

হঠাৎ মাধুরী ছুটে এসে, ঘরের দরজা-জান্‌লাগুলো বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। ঢুক্‌লো লীলা এক কাপ্ চা হাতে নিয়ে।

চায়ের কাপ্‌টা তরুণের সাম্‌নে রেখে লীলা বল্‌লো—খাবারটা খান্……

কাপ্ মুখের কাছে নিয়ে—চায়ের উষ্ণতা পরখ করতে করতে তরুণ বল্‌লো—বাইরে কী ভয়ানক দুর্য্যোগ! মেসে ফিরবো কি ক'রে—তাই ভাব্‌ছি।

—নাই বা ফিরলেন? ঝড়টা থাম্‌লেই দাদু আসবেন। আমি

খিঁচুড়ী রাঁধবো'খন্। খেয়েদেয়ে দাদুর কোলে ঘুমিয়ে থাক্‌বেন— তারপর মেসে ফিরবেন, কাল।

ভুরুজোড়া একটু কুঁচ্‌কে তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—'দাদুর কোলে' মানে?

তিনি যে আমারও ঠাকুরদাদা—তা' বোধহয় জানেন? আপনার কথা বল্‌তে বল্‌তে তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়ায়। এখানে এসে আপনাকে দেখ্‌লে ভারি খুসী হবেন তিনি।

—হুঁ তা' জানি। বলেই তরুণ এক চুমুক চা পান করলো। গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো—এ কথাও বোধ হয় তুমি জানো যে, অরুণ আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু?

—হ্যাঁ জানি। সলজ্জভাবে ঘাড়টা একটু বাঁকিয়ে লীলা বল্‌লো!

চা-টুকু নিঃশেষ ক'রে তরুণ বল্‌লো—শোনো লীলা, চিঠিখানা আগাগোড়া খুব ভাল করেই পড়েছি। যে ধারণা নিয়ে তোমার এখানে এসেছিলাম—তার কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি ও চিঠি পড়ে। অরুণের প্রতি যে অবিচার করছো তুমি—তার প্রতিবাদ করতেই আজ আমার এখানে আসা। আমি বল্‌তে চাই—অরুণ-সম্বন্ধে তোমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

—হতে পারে। আমি তো মানুষ? তারপর?

—তোমার বাবা অরুণের সঙ্গেই তোমাকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সে হিসাবে—তুমি তার বাক্‌দত্তা······

লীলার চোখমুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো। সে একটু উত্তেজনার সঙ্গে বল্‌লো—বাবা বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বারো বছরের লীলাকে—অরুণবাবু তখন পড়তেন আই, এস, সি। বিয়েটা যদি তখন হ'তো—

অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে শান্তি পেতাম। আজ আমি বড় হয়েছি—বি, এ, পাশ করেছি—আমার একটা মতামত গড়ে উঠেছে। মরার আগে বাবা তো এ কথাটা অস্বীকার ক'রে যাননি? তিনি জীবিত থেকে—আজও যদি আমাকে অরুণবাবুর সঙ্গে বিয়ে দিতেন—নিশ্চয়ই কোনো প্রতিবাদ করতাম না আমি।

হরিণীর মতো আবেশভরা—লীলার বড় বড় চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। চোখমুছে সে আবার বলতে লাগলো—আমার মালিক আমি ছাড়া আজ আর কে আছে বলুন? দু'চার বোতল মদের বিনিময়ে—মাতাল-দাদা আমাকে পাঞ্জাবে পাঠাতে চান, একটি পাঞ্জাবী মাতালের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। আপনি কি বলতে চান—দাদার অভিভাবকত্ব স্বীকার করাই এখন আমার উচিত হবে?

টেবিলের উপর কনুই দুটো রেখে—দুইহাতে মাথাটা চেপে ধ'রে ব'সে ছিল তরুণ। হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে ব'লে উঠ্‌লো—তোমাদের এখানে 'স্মেলিং সল্ট্‌' আছে লীলা?

—না তো!······নিজের চোখদুটো একটু ভাল ক'রে মুছে, গম্ভীর সহানুভূতির সঙ্গে লীলা বল্‌লো—যদি কিছু মনে না-করেন—চমৎকার কপাল-টিপ্‌তে জানি আমি। মাথা-ধ'রলেই বাবা আমাকে ডাক্‌তেন।

—না, না, তেমন-কোনো কষ্ট হচ্ছে না। বলেই তরুণ চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে একটা জানলা খুল্‌লো। বাইরে তখন ঝড়ের বেগ থেমে গেছে—কিন্তু জল হচ্ছে অবিশ্রান্ত। চারিদিকে ভয়ানক অন্ধকার। মাঝে মাঝে চোখ-ধাঁধাঁনো বিদ্যুৎও চম্‌কাচ্ছে।

একটু হেসে লীলা বল্‌লো—মেসে ফিরবার জন্যে খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন বুঝি?

একটু চিন্তিতভাবে তরুণ বল্‌লো—এ দুর্যোগ যদি সারারাত 'কনটিন্যু' করে—তাহলে কি উপায় হবে লীলা ?

সারা ঘরে শুভ্র-শেফালীর মত একরাশ হাসি ছড়িয়ে দিয়ে—লীলা বল্‌লো—নিজেকে এত নিরুপায় মনে করছেন কেন বলুন তো ? প্রয়োজন হলে কি এই জলবৃষ্টি মাথায় করেই বেরিয়ে পড়তে পারেন না ? আচ্ছা, বসুন। এখুনি আস্‌ছি আমি……

লীলা ঢুক্‌লো পাশের ঘরে। আল্‌না থেকে একটা ওয়াটার-প্রুফ্ টেনে নিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে ফেল্‌লো। তারপর টুপিটা মাথায় বেঁধে হন্‌হন্ করে বেরিয়ে গেল সদর দরজা খুলে। এই দুর্যোগে হঠাৎ কোথায় যাচ্ছে সে ?

মাধুরী এসে জিজ্ঞাসা করলো—আপনি কি পেঁয়াজ খেয়ে থাকেন ?

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে—খুব ব্যগ্রভাবে তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—তোমার দিদিমণি কোথায় গেলেন বলো তো ?

—তাতো জানি না। বলে গেলেন—এখুনি আস্‌ছি—কাট্‌লেট্‌গুলো তৈরি কর। কিন্তু আপনি পেঁয়াজ খান, কি না-খান—তা' না-জেনে কি করি বলুন ? ঠাকুরদাদা হঠাৎ সেদিন এলেন এখানে, তাঁকে নিয়ে কী মুস্কিলেই পড়েছিলাম। ঝালে-ঝোলে-অম্বলে—এ বাড়ীর সবতাতেই তো পেঁয়াজ ! ঠাকুরদাদা কিছু মুখে তুল্‌লেন না। কচি খোকার মত দুধের বাটি চুমুক দিয়ে উঠে গেলেন। আমার কান্না পেতে লাগ্‌লো……

তরুণ বুঝ্‌লো মাধুরীর বিবৃতি শীগ্‌গীর বন্দ হবে না। কিন্তু লীলা কোথায় গেল ? অস্থির ভাবে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বারবার রাস্তার দিকে উঁকি দিতে লাগ্‌লো। মাধুরীর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে,

তরুণ অতি শঙ্কিত ভাবে বলে উঠ্‌লো—রাস্তায় ভয়ানক অন্ধকার! জল হচ্ছে—বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে! এমন দুর্যোগে—তোমার দিদিমণি……

—সে কথা আর বল্‌বেন না—মাধুরী বল্‌লো। ভয় কাকে বলে—তা'তো লীলাদি জানে না? শুনুন, তবে বলি……

মাধুরী আবার তার বকুনির খেই ধরে আরম্ভ করলো বল্‌তে, লীলার দুর্জ্জয় সাহসের ছোটবড় অনেক গল্প। উপস্থিত পেঁয়াজ-পর্ব্ব বন্ধ হওয়াতে তরুণ অনেকটা স্বস্তি অনুভব করেছে। মাধুরী অনর্গল বলেই যাচ্ছে—সে-দিন এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এসেছিলেন দাদাবাবুর সঙ্গে। বাইরের ঘরে ব'সে দু'জনাই মদ খাচ্ছিলেন। আমার উপর হুকুম হলো—পেঁয়াজের ফুলুরী ভাজ্‌তে……

তরুণ শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌লো—আবার সেই পেঁয়াজ-পর্ব্ব! গল্পের গতি একটু ঘুরে গেলেও—একেবারে স্থানচ্যুত হলো না। মাধুরী বলতে লাগলো—ফুলুরী কে খাবে? ভাজা ফুলুরী প্লেটেই পড়ে রইলো, দাদাবাবু পড়লেন বেহুঁস্ হয়ে। তারপর কী কীর্ত্তি করলো সেই পাঞ্জাবীটা! টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে ঢুক্‌লো দিদিমণির ঘরে। তিনি তখন চুপ্‌টি ক'রে বসে কাঁদছিলেন। ও-মা-মা-মা—কী ঘেন্না! হঠাৎ দিদিমণির হাতটা চেপে ধ'রে—পাঞ্জাবীটা বলে কিনা—'লীলাদেবী! আমি আপনাকে বড্ড ভালবাসি!' মর্ মুখ-পোড়া—তোর মুখে আগুন! দিদিমণি তো ভয় পাবার মেয়ে নয়? হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এমন এক চড় মেরে দিল তার মুখে—যে, অতবড়ো পাঞ্জাবী-পালোয়ান ঘুরে পড়লো যেন পাঁচ বছরের খোকা! শুনতে পাই তার দুটো দাঁত নাকি ভেঙে গেছে। সেই লজ্জায় আর এদিকে আসে না সে……

অস্ফুটস্বরে তরুণ বল্‌লো—কী সর্ব্বনাশ! লীলা এ বাড়ীতে থাক্‌বে কি করে?

—থাক্‌বে না তো!

—কোথায় যাবে তবে?

—আপনার নাম তো তরুণবাবু?

—হ্যাঁ……

—আপনাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে……

—আমাকে নিয়ে? তরুণ বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলো মাধুরীর মুখের দিকে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকে নিয়ে। আমিও তো সঙ্গে যাবো…… আপনাদের কোনো কষ্ট হবে না……

—আমি যদি না যাই?

—হ্যাঁ, না-যেয়ে পারবেন কিনা? দিদিমণি যা জিদ্‌ ধরে, তা' না-করেই ছাড়ে না……

সর্ব্বাঙ্গে জল-ঝরা ওয়াটারপ্রুফ্‌-জড়ানো—লীলা ঘরে ঢুক্‌লো। ওয়াটারপ্রুফ্‌টা মাধুরীর হাতে দিয়ে—ঠক্‌ ক'রে টেবিলের উপর একটা সবুজ রংয়ের ছোট্টো শিশি রেখে বল্‌লো—এই নিন্‌ আপনার স্মেলিং সল্ট্‌!

—কোত্থেকে আন্‌লে?

—ওই তো মোড়ের মাথায় ডিস্‌পেনসারি!

শিশিটা খুলে নাকের কাছে ধ'রে তরুণ বল্‌লো—তুমি নাকি আমাকে কোথায় জোর করেই নিয়ে যাচ্ছ? আই-মিন্‌—কিড্‌ন্যাপ্‌ করছো?

হাস্তে হাস্তে লীলা বল্লো—মাধুরী বল্ছিল বুঝি ?

—হ্যাঁ, মাধুরীর কথা শুনে, আমি একটু ভীত হ'য়ে পড়েছি লীলা !

—ভয় যে আপনার খুব বেশী, তা' বুঝ্তে পেরেছি……কিন্তু এ যুগের ছেলে-মেয়েদের সব চেয়ে বড় কাজ—'ভয়কে জয়-করা'। তা'কি আপনি অস্বীকার করেন ?

—নিশ্চয়ই না। তরুণ বল্লো। তবে—তুমি যে ভাবে পাঞ্জাবী-শাসন করতে পার—সে-ভাবে পাঞ্জাবিণী-শাসন করার শক্তি ও সামর্থ আছে অরুণের, আমার নেই। আমার মুখ দেখে ঠিক বুঝ্তে পারছ না—আমি কিরূপ স্বাস্থ্যবান পুরুষ ! খদ্দরের এই ঢিলে-পাঞ্জাবীটা খুলে ফেল্লে আমার বুকের পাঁজ্‌ড়া গুনে নিতে পারবে। আমার প্রতি খুব অনুকম্পা হবে তোমার—তা'তে কোনো সন্দেহ নেই। সত্যি লীলা ! তোমাকে আমি যতই দেখ্‌ছি—আর তোমার কথা যতই ভাব্‌ছি—ততই মনে হচ্ছে—তোমার উপযুক্ত জীবন-সঙ্গী অরুণ, আমি নই।

চোখমুখ রাঙিয়ে তুলে—একটু উত্তেজিতভাবে লীলা বল্লো—দেখুন তরুণবাবু ! জীবনে একজন সঙ্গী না-জুটলেও জীবনটা আমার ব্যর্থ হবে না। আমার যে বিপদের কথা নিয়ে নির্মম পরিহাস করছেন —আমি জানি—এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া, তার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় নেই আমার। কিন্তু কোথায় যাব ? আমার প্রাণ চায়—ঠাকুরদার সঙ্গে দূর পাড়াগাঁয়ে গিয়ে চির-উপেক্ষিত চাষাভূষোদের সেবা করি। কিন্তু কপালে এক ফোঁটা সিঁদুর না-পরিয়ে ঠাকুরদা আমাকে নিয়ে যেতে রাজী নন্। কি উপায় করি বলুন তো ?

আর একবার স্মেলিংসল্ট শুঁকে তরুণ বল্‌তে লাগ্‌লো—শোনো

লীলা! আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে পরিহাস করিনি। তোমার প্রতি আমার সহানুভূতির নিদর্শন এই স্মেলিং সল্ট! আমার —নার্ভসগুলো শিথিল হ'য়ে পড়েছে। মাথায় অনুভব করছি—অসহ্য রক্তের চাপ! মাধুরীর সঙ্গে আমিও একমত……আমিও স্বীকার করছি যে……

তরুণ আবার স্মেলিং সল্ট শুঁকলো। একটু থেমে বল্‌তে লাগলো —মাধুরী ঠিকই বলেছে—তুমি যা' জিদ্ ধরবে তা' করবেই। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তোমার। তোমার কোনো আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষেও যেন অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ছে! শতমুখে স্বীকার করছি আমি— তুমি অতি—দুর্লভ মেয়ে! তোমাকে যে বিয়ে করবে—সে ভাগ্যবান।

লীলার চোখমুখ যেন বিজয়োল্লাসে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো! তা' লক্ষ্য ক'রে তরুণ মাথাটা একটু চেপে ধরলো। ভাব্‌তে লাগ্‌লো— হঠাৎ 'সারেনডার' ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাড়িয়ে তোলা বোধহয় ঠিক হ'লো না। তবু বল্‌তে লাগ্‌লো—অতি নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি নিয়ে—একটা কথা বল্‌ছি লীলা! কিছু মনে ক'রো না। আমায় ধারণা হচ্ছে— বিয়ের কোনো প্রয়োজন নেই তোমার। দাদু একটি ওলড্-ফুল! তিনি মনে করতে পারেন—সিঁদুর-পরার সংস্কার মেয়েদের জীবনে একটা মস্ত 'এ্যাচিব্‌মেণ্ট'! কিন্তু তুমি কেন তা' মনে করবে? তোমার ভিতর আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—ফরাসী-মহিলা জোয়ানকে! আমার মনে হয়, বিয়ের সিঁদুরের চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান গৌরব-তিলক—তোমার দেশবাসীরাই একদিন পরিয়ে দেবে তোমার কপালে! আমার আঙুলের একফোঁটা সিঁদুর পরে তোমার ওই প্রশস্ত কপালটাকে

খুব ছোট ও সংকীর্ণ ক'রে রাখ্‌বে কেন ? বিয়ের পশু-ধর্ম্ম তো সবার জন্যে নয় ?

—পশুধর্ম্ম ? লীলা অবাক হ'য়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলো……

—নিশ্চয়ই ! তরুণ গর্জ্জে উঠ্‌লো। টেবিলের উপর স্মেলিং সল্টের শিশিটা ঠক্ ক'রে রেখে বল্‌লো—আমাদের শাস্ত্রকাররাই বলেছেন—বিয়ের সাক্ষাৎ-লক্ষ্য পুত্র—আর দূর-লক্ষ্য পিণ্ড ! এই দুটো কামনা নিয়ে—পশু আর মানুষ কি তুল্যভাবেই প্রতিযোগিতা করছে না ? আমার মনে হয়—সভ্যতাগর্ব্বী মানুষের কামনা এর চেয়ে একটু

হঠাৎ বাইরে কড়া-নাড়ার শব্দ শোনা গেল। উৎফুল্ল ভাবে লীলা বল্‌লো—ঠাকুরদা এসেছেন ! মাধুরী ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। অরুণের হাত ধ'রে রায়মশাই ঘরে ঢুক্‌লেন। তরুণকে দেখে বিস্মিত-ভাবে চেয়ে রইলেন লজ্জিত লীলার মুখের দিকে। তিনি অরুণকে টেনে এনেছেন—লীলার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে। রায়মশাই বুঝেছেন—তরুণের সঙ্গে লীলার বিয়ে সম্ভবও নয়, সঙ্গতও য়। তবু তরুণ এখানে কেন ?

অরুণ একটু এগিয়ে গিয়ে, তরুণের কাঁধ চাপ্‌ড়ে বল্‌লো—চিয়ার্‌ াপ্ তরুণ ! বিয়ের তারিখটা কবে ঠিক করলি ?

—কবে হ'লে তোর সুবিধে হয় ?

—ইর্‌রেলেভ্যান্ট্ !

রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—হঠাৎ তুমি এখানে কেন দাদু ?

—অরুণের জন্যে একটু ওকালতি করতে এসেছিলাম……

হো-হো-করে অরুণ হেসে উঠ্‌লো।

তরুণ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর সেই মোটা চিঠির কভারটা অরুণের হাতে দিয়ে বল্‌লো—এই চিঠিখানা মেসে নিয়ে গিয়ে খুব ভাল ক'রে পড়িস্। আমি এখন আসি······কাউকে আর কিছু না-বলেই তরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুণ কভারটা একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে—পকেটে রেখে দিল। লীলা আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অরুণের হাতে তরুণকে চিঠির কভারটা দিতে দেখে সে যেন যন্ত্রণা-কাতর অপারেশানের রোগীর মত অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠ্‌লো! তরুণ এত নির্ম্মম—এত বিশ্বাসঘাতক!

লীলাদের বাড়ীর সদর-দরজা দিয়ে বেরিয়ে—ফুটপাথ ধরে সাম্‌নে একটু এগিয়ে গেলেই ডাইনে পড়ে একটা সরুগলি। সেই গলিটা ট্রামবাসের বড় রাস্তায় পৌঁছাবার সর্টকাট্। ছোটবেলায় তরুণরা এই পাড়াতেই থাক্‌তো। তরুণের বাবা করতেন সওদাগরী-আপীসে চাকরী। প্রফেসার চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে ছিল তাঁর খুব অন্তরঙ্গতা। লীলাকে খুব ভালবাস্‌তেন তিনি। এখন রিটায়ার ক'রে দেশের বাড়ীতে গিয়ে বাস করছেন। ফুটপাথে বেরিয়ে এই সব বাল্যস্মৃতি তরুণের মনে পড়ে গেল। সেই সরু গলিটার সাম্‌নে এসে থম্‌কে দাঁড়াল সে।

পূর্ণিমা রাত্রি। জল-ঝড়ের পর—নীলাকাশের পূর্ণচন্দ্র যেন, যম-দূতের মত বৈশাখী-কালো-মেঘের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠেছেন। তাঁর শুভ্র জ্যোছনা-হাসি ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। গরমের দিনে বর্ষণান্তের এই স্নিগ্ধ-সজল আবহাওয়া তরুণের মনটাকে খুব প্রফুল্ল ক'রে তুলেছিল। সে গান গাইতে জান্‌তো। গুণগুণ ক'রে নিজের লেখা একটা গানের সুর আলাপ

করতে করতে—চললো সেই সরু পথে, ট্রাম ধরবার উদ্দেশ্যে। রাত্রি তখন মাত্র সাড়ে আটটা।

অতি আধুনিক ভাঙা-ভাঙা সুরে তরুণ গেয়ে চলেছে—

ওই চাঁদে আর সেই চাঁদে কি—
মন-মুকুরে তফাৎ দেখি?
জ্যোছনা-হাসি ছড়াও যত পারো,
অঙ্গে মেখে পাগল হবো—
চাইবো—আরো—আরো!
অনুরাগের দীপ-শিখারে—
নিবিয়ে দিতে কেউ কি পারে?
চোখ বুজে আজ দেখ্‌বো তোমায়—
ভাব্‌বো না আর—ভাব্‌ছে কে-কি?

গলিটার পাশের দেওয়ালে লীলাদের খিড়কীর দরজা। হঠাৎ দরজাটা খুলে, গানে বাধা দিয়ে লীলা ডাক্‌লো—তরুণবাবু!

তরুণ চমকে উঠ্‌লো—কে? লীলা?

—হ্যাঁ……একটু দাঁড়ান……একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো……… লীলা বললো।

তরুণ দাঁড়িয়ে পড়্‌লো—স্নিগ্ধ জ্যোছনালোকে। লীলার চোখে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। লীলা নিজে দাঁড়িয়েছিল—পাঁচালের অন্ধকার-ছায়ায়।

অধৈর্য্যভাবে তরুণ বললো—এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা-বলাটা তো খুব শোভন হবে না লীলা! কি বলবে শীগ্‌গীর বলো… …

—আমার চিঠিখানা অরুণবাবুকে দেওয়া কি খুব শোভন হয়েছে?

—তোমার চিঠিতে তো এমন কিছু নেই—যা' তুমি অরুণকে জানতে দিতে চাও না?

—তবু, সে চিঠি আমি আপনাকেই লিখেছি—তাঁকে নয়। কোনো আত্মনিবেদিতার প্রাণের গোপন-কথাগুলি—আর কাউকে জানানো, শুধু অভদ্রতা নয়—অতি নির্মম বিশ্বাসঘাতকতা! লীলা কেঁদে ফেললো।

অপ্রস্তুত ভাবে তরুণ বললো—আমাকে ক্ষমা করো লীলা! এই চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে পূর্ণচন্দ্রকে সাক্ষী রেখে বলছি—তুমি আমার দর্পচূর্ণ করেছ! আমি স্বীকার করছি যে—আমাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি—তোমার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে। চোখের জল মুছে ফেলো……

সেই নির্জ্জন গলির মধ্যে তারা দু'জনেই যেন—স্বপ্নলোকে এসে দাঁড়িয়েছে। জাগ্রত মানুষের ভাব ও ভাষার সংযম রক্ষা করতে পারছে না। উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে কেঁদে লীলা বললো—তবে, কেন? কেন সে-চিঠি দিলেন অরুণবাবুকে? আপনার উদ্দেশ্য কি?

একটু নিকটে এগিয়ে নীচুস্বরে তরুণ বললো—তোমাকে পাবার পথ পরিষ্কার-করা! অরুণ আমার বন্ধু। তার মনের খবরও তো আমি জানি? সে যদি ও-চিঠি পড়েও তোমাকে তার মন থেকে মুক্তি দিতে না-পারে—তাহলে আমি নিশ্চয়ই পাবনা, বা পাবার আশাও করবো না! বিদায়—লীলা! বিদায়…আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি……

তরুণ ছুটে চলে গেল।

লীলা বহুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবলো! তারপর মনে মনে

বল্‌তে লাগলো—না, না, তা' হ'তে পারে না। ও চিঠি আমি কিছুতেই পড়তে দেবনা অরুণবাবুকে……

বারান্দায় একটা অজিনাসন বিছিয়ে—রায়মশাই আহ্নিকে ব'সে ছিলেন। অরুণ বহুক্ষণ ছিল একলাটি বসে, লীলার পড়ার ঘরে। তার সঙ্গে দু'টো কথা বল্‌বার গরজও যেন এ বাড়িতে কারো নেই। কথাকে রবারের মত টেনে-লম্বা করবার আশ্চর্য্য দক্ষতা যার আছে—শ্রোতা যার সম্ভাষণকে সঙ্কট মনে করেন—সেই মাধুরীও একবার এঘরে এলো না। বা, মুখ-শেলাই ক'রে এককাপ চা দিয়ে যাবার সৌজন্যও দেখালো না!

অরুণের ভারি বিশ্রী লাগ্‌ছিলো। তবু রায়মশাই হাত ধরে টেনে এনেছেন। তাঁকে একটা কথা না-ব'লেই বা চ'লে যাবে কি করে? পকেট থেকে চিঠিখানা বের ক'রে পড়তে বস্‌লো সে……

হঠাৎ ঝড়ের মত লীলা এসে ঢুক্‌লো—ঘরে। বাধা দিয়ে বল্‌লো—পরের চিঠি পড়বেন না অরুণবাবু!

স্থির-দৃষ্টিতে লীলার মুখের দিকে চেয়ে অরুণ বল্‌লো—'চিঠি' বলেই 'পরের চিঠি'—নিজের কাছে নিজে তো কেউ চিঠি লেখে না লীলা?

—যে-চিঠি আপনাকে লেখা হয়নি—তা' আপনি কেন পড়বেন? কি অধিকার আছে আপনার?

—আমাকে লেখা হয়নি সত্যি, কিন্তু পড়তে-দেওয়া হয়েছে লেখিকার সাম্‌নেই। তখন কেন প্রতিবাদ করলেন না তিনি?

—তা'হলে ও চিঠি আপনি পড়বেন?

—বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা-করা কি অন্যায় হবে না? তুমিই বলো……

—বন্ধু অনুরোধ করেছিলেন—মেসে নিয়ে পড়তে। এখানে ব'সে পড়্ছেন কেন?

ভাঁজ ক'রে চিঠিখানা কভারের ভিতর রাখ্তে রাখ্তে অরুণ বললো —একথা তুমি বল্তে পার—আমি মাথা হেঁট্ করছি। দেখো লীলা! দু'টো মিষ্টি কথা যে তুমি আর কখ্খনো বল্বেনা আমাকে—তা আমি জান্তাম। তবু কেন এসেছি জানো?

—কেন, বলুন তো?

—আজ তুমি চোখ রাঙিয়ে, যত রূঢ় কথাই বলোনা কেন—তা' আমার খুব ভালো লাগবে। হাসিমুখে সব অপমান সহ্য করতে পারবো আমি—এমন একটা মনের অবস্থা তৈরি করে ফেলেছি। সোজা লীলার মুখের দিকে চেয়ে—অরুণ একটু উপেক্ষার হাসি হাস্লো।

উত্তেজিতভাবে লীলা বল্লো—আপনার মধ্যে শুধু নির্লজ্জতা নয়, অতি নিষ্ঠুর পরিহাসপ্রিয়তাও আছে। মানুষের প্রাণে ব্যথা দিয়ে খুব আনন্দ পান আপনি! সেদিনকার সেই তিক্ত ঘটনার পর—আপনি যে এখানে এসে আবার মুখ-দেখাতে পারবেন, এ ধারণা আমার ছিল না।

—আজ আমি নিজে আসিনি লীলা!

—কে আপনাকে গলবস্ত্রে নেমন্তন্ন ক'রে এনেছে—তা' আমি জানি না। মাত্তর এইটুকু জানি যে—আত্মসম্মান-বোধ নিয়ে আপনার মত কোনো ভদ্রলোকই এখানে আর আস্তে পারেন না।

—আজও কি আমাকে সেইভাবে তাড়িয়ে দিতে চাও?

—ভদ্রসমাজে তাড়িয়ে দেবার ভাষা, বোধ হয় এর চেয়ে আর বেশী পরিষ্কার হওয়া উচিত নয়······

কিছুপূর্ব্বে রায়মশাই ঘরে ঢুকে, দুজনের ঝগড়া শুন্ছিলেন। হঠাৎ

বলে উঠলেন—অরুণকে আজ তাড়িয়ে দিলে, আমাকেও তাড়িয়ে দেওয়া হবে লীলা! কারণ, আমিই ওকে—হাত ধরে টেনে এনেছি······

রায়মশাইয়ের দিকে ফিরে, লীলা তাঁর পাদু'টি জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠলো—ঠাকুরদা! আমার বিয়ের প্রয়োজন নেই। আমি আপনার সঙ্গে যাবো সেই পল্লী-আশ্রমে—'চিরদিন' থাকবো আপনার কাছে······

রায়মশাই হেসে বললেন—আমার 'চিরদিন' মানে তো আর পাঁচ বছর? কিংবা খুব বেশী জোড়াতালি দিয়ে আর রিফুকর্ম্ম ক'রে—না হয় আর দশ বছর! এই তো? বলি দিদিমণি! এ কথাটা কি ভেবেছ? বিয়ে তোমাকে একটা দিতেই হবে! মৃত্যুকালে নীলমণিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। চলো অরুণ, এখানে বসিয়ে রেখে তোমাকে আর অপমানিত করবো না। আর-একবার তরুণের সঙ্গে দেখা করবো আজই—তারপর অন্য ছেলে খুঁজবো···লীলার বিয়ে দেবই এই মাসের মধ্যে, আমার এ সঙ্কল্প স্থির।

রায়মশাই তাঁর মনের মধ্যে একটি প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কেন তরুণ এসে গোপনে দেখা ক'রে গেল লীলার সঙ্গে? তিনি যখন হাত ধরে টানাটানি করেছিলেন—তখন তো সে ছিল পাহাড়ের মত অচল ও অটল! হঠাৎ শ্রীমান পাহাড় কেন ছুটে এলেন লীলার সঙ্গে দেখা করতে? এমন গোপন দেখাশুনা কি এই পাহাড়ী ছেলে-মেয়ে দু'টি মাঝে মাঝে ক'রে থাকেন? তবে কি তরুণ তার বন্ধুকে করছে প্রতারণা, আর এই বুড়ো দাদুকে করছে—অতি নির্ম্মম পরিহাস? নিশ্চয়ই গোপনে গোপনে লীলা ও তরুণ দু'জনাই ডুবে আছে—পরস্পরের আকণ্ঠ ভালবাসায়। এ ধারণা রায়মশাইয়ের মনে ক্রমেই বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

(৩)

তরুণের রুমমেট্ ছিলেন—একজন আধাবয়সী আপীসের কেরাণী। লোকটি অতি নির্ব্বিরোধ ও স্বল্পভাষী। মেস্-মেম্বররা তাঁকে 'ওয়েদার-কক্' ব'লে ডাক্‌তো। কারণ একই সময়ে, তর্কের সপক্ষে ও বিপক্ষে সায় দিয়ে, অতি আশ্চর্য্যভাবে সবারই মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন তিনি। কখনো, কারো, কোনো কথার প্রতিবাদ করেছেন—এ দুর্ণাম কেউ তাকে দিতে পারতো না।

হঠাৎ একদিন মেস্-মেম্বররা আবিস্কার ক'রলো—ওয়েদার-কক্ বিবাহিত! অথচ, গত পাঁচ বছরের ভিতর কেউ কখনো দেখেনি তাঁকে—মেস ত্যাগ ক'রে একটি দিনের জন্যেও কোথাও যেতে। অনুসন্ধানে জানা গেল—কোনো গুরুর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে তিনি নাকি স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল—কদলী দেবী।

একদিন ওয়েদার-ককের শ্বশুরবাড়ীর দেশ থেকে একটি ভদ্রলোক এসে মেসের হাটে হাঁড়ি ভাঙ্‌লেন। সেই সর্ব্বংসহ মহাপুরুষকে চটাবার খুব সহজ উপায় নাকি 'কদলী' কথাটি উচ্চারণ করা, বা দূর হ'তে একটি 'কদলী' দেখানো!

সেই দিন থেকে মেস-মেম্বররা অত্যন্ত কদলীপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌লেন। সকলে মিলে বৈঠকে ব'সে ঠিক্ করলেন—মেসে একটা 'কদলী ডে' উদ্‌যাপন করা হোক। এলো জলযোগের দই আর মিউনিসিপাল মার্কেট থেকে একরাশ অতি পুষ্ট মর্ত্তমান কলা।

কিছুদিন ওয়েদার-কক্ চোখবুজে ও কানে আঙুল দিয়ে, ব্রিজের

অবস্থা সাম্য রাখ্‌বার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু 'কদলী ভে'ত্তে আর পেরে উঠলেন না। হঠাৎ আরক্ত মেত্রে চিৎকার ক'রে বলে উঠ্‌লেন —আপনারা সব মেসে না-থেকে গাছে গাছে হুপ্‌-হাপ্‌ ক'রে বেড়ালেই বোধহয় ভাল হ'তো!

সারা মেসে তখন এমন একটা হাসির রোল উঠেছিল যে—রাস্তার লোকেও ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করেছিল—ব্যাপার কি মশাই?

ক্রমে কথাটা বাইরের লোকেও জান্‌তে আরম্ভ করলো। কারো কারো আশঙ্কা হ'লো—হয়তো শীগ্‌গীরই একটা 'অল বেঙ্গল-কদলী ডে' উদ্‌যাপিত হবে। অতি অল্প দিনের মধ্যেই ওয়েদার-কক্‌ অত্যন্ত বেসামাল হ'য়ে পড়লেন। তাঁর স্বল্প-ভাষিতা আর রইলো না। মাঝে মাঝে অশ্রাব্য গালিগালাজও বেরিয়ে পড়তে লাগ্‌লো—তাঁর মুখ দিয়ে। এম, বি-ডাক্তার অরুণ মন্তব্য করলো—ওয়েদার-ককের 'মস্তিষ্ক-মেসিনারীর' কয়েকটি 'স্ক্রু' নাকি 'লুজ্‌' হয়ে গেছে!

মেসের এই উচ্ছৃঙ্খল আনন্দোপভোগে তরুণ কখনো যোগদান করেনি। সে বলতো দুর্ব্বলকে নির্য্যাতন করার এই দুষ্প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে পশুত্বের নগ্ন-বিকাশ! আর টিক্‌তে না-পেরে, ওয়েদার-কক্‌ যেদিন ছল্‌ছল্‌ চোখে মেস ত্যাগ করে চলে গেলেন—তরুণ নাকি সে দিন অনশন-প্রায়শ্চিত্ত করেছিল।

ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় ছ'মাস আগে। ওয়েদার-ককের সিটে আজও কোনো নূতন মেম্বর আসেনি। তরুণের রুমে সে এখন একাই থাকে।

একদিন অরুণ জিজ্ঞাসা করেছিল—আমি আস্‌বো তোর রুমে?

গম্ভীরভাবে তরুণ বলেছিল—না। দাদু বলেছেন—'ক্যামিষ্ট্রি বাইট ব্রিড্‌স্‌ কনটেম্পট্‌!'

হঠাৎ আজ রাত্রি প্রায় দশটার সময় অরুণকে সঙ্গে নিয়ে রায়মশাই এসে উঠ্লেন মেসে। তরুণ তখন নিবিষ্ট মনে কবিতা লিখ্ছিলো।

—আসুন দাদু! হঠাৎ এতরাত্রে কি মনে করে? তরুণ জিজ্ঞাসা করলো।

—তোমাদের এই মেসে আজ রাত্রিবাস করবো·········আপত্তি নেই তো?

বিস্ময় প্রকাশ ক'রে তরুণ বল্লো—নাত্নীর আদর-যত্ন ছেড়ে মেসের কষ্ট সইতে আস্বার কারণটা তো ঠিক বুঝ্লাম না?

—নাত্নী বলেছে তার বাড়ীর বাতাসে কোনো-পুরুষের গন্ধ আর সহ্য করবে না সে······

—প্রায় দশবছর পরে—আজ আপনার নাত্নীকে দেখে এলাম। তার পৌরুষ, আমাদের মত পুরুষের চেয়ে ঢের বেশী······

—তাই নাকি? রায়মশাই একটু হাস্লেন।

তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—রাত্রে কি খাবেন বলুন তো?

—যা জোটে······

—আচ্ছা, আমি ঠাকুরকে বলে আসি। তরুণ বেরিয়ে গেল। রায়মশাই অরুণকে কাছে ডাকলেন।

—শোনো অরুণ! আমার বিশ্বাস, লীলা-সম্বন্ধে তরুণ তোমাকে প্রতারণা করছে······

অরুণ একটু হেসে বল্লো—তরুণকে আপনি চেনেন না। তার ভিতর কোনো নীচতা নেই। সে যে আমার জন্যেই ওকালতি করতে গিয়েছিল···এ কৈফিয়ৎ আমি বিশ্বাস করি······

—তুমি বিশ্বাস করো?

—হ্যাঁ, বিশ্বাস করি। তাকে অবিশ্বাস করতে হবে—এরূপ কোনো প্রস্তাব আমার কাছে করবেন না। তা'তে আমার প্রাণে খুব ব্যথা লাগে······

তীক্ষ্ণভাবে অরুণের মুখের দিকে চেয়ে রায়মশাই বল্লেন—তা'হলে তরুণের কৈফিয়ৎটা শুনে, ওভাবে হেসে উঠেছিলে কেন?

—আমাদের বাইরের হাসিঠাট্টা দেখে ভিতরটাকে বিচার করবেন না।

—হুঁ, আচ্ছা। আমি প্রথম-রাত্রে একটু ঘুমিয়ে নেব। তারপর তরুণকে জাগাবো শেষ-রাত্রে। ভোরের দিকে তোমাকে বলে যাব—তোমাদের দুজনার মধ্যে বেশী মূর্খ কে! তুমি তো পাশের ঘরেই থাকো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এখন আসি তা'হলে······

—একটা কথা শুনে যাও অরুণ! আমারও ধারণা তরুণের ভিতর কোনো হীনতা থাকতে পারে না। কারণ, তাকে পেটে ধরেছিল—আমার মেয়ে সুশীলা—যাকে 'মূর্ত্তিমতী—পবিত্রতা' বল্লে—বাড়িয়ে বলা হয় না। তাইতো আমি অত্যন্ত আগ্রহ বোধ করছি—তরুণকে একটু জান্‌বার ও বুঝ্‌বার। অন্য-কিছু মনে ক'রো না তুমি···

অরুণ বেরিয়ে গেল। সে কথার কোনো জবাব দিল না।

রাত্রে আহারাদির পর—রায়মশাইয়ের শয়নের ব্যবস্থা হলো—ওস্বোদার-করের পরিত্যক্ত খাটিয়ার উপর। তরুণ তার টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে পড়তে বস্‌লো—"হিউম্যানিটি আপ্‌রুটেড"। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আলো জ্বেলে ব'সে রইলো সে।

নিজের ঘরে গিয়ে অরুণ পড়তে বস্‌লো—লীলার সেই সাতপাতা চিঠি।

অরুণের বিরুদ্ধে লীলার অভিযোগ—সে নাকি স্বার্থান্বেষী ও আত্মসুখপরায়ণ। অরুণ হেসে উঠ্‌লো। মনে মনে বল্‌লো—লীলা, তোমাকে আর বিপন্ন করবো না আমি······বালিশে মাথা রেখে বহুক্ষণ শুয়ে থাক্‌লো সে, কিন্তু ঘুম হলো না। উঠে গিয়ে বাইরের বারান্দায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো—আকাশের দিকে চেয়ে। আকাশ খুব গাঢ় নীল বলেই তো, চাঁদের রজতশুভ্র স্নিগ্ধ কিরণ মানুষের কাছে এত মিষ্টি! আকাশ যদি দুধের মত সাদা হতো, আবলুসের মত কালো না-হ'লে চাঁদকে তো চেনাই যেত না!

গরমের রাত্রি। তরুণের রুমের দরজাটা খোলাই ছিল। র মশাই ঘুমুচ্ছিলেন। চোরের মত লঘু পায়ে অরুণ গিয়ে বস্‌লো তরুণের পাশে।

বিস্মিতভাবে মুখের দিকে চেয়ে তরুণ বল্‌লো—এখানো জেগে আছিস্?

নীচুস্বরে অরুণ বল্‌লো—দাদু ঘুমিয়ে পড়েছেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—এই নে তোর চিঠি!

চিঠির কভারটা হাতে নিয়ে তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—ভাল ক'রে পড়েছিস্?

—হ্যাঁ······

—তোর সম্বন্ধে লীলার এমন বিশ্রী ধারণা কেন হ'লো? বল্‌তে পারিস্?

—তোর দাদু তো বলছেন—মাঝে মাঝে গোপনে দেখা ক'রে, ধারণাটা তৈরি করেছিস্ তুই! লীলাকে তুই ভালবাসিস্।

তরুণ চম্‌কে উঠ্‌লো। অস্ফুটস্বরে বল্‌লো—তাই নাকি? দাদু তো বড় ভয়ানক লোক! সত্যিই কি এমন কথা বলেছেন তিনি?

হঠাৎ তরুণের হাতখানা চেপে ধ'রে উচ্ছ্বসিত ভাবে অরুণ বল্‌লো—আমার অনুরোধ—লীলাকে তুই বিয়ে কর। আমি তা'তে খুব সুখী হবো······

—কখ্‌খনো না। একটু নড়ে চড়ে শক্ত হ'য়ে ব'সে তরুণ তার বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করলো। রায়মশাইয়ের মিথ্যা সন্দেহে—তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল।

হঠাৎ রায়মশাই শয্যার উপর উঠে বস্‌লেন। তারপর, চোখ দুটো রগ্‌ড়ে বল্‌লেন—আলোটা এদিকে একবার আনো তো ভায়া!

তিনি কি এতক্ষণ জেগে ছিলেন? তরুণ ও অরুণ দু'জনাই উঠে দাঁড়ালো। আলোটা নিয়ে কাছে গিয়ে দেখ্‌লো—এক সঙ্গে প্রায় সহস্র ছারপোকা আক্রমণ করেছে তাঁকে। সে যেন ভীষ্মের শরশয্যা!

রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—এ খাটিয়াতে শয়ন করতেন কে?

অরুণ বললো—ওয়েদার-কক্!

—ডাল-ভাতের মেসে—সাহেব! অবাক্ হ'য়ে অরুণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

অরুণ একটু হেসে বল্‌লো—না, তিনি সাহেব নন্······অতি সংক্ষেপে 'ওয়েদার-কক্ ও কদলী' উপাখ্যানটি জানিয়ে দিল তাঁকে।

রায়মশাই বল্‌লেন—তোমাদের ওয়েদার-কক্‌টি মানুষ নন্—নিশ্চয়ই কোনো বুনো জানোয়ার!

অরুণ হেসে বল্‌লো—আমাদের ধারণাও ঠিক্ তাই······

প্রতিবাদ জানিয়ে তরুণ বল্‌লো—পরমসহিষ্ণু সাধু-মহাপুরুষও তো বলা যায় তাঁকে?

একটু বিরক্তির ভাবে রায়মশাই বল্‌লেন—রেখে দাও তোমার পরম-সহিষ্ণুতা! এতগুলো ছারপোকা একসঙ্গে কামড়ালেও যাঁর সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘট্‌তো না—তাঁর বৌ-ত্যাগ করার কি প্রয়োজন ছিল? নিশ্চয়ই তাঁর গাত্রচর্ম্মে আছে মনুষ্যোচিত বোধশক্তির অভাব। সহিষ্ণুতা আর 'অসাড়তা' এক কথা নয়।

ঠিক্ বলেছেন দাদু! অরুণ—হেসে উঠ্‌লো। তরুণ খুব শীগ্‌গীরই তুলসীর মালা গলায় বেঁধে—'তরোরিব সহিষ্ণু' হ'তে চেষ্টা করছে। বলেই অরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল......

বাধা দিয়ে রায়মশাই বল্‌লেন—যেওনা অরুণ, একটু ব'সো। লীলার বিয়ে-সম্বন্ধে তামাদের দুজনের সঙ্গেই গোটা-কতো কথা আলোচনা করবো......

অরুণ বস্‌লো না। তরুণের পিছন দিকে, চেয়ারের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলো।

রায়মশাই বল্‌তে লাগলেন—শোনো অরুণ, আগে তোমাকেই বলি। তুমি বুদ্ধিমান। হয়তো তোমার সঙ্গে বিয়ে হলেই লীলা সুখী হতো—নীলমণির এ ধারণা মিথ্যা নয়। কিন্তু উপায় কি? মেয়েদের মনে যখন কোনো বিরক্তি বা বিতৃষ্ণা গ'ড়ে ওঠে, তার মূলে কোনো যুক্তি থাক্ বা না-থাক্—তাকে দূর করা খুব সহজ-সাধ্য নয়। তাদের অনুরক্তি বা আসক্তির বেলায়ও ঠিক ওই কথা খাটে। তাই, বিয়ের দায়িত্বটা আগে চাপিয়ে দিতে পারলে, খানিকটা সফলতা আশা করা যায়। মেয়েদের সম্বন্ধে কবি বলেছেন—"কবিতা-বনিতাচৈব সুখদা

স্বয়মাগতা!" জোর-জবরদস্তির ফলে—"বলাদাকৃষ্টমানা"কে নিয়ে সংসার-ধর্ম্ম করা চলে না।

একটু বিরক্তি প্রকাশ করে অরুণ বল্‌লো—আমাকে ওসব কথা আর কেন বলছেন? আমার বক্তব্য আমি তরুণকে বলেছি······

—কি বলেছিস্? তরুণ জিজ্ঞাসা করলো।

—বলেছি, লীলাকে তুই বিয়ে কর্—আমার আপত্তি নেই।

ঘাড়টা ফিরিয়ে খুব সোজাসুজি অরুণের মুখের দিকে চেয়ে তরুণ বল্‌লো—কাল যদি তুই সুইসাইড্ করিস্—পরশু আমি নিশ্চয়ই লীলাকে বিয়ে করবো। রাজী আছিস্?

—তার আর দরকার হবে না তরুণ, সে কথা ভুলে যা······বলেই অরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রায়মশাই বিস্মিতভাবে তরুণের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—অরুণ তোমার বন্ধু! এতবড় নির্ম্মম-কথাটা কি ক'রে তাকে বল্‌লে দাদু?

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে তরুণ বল্‌লো—আপনি এসে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ুন······

—ঘুম না পেলে শুয়ে-পড়ার কি কোনো মানে হয়? মানুষকে জাগিয়ে রাখে—তার মনের চাঞ্চল্য। লীলার বিয়ের একটা পাকা কথা হয়ে গেলেই আমি ঘুমিয়ে পড়তে পারি······

বিরক্তভাবে তরুণ বল্‌লো—আমি আর অরুণ ছাড়া, দেশে কি ছেলে নেই?

—কেন থাক্‌বে না—ঢের আছে। কিন্তু, লীলা যে তোমার জন্যে উন্মাদ—তুমি তার 'দূরের রজত-রেখা'! এই সব উৎকট ভালবাসার অন্য নাম আহাম্মুকী ছাড়া আর কি বলতে পারি? পাত্র-হিসাবে অরুণ

যে তোমার চেয়ে ঢের ভালো—একথা নীলমণিও বল্‌তো—আমিও বল্‌ছি······তবু দেখেছ তো ? তার পড়ার টেবিলের উপর তোমার ফটো ! সবাক মানুষের চেয়ে, তার নির্ব্বাক ফটোর ভিতর অনেক বেশী কাল্পনিক সৌন্দর্য্য আরোপ করা যায়। কিন্তু বাস্তব জীবনে যে তা' একেবারেই মিথ্যে হ'য়ে ওঠে, একথাটা আজ-কালকার তরুণ-তরুণীরা মোটেই বোঝেন না !

—আমার ফটো লীলার কাছে কি ক'রে গেল—বল্‌তে পারেন ?

—শুনেছি অরুণ দিয়েছে······

—আমি লীলাকে বিয়ে করবো না, আপনি অন্য ছেলে খুঁজুন······

কথা কয়টি খুব স্পষ্ট ভাবে বলে, তরুণ চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে বস্‌লো। তারপর 'হিউম্যানিটি আপ্‌রুটেড্‌' পড়তে মনোনিবেশ করলো।

রায়মশাই আর কি করবেন ? বাকি রাতটুকু ছারপোকা-বধের পুণ্য-সঞ্চয় ক'রে কাটাতে লাগ্‌লেন।

বহুক্ষণ ঘরটিতে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। হঠাৎ তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা দাদু ! আমার মা বিষ খেয়েছিলেন কেন, তা আপনি জানেন ?

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটার জন্যে রায়মশাই মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎ তাঁর উজ্জ্বল গৌরকান্তি যেন সর্পাঘাতে বিবর্ণ হ'য়ে গেল। দু'হাতে দেহের ভারকেন্দ্র ঠিক রেখে, সামনের দিকে ঝুঁকে, মাথাটা একটু নীচু করলেন তিনি। কোনো জবাব না দিয়ে আফিং-খোরের মত ঝিমুতে লাগ্‌লেন।

তাঁর এই ভাবান্তরের কারণ কিছুই বুঝতে না পেরে তরুণ বল্‌তে যাচ্ছিল—বাবার কাছে শুনেছি······

—কি শুনেছ? বলো, বলো······অধৈর্য্য ভাবে প্রশ্ন করলেন রায়-মশাই।

—আমার মা নাকি ছিলেন অত্যন্ত অভিমানিনী? খুব সামান্য কারণেই হঠাৎ একদিন······

বাধা দিয়ে রায়মশাই চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—না, না, কারণটা খুব সামান্য নয়। তোমার বাবা মিছে কথা বলেছে······

একখানা হাত-পাখা টেনে নিয়ে মাথায় খানিকটা বাতাস ক'রে তিনি আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—তোমার বাবা একদিন তাকে বলেছিলেন, 'মাতালের মেয়ে'!

তরুণ চম্‌কে উঠ্‌লো—আপনি মদ্ খান্?

রায়মশাইয়ের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। তবু মুখটা বিকৃত ক'রে একটু হেসে বল্‌লেন—দূর পাগল্! এখন কেন খাবো? তখন খেতাম। এত বেশী খেতাম যে অনেক সময় ছিপি খুল্‌বার দেরিও সইতো না। বোতলের মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে, হড়হড় করে ঢেলে দিতাম মুখের ভিতরে।

তরুণ অবাক্ হ'য়ে মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লো—তাই নাকি? এমন ভয়ানক মাতাল ছিলেন আপনি?

একটি পাঁচ-বছরের বালকের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লেন রায়মশাই। কিছুপরে চোখ-মুখ মুছে সংযত হয়ে বল্‌লেন—শুধু তোমার মা মরেনি দাদু! সেই দুর্দ্দান্ত মাতাল 'ফুলবাবু'ও মরেছে—যার 'সেরি-শ্যাম্পেন' আস্‌তো সাহেব বাড়ি থেকে। তুমি কি বল্‌তে চাও—তিনি আর আমি এক ব্যক্তি? মদ তো দূরের কথা—সত্যি বল্‌তে, এখন আমি জল ছাড়া অন্য কোনো পানীয়ের আস্বাদ কেমন—তাও জানি না। তবু

কি আমার একমাত্র আদুরে মেয়ের বিষ-খেয়ে-মরার প্রায়শ্চিত্তটা হচ্ছে না? রায়মশাই ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লেন।

পাশের ঘরে অরুণও জেগে আছে। অনুতপ্তের সে বুক ফাঁটা কান্না তার কানেও পৌঁছেচে। বাইরে ছুটে এলো বটে, কিন্তু সে ঘরে ঢুক্‌লো না। কি যেন ভেবে—অর্দ্ধেক খোলা দরজার পাশে চুপ্‌টি করে দাঁড়িয়ে থাক্‌লো।

তরুণের চোখ দুটো সজল হয়ে উঠেছিল। নিকটে এসে অনুনয়ের সুরে বল্‌লো—উঠে আসুন দাদু! আমার বিছানায় শুয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করুন—আমি বাতাস করি……

রায়মশাই বল্‌লেন—আমার বুকে লীলা আজ সুশীলার ঠাঁই নিয়েছে। তাকে একটা বিয়ে দিতে না পারলে—ঘুম তো আমার আর হবে না ভাই!

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ একটু হেসে তরুণ বল্‌লো—আচ্ছা দাদু! বিয়ের পর লীলাকে যদি আমি কোনো দিন বলি—'মাতালের বোন্'—সেও তো বিষ খেতে পারে? তার দাদাও তো উচ্ছৃঙ্খল মাতাল?

হঠাৎ রায়মশাই উঠে দাঁড়ালেন। চাদরটা কাঁধের উপর ফেলে বল্‌লেন—আচ্ছা, আমি এখন আসি তা'হলে? অনেক বিরক্ত করলাম—কিছু মনে করো না……

—এত রাত্রে কোথায় যাবেন?

—দিবারাত্রির ভেদ-বিচার এ পাপাত্মার কাছে আগেও ছিল না, এখনো নেই। আগে ছিল সব অন্ধকার। এখন হয়েছে সব আলো,

সব ভালো, সব সুন্দর! পিছনটাকে সম্পূর্ণ ভুলে—সামনে পা-চালানোই এখন আমার একমাত্র নেশা। তোমার চেয়ে বেশী আপন আজ আর আমার কে আছে দাদু? তবু তোমার সাথে কোনো দিন দেখা করিনি—আজও ইচ্ছা ছিল না যে দেখা করি। কেন জানো? পাছে তোমার মাকে মনে পড়ে। লীলাকে চোখের সামনে রেখে, আমি সুশীলাকে ভুলে থাকি। লীলার সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে না হয়—তা'হলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ এই প্রথম ও এই শেষ!

রায়মশাই দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে যেতেই অরুণ ঢুক্‌লো ঘরে। হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে—বুড়োকে সে বসালো তরুণের বিছানায়। তারপর খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌লো—আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি দাদু! তরুণ বিয়ে করবে লীলাকে। পাঁজী দেখে একটা দিন ঠিক্ করুন—কালই ওর বাবাকে 'তার' ক'রে দি'……

—তুমি কথা দিচ্ছ অরুণ?

—অ্যাজ্ঞে হ্যাঁ। আর একথাটাও নিশ্চয় জানবেন—লীলার সঙ্গে বিয়ে ব্যাপারে—আমার কথা-দেওয়ার মূল্য—তরুণের নিজের দেওয়ার চেয়ে ঢের বেশী……

অরুণের চোখ-মুখের দৃঢ়তা দেখে তরুণ বল্‌লো—আর একটা দিন আমাকে সময় দে অরুণ! আর একবার আমি লীলার সঙ্গে দেখা করে আসি…

—নো, নো, নো, অরুণ একটু উত্তেজিত ভাবে বল্‌লো—ম্যারি হার ইউ মাসট্……ইউ মাসট্……

ঢং, ঢং, ঢং—অরুণের নো-নো-নোর সঙ্গে তাল রেখে—দূরের একটা পেটা-ঘড়িতে তিনটা বাজ্‌লো। ঘরের মধ্যেও ত্রিকালের

প্রতীক তিনজন—অতীত-রায়মশাই, বর্ত্তমান-অরুণ, ও ভবিষ্যৎ-তরুণ! দেওয়ালের একটা টিক্‌টিকিও ব'লে উঠ্‌লো—ঠিক্‌, ঠিক্‌, ঠিক্‌!

পরের দিন সকালে রায়মশাই খুব হৃষ্টচিত্তে বাড়িতে ঢুকে—লীলাকে ডাক্‌লেন—দিদিমণি! আমাকে মিষ্টিমুখ করাও—তরুণের সঙ্গেই তোমার বিয়ে ঠিক ক'রে এলাম। মাধুরী ছুটে এলো—তাই নাকি, তাই নাকি ঠাকুরদা? তারিখটা কবে?

—এ মাসে অনেক দিন আছে—তরুণের বাবাকে তার করা হয়েছে, তিনি এসে পৌঁছালেই—তারিখ ঠিক হবে……

বিকেলে তরুণ এসে হাজির। মাধুরী ছুটে গিয়ে অভ্যর্থনা করলো—আসুন—জামাইবাবু! বসুন……

লীলা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখ-মুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো। তরুণ তো বেজায় অপ্রস্তুত! এরূপ অদ্ভুত অভ্যর্থনার জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত হ'য়ে আসেনি। তবু একটু হেসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লো, লীলার পড়ার ঘরে। লীলার দিকে চেয়ে বল্‌লো—তোমার ঠাকুরদা কোথায় লীলা?

মাধুরী বল্‌লো—ভিতরেই আছেন—ডেকে দেব?

—না, তেমন বিশেষ কোনো দরকার নেই……

দরকার না-থাক্‌লেও রায়মশাই এসে ঢুক্‌লেন ঘরে। তাঁর শরীর ঘর্ম্মাক্ত। এক হাতে পাখা ও আর এক হাতে গামছা।

—এই যে দাদু! এসেছ—বেশ—বেশ—এখন সব ঠিকঠাক্‌ করে ফেলো…রায়মশাই বল্‌লেন।

লীলার সঙ্গে একান্তে গোটাকতো কথা আলোচনা না-হওয়া পর্য্যন্ত—বিয়ের প্রস্তাবটা পাকা করতে তরুণের আপত্তি ছিল। তাই সে

প্রসঙ্গ পাল্‌টাবার জন্যে প্রশ্ন করলো—আচ্ছা দাদু! আপনার দাঁতগুলো কি নিজের, না বাঁধানো?

—কিছুই নিজের নয় ভাই! সবই সেই উপরওয়ালার। দাঁতগুলো এখনো এত শক্ত আছে যে, কট্‌ ক'রে একটা লোহার তারও কাট্‌তে পারি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, এ যাত্রায় বোধ হয় আর পরস্মৈপদী হ'তে হবে না। নিজের দাঁতে নিজেই চিবিয়ে চ'লে যেতে পারবো······

—আমার মনে হয়, দুচারশো ছারপোকা মেরেছেন আপনি কাল রাত্রে—তাই নয় কি?

—হ্যাঁ কিছু বেশীও হ'তে পারে—কম তো নয়ই······

—কী আশ্চর্য্য! আপনি খদ্দর পরেন, মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করেন—অথচ······

—অথচ···কি? বলো, বলো···রায়মশাই জিজ্ঞাসুভাবে তরুণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখেই তরুণ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারপর বিয়ের আলোচনা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে এনেছে তাঁকে—প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে। এখন একটা রাজনৈতিক বিতর্ক সুরু হলেও তরুণের আপত্তি নেই।

নিজেই একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে রায়মশাই বল্‌লেন—বসো ভায়া, বসো। তারপর তোমার 'অথচ'টা একটু পরিষ্কার করো। তোমাদের কংগ্রেসে কি এমন কোনো রিজলিউসান হয়েছে যে—যিনি খদ্দর পরবেন, তিনি ছারপোকা মারতে পারবেন না?

লীলা ও তরুণ দু'জনাই হেসে উঠ্‌লো।

বাধা দিয়ে রায়মশাই বল্লেন—হেসোনা, হেসোনা, আমাকে বুঝিয়ে দাও যে—কি অন্যায়টা আমি করেছি……

লীলা হাস্তে হাস্তে বল্লো—ছারপোকা-মারা একটা হিংসার কাজতো বটে ?

এবার রায়মশাইও হাস্‌লেন—ও, তোমাদের সেই কেতাবী অহিংসার কথা বল্‌ছো ?

বিস্মিতভাবে তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—কেতাবী অহিংসা মানে ?

রায়মশাই বল্‌তে লাগ্‌লেন—আমার মতে—হিংসা ও অহিংসার মাঝে কোনো সীমা-রেখা নেই। প্রয়োগের উদ্দেশ্যের উপরেই নির্ভর করে তাদের রূপ-বিচার। ব্যাঘ্রের পক্ষে খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টাকে হিংসা বল্‌বো কেন ? যে সব ছারপোকা আমার রুধির-পান ক'রে পুষ্ট হতে চান্—নিছক আত্মরক্ষার জন্যে, আমিই বা কেন তাদের ধ্বংস-সাধন করবো না ? বল্‌তে পার—ডাক্তারের অপারেশান হিংসা কি অহিংসা ?

সন্দিগ্ধভাবে তরুণ বল্‌লো—বুঝ্‌তে পারলাম না আপনার কথা। আপনি কি বলতে চান—মহাত্মার অহিংস অসহযোগের মধ্যেও আছে সেই ফাঁকি ? প্রয়োজন হ'লে তিনিও কি হিংসার কাজকে অহিংস ব লে ব্যাখ্যা করবেন, আপনার মত ?

রায়মশাই বল্‌লেন—মহাত্মা কি করবেন—তা' আমি জানি না। কারণ, আমি পাপাত্মা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসা প্রয়োগের অর্থ, আমার মনে হয়, কার্য্যকরীভাবে হিংসা-প্রয়োগের অক্ষমতা স্বীকার করা। অস্ত্রশস্ত্র নেই বলেই আমরা নিরস্ত্র-বিদ্রোহের মহিমা প্রচার করে থাকি। জাতি-হিসাবে শৌর্য্য ও বীর্য্যের দাবী জানিয়ে, অস্ত্রহীনভাবে বেয়নেটের সাম্‌নে বুক পাতি—আত্মসম্মান রক্ষায়

জন্যে। আমার বিশ্বাস, মহাত্মার মত তেজস্বী-মহাপুরুষ—ক্ষমতা থাকলে, এতদিন নিশ্চয়ই মেতে উঠ্‌তেন বহ্ন্যুৎসবের তাণ্ডব-নৃত্যে! ব্রজের প্রেমিক কানুই তো—কুরুক্ষেত্রের চক্রী শ্রীকৃষ্ণ? কুরুবংশ-ধ্বংস করতে তাঁর একটুও বাধে নি।

প্রতিবাদ জানিয়ে তরুণ বল্‌লো—না, না, মহাত্মা-সম্বন্ধে ওরূপ মন্তব্য কখ্‌খনো করবেন না। রাজনীতিকে তিনি টেনে এনেছেন—ধর্ম্মসংস্কারের গণ্ডীতে। অহিংসাকে গ্রহণ করেছেন—অতি সুস্থ ধর্ম্মনীতি হিসাবেই। শত্রুকেও অতি অন্তরঙ্গ মিত্রভাবে আলিঙ্গন দিতে চান তিনি। তাঁর রাজ-নৈতিক পরিবেশের মধ্যে কোনো বিদ্বেষ বুদ্ধির স্থান নেই······

রায়মশাই হোহো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন—ভায়া হে! তোমরা বড্ড বেশী কেতাবী-বুলি মুখস্থ করো। এ কথাটা কেন বোঝো না যে মহাত্মা গান্ধী যাকে বল্‌ছেন—জন্মগত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, ক্ষুদ্রাত্মা চার্চ্চিল ঠিক্ তাকেই বলছেন—বিদ্রোহী ন্যাংটা-ফকিরের বিদ্বেষ-বুদ্ধি! শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ। ভারতের স্বাধীনতা-ঘোষণা কি বৃটীশ-সাম্রাজ্যের সমূহক্ষতি নয়? আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি নিয়ে, মহাত্মা কি আজ বহু দূরাত্মার অন্তর্দাহের কারণ হ'য়ে দাঁড়ান নি? আমাদের বিদ্রোহ মানেই তো তা'দের আত্মম্ভরিতার আয়োজনকে খর্ব্ব করার চেষ্টা—তা' হিংসই হোক্ আর অহিংসই হোক্। 'আত্মপর বোধ-রাহিত্য' ঘটলে মহাত্মা নিশ্চয়ই পর্ব্বত-গুহায় ব'সে তপস্যা করতেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ক'রে সাম্রাজ্যবাদের শত্রু হ'য়ে দাঁড়াতেন না। বা, আসমুদ্র-হিমাচল আলোড়িত ক'রে আত্মিকশক্তির খেলা দেখাতেন না।

অন্যমনস্কভাবে তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—আপনি কতদিন সন্ন্যাসী ছিলেন ?

—প্রায় দশবছর···

এমন সময় মাধুরী এসে বল্‌লো—ঠাকুরদা! আপনার কুঁক্‌ড়োটা পাঁচীল টপ্‌কে পালিয়ে গেছে···

—কোন্ দিকে গেল ? বলেই হাতের গামছাটা কাঁধে ফেলে রায়মশাই ছুটলেন···

বিস্মিতভাবে তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—'দাদামশাইয়ের কুঁক্‌ড়োটা' মানে ?

হাস্‌তে হাস্‌তে লীলা বল্‌লো—পাখীর মাংস ঠাকুরদা খুব ভাল বাসেন।

—কিন্তু তা'তে পেঁয়াজ বা গরমমশ্‌লা দেওয়া চল্‌বে না—শুধু সেদ্ধ···মাধুরী মন্তব্য করলো। শুনুন্ তবে বলি মাংস-খাওয়ার কথা···

বাধা দিয়ে লীলা বল্‌লো—না, না, আর কিছু বল্‌তে হবে না, তুই এখন চা আর খাবারটা নিয়ে আয়। মাধুরী একটু বিমর্ষভাবে চলে গেল।

—খাবারের কথাটা নিষেধ ক'রে দাও লীলা, মাত্র এককাপ চা চল্‌তে পারে···তরুণ বল্‌লো।

—খাবারের সঙ্গে ছাড়া, শুধু চা খেতে নেই।

—মানুষ খাবার খায় খিদে পেলে, আর চা খায় তেষ্টা পেলে। খিদে আর তেষ্টা দুটো পৃথক চাহিদা। তা'তো জানো ?

—খিদে কি আপনার মোটেই পায় না ? সে দিনও তো খাবারটা ফেলে রেখে, শুধু-চা-ই খেয়েছিলেন···

—সেই কারণেই তো বলছিলাম—অরুণ রাক্ষসের মত খেতে পারে। তাকেই পেট্‌টা ভ'রে খুব খাবার খাওয়াও। আমাকে মাঝে মাঝে দু' এক কাপ চা দিলেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করবো··· ···

একটু লজ্জিতভাবে মাথা হেঁট্ করে লীলা বল্‌লো—আপনি একজন সাহিত্যিক। আপনার জানা উচিত, মেয়েদের স্নেহ বা ভালবাসার গতি, কোন্ দিকে বেশী উগ্র হ'য়ে ওঠে। না-খেয়ে-খেয়ে যে শুকিয়ে যাচ্ছে—তাকে খাইয়ে-দাইয়ে মুটিয়ে-তোলার ভিতর আছে কত আনন্দ! খেয়ে-খেয়ে যে মুটিয়ে যাচ্ছে—ইচ্ছে করে—তাকে মোটেই না-খেতে-দিয়ে শুকিয়ে রাখি। চব্বিশ ঘণ্টাই যে তার হাতের মাসেল্ ফুলিয়ে দেখাতে চায়—সে কত শক্তিমান! ইচ্ছে করে—হাতখানা তার মুচ্‌ড়ে ভেঙে দি'···

—খুব স্বাভাবিক! তরুণ বল্‌লো—কিন্তু লীলা, বিচার-বুদ্ধিকে একেবারেই বাদ দিয়ে, শুধু ইচ্ছে আর অনিচ্ছের পিছনে ছুটলে, পরিণামে ভয়ানক ঠক্‌বে···

এক প্লেট্ খাবার ও এককাপ চা নিয়ে মাধুরী এসে সেখানে দাঁড়ালো।

—জল আনিস্‌নি তো? আচ্ছা—আমিই নি' আস্‌ছি···লীলা বেরিয়ে গেল।

প্লেট্ আর কাপ্ টেবিলের উপর রেখে, মাধুরী দরজা থেকে উঁকি দিয়ে দেখ্‌লো—লীলা কতদূর গেছে। তারপর তরুণের খুব নিকটে এসে নীচু স্বরে বল্‌লো—দেখুন জামাইবাবু! সত্যি বলুন তো—আমি যে কথা বলি তা' কি আপনি মন্দ শোনেন?

—শুধু ওই 'জামাইবাবু-ডাক'টি বাদে আর যা' বলো, সবই খুব ভালো শুনি…

—তা'হলে লীলাদিকে একটু বল্‌বেন—কোনো কথা বল্‌তে গেলেই তিনি যেন আমাকে বাধা না দেন। সাত বছর শ্বশুর-বাড়ীতে কারো সঙ্গে কথা বলিনি। কুন্দুলে শাশুড়ী আমাকে ঘোম্‌টার বাইরে মুখ বের করতে দিত না। সে বিপদটা এখানে কখ্‌খনো ঘটবে না জানি, কিন্তু কথা বল্‌লেই লীলাদি ধমক দিয়ে মুখবন্ধ করতে চায়। কেন বলুন তো? আমার কথা যদি আপনি ভালই শোনেন, তাহলে কেন আমার মুখ—আপনার কাছেও বন্ধ রাখ্‌তে হবে?

অত্যন্ত হতাশভাবে তরুণ বল্‌লো—উপায় কি মাধুরী? সমস্যাটি যে অত্যন্ত গভীর! আমাদের দেশ-নেতারাও পড়েছেন ঠিক ওই বিপদে। জগতের লোকের সঙ্গে তারা একটু আলাপ-পরিচয় জমাতে চান, সুখ-দুঃখের কথা বল্‌তে ও শুন্‌তে চান্‌, কিন্তু বৃটীশ-শাশুড়ীর চোখরাঙানি আর ধম্‌কানির চোটে, তা' মোটেই পেরে ওঠেন না। কেউ-বা জোর করে চেঁচিয়ে উঠে জেল খাটেন—আর কেউ-বা মনে মনে অভিশাপ দিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন…

একগ্লাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকে, লীলা জিজ্ঞাসা করলো—কি কথা হচ্ছে?

তরুণ বল্‌লো—তোমার বিরুদ্ধে মাধুরী ভয়ানক অভিযোগ এনেছে…

—অভিযোগ?

—হ্যাঁ, মাধুরী যা' কিছু বল্‌তে চায়—তুমি নাকি তার উপর—জারি করো—১৪৪ ধারা?

একটু হেসে লীলা বল্‌লো—ও সেই কথা? আপনি এখন চা আর খাবারটা খেয়ে নিন্‌ তো···

—খাবার খেতেই হবে?

—নিশ্চয়ই। সে দিন দোকানের খাবার দিয়েছিলাম। আজ আপনি আস্‌বেন জেনে, বাড়িতেই তৈরি করেছি। না-খেলে ছাড়বো না তো?

মাধুরী জিজ্ঞাসা করলো—আমি একটা কথা বল্‌বো?

কৃত্রিম সহানুভূতি জানিয়ে তরুণ বল্‌লো—কেন বল্‌বে না? নিশ্চয়ই বল্‌বে। কথাগুলোকে টেনে যত লম্বা করতে পারো—বাঙালী-জীবনের মূল্যহীন সময়কে অনাবশ্যক বক্তৃতার বেদীতে যত জবাই করতে পার, আমার তা'তে কোনো আপত্তি নেই। আমি কারো কণ্ঠ-রোধ করার পক্ষপাতী নই।

মাধুরী বল্‌লো—ওই দেখুন লীলাদি চোখ-রাঙিয়ে ধমকাচ্ছে! থাকগে—নাইবা বল্‌লাম কোনো কথা এখানে। যাই—রান্নাঘরে ব'সে ডার্কির' সঙ্গে কথা বলিগে—তা'তে তো লীলাদির কোনো আপত্তি হবে না?

মাধুরী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ভাবে চলে গেল।

তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—'ডার্কিটা' আবার কে?

—একটা বেড়াল···

—কোত্থেকে জোগাড় করেছ এ মেয়েটিকে?

—ঠাকুরদা কোন্‌ এক পাড়াগাঁ থেকে নিয়ে এসেছিলেন···

—তাই বলো। এমন সরল—সোজা মেয়ে সহরে তৈরি হয় না। থাকগে—অনেক বাজে কথা হ'য়ে গেল। এখন যে জন্যে এসেছি তাই বলি, শোনো—

—বলুন···শুনছি···

—অস্বীকার করবো না যে—তোমাকে দেখে, ও তোমার মনের খানিকটা পরিচয় পেয়ে, আমি মুগ্ধ হয়েছি। তবু আমার অনুরোধ—অরুণকে তুমি ক্ষমা করো। অরুণকে তুমি সুখী করো। আমার মনে হচ্ছে—তোমার চিঠি পড়েও, সে তোমাকে ভুলতে পারছে না। বা—তোমার আশা ছাড়তে পারছে না···

একটু বিরক্তভাবে লীলা বললো—কেন বাজে বক্‌ছেন বলুন তো? খাবারটা খাবেন কিনা বলুন। যদি না খান—বাইরে ওই যে হ্যাংলা কুকুরটা ব'সে আছে—ওর সামনেই ঢেলে দিয়ে আসি···

—না, না, খাচ্ছি। মাধুরী ঠিকই বলেছিল—'তুমি যা জিদ ধরবে তা' করবেই!

ওঃ! কি ছুটোছুটি করেই পাখীটাকে ধরেছি—বলতে বলতে রায়মশাই ঘরে ঢুকলেন। খাবার খেতে খেতে তরুণ বললো—দাদু! আপনি কুঁকড়োর মাংস খান?

—পাবো কোথায় যে খাবো ভাই? 'মাতাল' কথাটা গালাগালি কিন্তু 'মাংসাশী' তো গালাগালি নয়? সে দিন একটি বিধর্মী-বন্ধু ওই কক্কুটটি আমাকে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, পরীক্ষা করা—সন্ন্যাসের পর আমার গোঁড়ামি বেড়েছে কি কমেছে। হিঁদুয়ানী যে সঙ্কীর্ণতা-দোষে দুষ্ট, এ অপবাদ বরদাস্ত করতে—আমি রাজী নই। তাই নিয়ে এলাম পাখীটাকে···

হাসতে হাসতে তরুণ বললো—আপনার গোঁড়ামি একটুও বাড়েনি—বরং উদারতাই অসম্ভব বেড়েছে বলে মনে হয় দাদু! তবে 'অ্যালকোহলিক—ষ্টিমুলেশান' যে আপনার ভিতর এখনো

বেশ অটুট আছে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই! আপনি আমার পরামর্শ নিন্। ওসব খদ্দর-ঠদ্দর ছেড়ে—'টাই-টুপী' আর 'কোট প্যাণ্ট' ব্যবহার করতে থাকুন। ষোল-আনা সাহেব সাজুন—আপনাকে বেশ মানাবে···

—তুমি কি মনে করো—আমার 'টাইটুপী আর 'কোট্ প্যাণ্ট' নেই?

—আছে নাকি? তরুণ বিস্মিতভাবে মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

—দু'টি সুট-কেশ ভর্ত্তি! জিজ্ঞাসা করো ওই লীলাকে। মাঝে মাঝে লাট্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাই যে···রায়মশাই খুব হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

তরুণ চমকে উঠ্‌লো—কী সর্ব্বনাশ!

—সর্ব্বনাশের কথাটা কি হলো?

ভুরু কুঁচ্‌কে তরুণ বল্‌লো—ক্রমেই যে অতি জটিল সমস্যা হ'য়ে উঠ্‌ছেন আপনি আমার কাছে!

—তোমার কোনো দুর্ভাবনার কারণ নেই দাদু! তুমি তো 'টেররিষ্ট' নও? অতি ভালো-মানুষ—মহাত্মা-ভক্ত অকৃত্রিম 'নন্‌ভাওলেন্ট খদ্দরিষ্ট'! পাখীটা পালিয়ে গিয়েছিল। এত চেষ্টা ক'রে তাকে আর ধ'রে আন্‌তাম না, যদি তুমি এখানে না থাক্‌তে। কি বলো—চল্‌বে তো? বিয়ে করতে এসেছ—ওই তো শরীরের ছিরি! দৈহিক বলাধানের জন্যে একটু জুস্ খাবে—পেঁয়াজ ও মশ্‌লা-দেওয়া বিষ নব! আপত্তি না-থাকে তো বলো—বানিয়ে ফেলি···

তরুণ বল্‌লো—মাছমাংস আমি অনেকদিন ত্যাগ করেছি···

—বলো কি? এযুগে বাংলাদেশে—এমন নিরামিষ ছেলে আছে ব'লে তো আমার ধারণা ছিল না? কী আশ্চর্য্য! লীলা! তুমি

এখনো সাবধান হও—অরুণ কিন্তু তরুণের চেয়ে ঢের ভাল ছেলে। সেদিন আমি তাকে 'কেল্‌নারে'র বাড়ি থেকে বেরুতে দেখিছি··· যাক্‌গে, তোমাদের ভালো তোমরাই বোঝো। মিছেমিছি পাখীটাকে আর কেন? ছেড়েই দি···বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চোখে মুখে একটা উৎকণ্ঠার ভাব প্রকাশ ক'রে তরুণ বল্‌লো—দেখো লীলা! আমার সন্দেহ হচ্ছে—তোমার ঠাকুরদাদা···

বাধা দিয়ে লীলা বল্‌লো—বলুন, আপনার দাদু!···

—হ্যাঁ আমার দাদুটি হচ্ছেন—টিকটিকি-পুলীশ!

আপত্তি জানিয়ে লীলা বল্‌লো—না, না, বাজে-সন্দেহ করবেন না। লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের কথাটা মিথ্যে পরিহাস। সাহেব-কোয়াটারে ওঁর অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে। দেশের অনেক ধনী-মহাজন ওঁকে অর্থসাহায্য করেন। ওঁর নিজের পরিকল্পনা—পল্লী-উন্নয়ন-স্কীম আছে একটা। তাই নিয়েই দিনরাত পড়ে আছেন। ওঁর কাছে ব'সে একদিন শুনবেন—কি চমৎকার দেশের কাজ করছেন উনি! পল্লীর ফাঁকা মাঠে প্রায় পাঁচশো বিঘে জমি নিয়েছেন। পাশেই মধুমতী নদী। আশ্রমের ভিতরে আছে তিনটি পুকুর, দুটি সব্‌জীবাগ, খেলার মাঠ, স্কুল—চরকা, তাঁত, গোশালা, কামারশালা কুমোরশালা—কতকি! প্রায় একশো গরীবের ছেলেকে—স্বাবলম্বীভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করছেন। বিলাসিতা কা'কে বলে তা' তারা জানে না।

—এত টাকা পাচ্ছেন কোথায়?

—দেশের ধনী লোকেই দিচ্ছে। সেদিন ওঁর খাতাপত্তরে দেখ্‌ছিলাম —প্রায় লাখটাকা সংগ্রহ করেছেন আজ পর্য্যন্ত। আমার বড্ড ইচ্ছে করে—সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকতে। চমৎকার জায়গাটি!

একবার স্মেলিংসল্ট শুঁকে তরুণ বল্‌লো—তাই যাও লীলা! তোমার ঠাকুরদাদা আর ক'দিন বাঁচ্‌বেন? ওঁর সে প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখার মত মেয়েই তো তুমি···

লীলা খুব উচ্ছ্বসিত ভাবে বল্‌লো—হাঁা, আমি সেখানেই যাবো। ঠাকুরদার সঙ্গে সে-সম্বন্ধে কথা হয়েছে। শুধু আপনি আমার কপালে একটু সিঁদুর পরিয়ে দিন—তার বেশী আর কিছুই চাই না আপনার কাছে···

—কথাটা বলে ফেলেই—লীলার চোখমুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো। লজ্জায় তরুণের মুখের দিকে আর চাইতে না-পেরে—হঠাৎ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। তরুণ ঘেমে উঠ্‌লো, আর ঘন ঘন স্মেলিংসল্ট শুঁকতে লাগ্‌লো।

পরের দিন সকালে, একখানা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে অরুণ এলো লীলাদের বাড়িতে। কিন্তু, ভিতরে ঢুক্‌লো না। দরজায় দাঁড়িয়ে খবর নিয়ে জান্‌লো, রায়মশাই খুব ভোরেই কোন্ দিকে বেরিয়ে পড়েছেন। মাধুরীর হাতে টেলিগ্রামটা দিয়ে চলে যাচ্ছিল সে। এমন সময় লীলা এসে বল্‌লো—ভিতরে এসে বসুন অরুণবাবু! এককাপ চা খেয়ে যান্?

—ধন্যবাদ! বলেই অরুণ চলে গেল।

টেলিগ্রাম করেছেন তরুণের বাবা বিহারীবাবু। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও তিন চারটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে, আস্‌ছেন কলকাতায়। লীলাদের পাড়াতেই তাঁর জন্যে যেন একটা ছোট বাড়ি ভাড়া ক'রে রাখা হয়।

রায়মশাই ফিরে এসে টেলিগ্রামের কথা শুনে বল্‌লেন—সে

হাঙ্গামায় আর দরকার কি লীলা? তোমাদের বাড়িতে উপর-নীচেয় অনেকগুলো ঘর পড়ে আছে। এখানে এসেই তো তাঁ'রা উঠতে পারেন?

লীলা একটু শঙ্কিতভাবে বল্‌লো—আমি ভাব্‌ছি—দাদা যদি হঠাৎ কোনো দিন এসে মাতলামো সুরু করে?

—সে কথাটা বুঝি তোমাকে বলিনি?

—কোন্ কথা?

—তোমার দাদা কলকাতায় নেই। সেই পাঞ্জাবীকে সঙ্গে নিয়ে বার্ম্মায় চলে গেছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ভালই হয়েছে। দূর বিদেশে গেলে, অনেক সময় ওসব ছেলেদের মতিগতি বদ্‌লায়।

লীলার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে দু'ফোঁটা জল ঝরে পড়লো।

রায়মশাই বল্‌লেন—চোখমুছে ফেলো লীলা, আরো গোটাকতো জরুরী কথা আছে। তুমি তো জানো এই বিহারী—আমার সেই জামাই?

—জানি……

—আমার মেয়ের আত্মহত্যার কারণটাও তো তোমাকে বলেছি?

—হ্যাঁ, বলেছেন।

—আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বিহারীর মুখ আর এজীবনে দেখ্‌বো না। সুতরাং আমাকেও আজ এখান থেকে চলে যেতে হচ্ছে। অবশ্য, কলকাতাতেই থাক্‌বো। এদিক্‌কার খবরও রাখ্‌বো। তোমার মামাতো ভাই জীবু এসে থাক্‌বে এখানে। জীবু বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। তাকে আমি

বুঝিয়ে দেব সব। কোনো অসুবিধে হবে না। আমি এখন যাচ্ছি—তরুণের সঙ্গে একবার দেখা করতে···

কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখদুটো চেপে ধরে—লীলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লো। দাদাও নেই—ঠাকুরদাও থাক্‌বেন না!

রায়মশাই নিজের চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লেন—আঃ, কাঁদিস্‌নে পাগ্‌লী! তোর সাধনার ধন তরুণকে তো পাবি?

(৪)

লীলা ও তরুণের বিয়ে দেখতে—মেসের সবাই এসেছিল, শুধু আসেনি অরুণ। কিন্তু লোকমারফৎ উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিল সে—একটি সোনার সিঁদুরের কৌটা! তা'তে ভর্ত্তি ছিল—অরুণের বুকের রক্তের মতই টকটকে লাল সিঁদুর!

বিয়ের পর বিহারীবাবু সাতদিন মাত্র লীলাদের বাড়িতে ছিলেন। তা'তে আর কারো কোনো কষ্ট না-হলেও মাধুরী হাঁপিয়ে উঠেছিল। যেন সে আর সহ্য করতে পারছিল না।

. একদিন তরুণকে সে বল্‌লো—জামাইবাবু! আপনি যে বলেছিলেন আপনার মা নেই—লীলাদির কোনো শাশুড়ীর বালাই থাকবে না? ওরে বাপ্‌রে—এযে দেখ্‌ছি—সৎমা-শ্বাশুড়ী! জোড়হাত কপালে ঠেকালো!

বিহারীবাবুর অন্তর্ধ্যানের পর, আবার হ'লো রায়মশাইয়ের আবির্ভাব। তিনি এসেই লীলাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে—সিঁদুরভরা সিঁথিতে একটি চুমু খেলেন। লীলা তাঁর বুকটা ভিজিয়ে দিল—চোখের জলে।

রায়মশাই সস্নেহে বল্‌লেন—তা'হলে আমি এখন রওনা হই দিদিমণি! আমার কর্ত্তব্য তো শেষ হয়েছে? তোমরা এখন সুখে সংসারধর্ম্ম করো—মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবো···

লীলা বল্‌লো—আমিও আপনার সঙ্গে আশ্রমে যাবো···বাড়িটা ভাড়া-দেবার ব্যবস্থা করুন···

—সে কি, কেন বলো তো?

—এখানে একলা থাকবো কি করে?

—তরুণ কোথায়?

—পরশু বিকেলেই মেসে চ'লে গেছেন। তাঁর মনের অবস্থা নাকি ভাল নয়···

খুব গম্ভীর ভাবে রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—কারণ?

লীলা বল্‌লো—অরুণবাবু চাকরী নিয়ে এলাহাবাদ চলে গেছেন···

—হ্যাঁ, তা' আমি জানি। যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেছে······

—কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো দেখা করেননি!

—নাইবা করলো? সে জন্যে প্রয়োজন হয়—ডজনখানেক স্মেলিংসল্ট এনে ঘরে রাখো। মেসে তো বন্ধু-বিরহের কণ্ডূদাবানল নেই? সেখানে কেন পড়ে থাকতে চান্ তিনি?

লীলা অধোবদনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সে কথার কোনো জবাব দিল না।

একটু চিন্তা করে রায়মশাই বল্‌লেন—আচ্ছা, আমি এখুনি মেসে যাচ্ছি—দেখি না-এসে পারে কি করে? হুঁঃ বন্ধু-বিরহ! যত-সব···

লীলা বল্‌লো—আজ বোধ হয় আস্‌তে পারেন একবার···

—তা' কি ক'রে জান্‌লে?

—চরকাটা ফেলে গেছেন এখানে। পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন। সকালে এসেছিল মেসের চাকরটা। ব'লে দিয়েছি—তিনি নিজে না এলে পাঠাবো না।

—বেশ করেছ। শোনো দিদিমণি—তোমাকে একটি কথা বলি। তরুণের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো। হয় বইপড়া না কবিতা

লেখা—আর মা হয় চরকা চালানো। এর কোনোটাই তার মত যুবকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত শারীরিক শ্রমের কাজ নয়। তার বয়সে, রোজ আধসের কি একপোয়া ঘাম না-ঝরালে শরীর সুস্থ থাকবে কেন?

লীলা একদৃষ্টে চেয়েছিল রায়মশাইয়ের মুখের দিকে। হঠাৎ তার বড় বড় চোখ দিয়ে দু'ফোটা গরম অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

—ওকি তুমি কাঁদছো কেন দিদিমণি? রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

চোখ মুছে লীলা বললো—আমার ভয় হচ্ছে ঠাকুরদা! উনিও বোধহয় বাবার মত···কথাটা সম্পূর্ণ বলতে না পেরে আঁচল দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরলো।

—বাবার মত অকালে পটল তুলতে পারেন—এই তো বলতে চাও? রায়মশাইয়ের কোঠরগত চোখদুটিও ছলছলিয়ে উঠলো! একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে খুব গম্ভীর ভাবে বললেন—সেই আশঙ্কাতেই··· যাকৃগে, এখন আর সে অনুশোচনায় তো কোনো লাভ নেই? সামলে নিতে হবে। নীলমণিকে আমি বলতাম্—তোমার লেখাপড়ার নেশা, শৈলেনের মদের নেশার চেয়ে কম নয়। দেখেছো তো? তোমার বাবা কলেজে একবার যেতো—তারপর বাড়িতে ফিরেই পড়ার ঘরে দরজা এঁটে বসতো! কেউ কখনো তা'কে রাস্তায় একটু পায়চারী করতেও দেখেনি। তাইতো এলো ডায়বেটিস্, ব্লাড্‌প্রেসার, ভারটিগো, প্যাল্‌পিটেসান, কতকি! শেষে মারা গেল—কারবাঙ্কেলে! সে যা' হবার তা'তো হয়েই গেছে। এখন তরুণের সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে। সবসময় তাকে কাছে রাখতে চেষ্টা করবে। সকালে বিকেলে হাতের বই টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—কান দু'টো ধরে 'ওঠবোস' করাবে···

লীলার পাশে দাঁড়িয়ে মাধুরী অবাক হয়ে শুনছিল—ঠাকুরদার

বক্তৃতা! তরুণের এমন কি কঠিন ব্যাধি হলো—যার জন্যে লীলার চোখ দিয়েও জল গড়াচ্ছে, ঠাকুরদার চোখে-মুখেও ফুটে উঠেছে ভয়ানক আশঙ্কার চিহ্ন! মাধুরী তা' ঠিক বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ কান ধরে যে 'দাওয়াই' দেবার ব্যবস্থা হলো—তা শুনে ফিক্ করে একটু হেসে ফেলে বললো—ঠাকুরদার যে কথা! দিদিমণি তা' পারবে কি করে?

রায়মশাই চটে উঠলেন—কেন পারবে না? পারতেই হবে। তরুণের জন্যে যখন পাগল হয়ে উঠেছিলেন—তখন মনে ছিলনা?

লজ্জিতভাবে লীলা সেখান থেকে চলে গেল।

মন্তব্যটা বড় কর্কশ হয়ে গেছে—ভাবতে ভাবতে রায়মশাই বললেন—আমিও যাই একটু ঘুরে আসি। তরুণ যদি আগেই আসে—একটু বস্‌তে ব'লো। আমার সঙ্গে দেখা না-ক'রে যেন ফিরে যায় না।

রায়মশাই বেরিয়ে পড়লেন। মাধুরী চোখমুখ ঘুরিয়ে আপন মনে বলে উঠলো—জামাইবাবুর কিছু হয়নি! মিছেমিছি তোমাদের যত কুলক্ষুণে আলোচনা···

মেসে তখন একটা মজার ব্যাপার চলছিল। কদলীদেবী এসে হাজির হয়েছেন, তার স্বামীর খোঁজে। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের মেয়েটি—চাঁপা কলার মত রং। কিন্তু নাক-কান-চোখ-মুখ দেখলে মনে হয় যেন একটিও তার নিজের নয়। সবই ধার-করা। রূপের উপকরণ সবই আছে, কিন্তু সেগুলি এতই বে-মানান্ ও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো যে, তাকে দেখলেই মনে হবে—শুধু শিল্পীর অযত্নে, অর্থাৎ একটু সাজিয়ে রাখার অভাবে—মেয়েটিকে সুন্দরী বলা যায় না!

পাঁচবছর পরে স্বামী-পরিত্যক্তা কদলীদেবীর মনে শ্রীরাধা-ভাব জেগেছে—তার ধারণা হয়েছে—শ্যামচাঁদ আজ…

"রাজা হয়ে বসেছে মথুরা-ধামে—
কুব্জাদাসী রাণী হয়ে বসেছে তার বামে!"

অতি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর! মেসে এসে বিরহ-কীর্ত্তন গাইতে আরম্ভ করেছেন তিনি। মেস-মেম্বররা ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাঁকে। যখন রায়মশাই এসে উপস্থিত হলেন তখন করুণকণ্ঠে কদলীদেবী গাইতে-ছিলেন—

"আমার শ্যাম-স্বপ্ন-পাখী, সুন্দর নিরখি'—
আমি, ধরেছি নয়ন-ফাঁদে"

রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—কে এ মেয়েটি?

মেসের একটি ছেলে বললো—লেডি ওয়েদার-কক্!

রায়মশাই বুঝলেন—ব্যাপার কি। তারপর অনুসন্ধানে জানলেন তরুণ অনেকক্ষণ মেস থেকে বেরিয়ে গেছে। মেয়েটির কাছে এসে বললেন—মা, আমি তোমার শ্যামচাঁদের খবর জানি—এসো আমার সঙ্গে…

বিস্মিতভাবে রায়মশাইয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কদলীদেবী বললেন—তুমি অক্রূর বুঝি?

একটু হেসে রায়মশাই বললেন—হাঁ মা, আমার ভিতর কোনো ক্রূরতা নেই—তুমি নির্ভয়ে চলে এসো…

একটা রিক্সা ডেকে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে রায়মশাই রওনা হলেন।

লীলাদের বাড়ির দোতলায় লীলার শোবার ঘর। চুল ছড়িয়ে, একটা বালিশ বুকে দিয়ে লীলা পড়েছিল বিছানার উপর। মনে মনে

সঙ্কল্প করছিল—তরুণকে একদিন সে অরুণের চেয়েও স্বাস্থ্যবান-সুপুরুষ গ'ড়ে তুলবে। ঠাকুরদা বলেছেন—"সব সময় তাকে কাছে রাখতে চেষ্টা করো!" নিশ্চয়ই! আজ যদি তরুণ না আসে—কাল নিজেই সে যাবে মেসে। তুটো মুটের মাথায় বাক্স-বিছানা-বই—যা-কিছু সব চাপিয়ে দিয়ে, বাধ্য করবে তাকে এ বাড়িতে আসতে……

তারপর, বাজার থেকে কিনে আনবে একজোড়া মুগুর ও একজোড়া 'চেষ্ট-ডেভেলপার'! ছাতের উপর খোলা-হাওয়ায় নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে চালাবে—সকালে মুগুর—বিকেলে ডেভেলপার! খেতে দেবে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। আঙুর, বেদানা, কমলালেবু, সব-সময় ঘরে মজুত রাখবে। বাড়িতে গরু এনে তুধ তুইয়ে দিয়ে যাবে গয়লা, আর ঠাকুরদা পল্লী-অঞ্চল থেকে পাঠিয়ে দেবেন অতি বিশুদ্ধ মাখম। রান্নাঘরের পাশেই একটা খাঁচার ভিতরে থাকবে 'চিকেন্'!

তরুণকে লীলা কিছুতেই কৃশ থাকতে দেবে না। এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসে অরুণ তো চিনতেই পারবে না তাকে! ছ'মাস পরে ঠাকুরদা যখন কলকাতায় আসবেন—তখন তিনিও অবাক হয়ে যাবেন।

অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনার সঙ্গে মনে মনে সঙ্কল্পগুলি আওড়াতে আওড়াতে লীলা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তরুণ এসে কড়া নাড়তেই মাধুরী দরজা খুলে দিয়েছে। পড়ার ঘরে বসে তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—তোমার দিদিমণি কোথায় মাধুরী?

—ঘুমুচ্ছেন···

—আমার চরকাটা কোথায় জানো?

—জানি! উপরে শোবার ঘরের বড় আলমারীর ভিতর তালাচাবি দিয়ে আটকে রেখেছেন। আপনাকে আর সুতো কাটতে দেবেন না।

—কেন ?

—আচ্ছা, আপনার কি কোনো কঠিন রোগ হয়েছে ?

—আমার ? বিস্মিতভাবে মুখের দিকে চেয়ে রইলো তরুণ।

—লীলাদির বাবার মত রাস্তায় ঘুরে পড়ে গেছেন কখনো ?

—আমি ? কি বল্‌ছো মাধুরী ? তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছিনে…

—কি আবার বুঝ্‌বেন ? আমি জানি আপনার কিচ্ছু হয়নি জামাইবাবু! হয়েছে লীলাদির মাথাখারাপ। আপনার রোগের কথা ভেবে—লীলাদি একেবারে কেঁদেই আকুল। আর এক মাথাখারাপ ঠাকুরদা। তিনি ব্যবস্থা দিলেন—সকালে-বিকেলে কান ধরে 'ওঠ-বোস্' করাও—সেরে যাবে।

দরজা পর্য্যন্ত এসে লীলা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। মাধুরীর শেষ-কথাক'টি শুনে সে বুঝ্‌লো—আগাগোড়া 'রিপোর্ট' দাখিল-করা হয়ে গেছে। মাধুরীকে ধমক দিয়ে লীলা বল্‌লো—বেরিয়ে যা এ ঘরে থেকে…

একটু হেসে তরুণ বল্‌লো—মাধুরীকে তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন লীলা ? এখুনি কান ধরে ওঠ-বোস করাবে নাকি ?

—হ্যাঁ, তবে এখানে নয়—ওপরে চলো…বলেই তরুণের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একটু জোরে চাপ দিল। তরুণ উঃ বলে হাতখানা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না।

তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—আমার চরকা নাকি 'আণ্ডার—লক্ এণ্ড কি ?

—সে-সম্বন্ধে এখানে কিচ্ছু বল্‌বো না—ওপরে চলো…আঃ! চলো বল্‌ছি…

যো হুকুম্—বলে একটা কুর্নিশ করে লীলার আগেই তরুণ উপরে চলে গেল। মাধুরী দূরে দাঁড়িয়ে আঁড়চোখে চেয়ে আপন মনে বল্‌লো—দুটো করে সিঁড়ি টপ্‌কাচ্ছে! তবু বলবে—ওই মানুষের নাকি খুব কঠিন রোগ হয়েছে—মাথাখারাপ নাতো কি?

ঘরে ঢুকে লীলা দরজাটা বন্ধ করলো। তারপর খুব মুরুব্বীয়ানার সঙ্গে বল্‌লো—তুমি আর মেসে ফিরে যেতে পারবে না, এখানেই থাক্‌বে···

—কারণ?

—কারণ, একটি দিনের জন্যেও আমি আর থাক্‌তে পারছিনে—তোমাকে ছেড়ে···

—কী আশ্চর্য্য! তোমার ঠাকুরদার সঙ্গে 'পল্লীবাসিনী' হবে না? নাকে নথ, পায়ে মল, কাঁকে কলসী! আমি মেসে থেকে চোখ বুজে তোমার সে রূপ ধ্যান করবো, আর গাইবো···

"ওগো, রূপসী-পল্লীবাসিনী!
শূণ্যঘাটে, কেন বলো একাকিনী, সুহাসিনী!
খেলিছে রঙ্গে, কত বিভঙ্গে—
বক্ষে তব তরঙ্গিণী,
উলসি, বিলসি, নাচিছে কলসী
তব সোহাগে সোহাগিনী!
ওগো, রূপসী-পল্লীবাসিনী!"

তরুণ বিছানার উপর একটু কাৎ হ'য়ে বসেছিল। লীলা—ছুটে গিয়ে তার কাঁধ-দুটো ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে, উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠ্‌লো না, না, চোখ বুজে নয়—চোখ চেয়ে তুমি আমার সে-রূপ দেখ্‌বে আর এই গান গাইবে! যাবে? আমার সঙ্গে যাবে? বলো? বলো?

তরুণ একটু হেসে বল্‌লো—বিয়ের আগে তো বলেছিলে—তোমার *কপালে একফোঁটা সিঁদুর পরিয়ে দিলেই আমার নিস্কৃতি!*

—তোমাকে সে-প্রতিশ্রুতি যে দিয়েছিল, সে আমি নই···

লীলার চোখেমুখে ফুটে উঠ্‌লো এক অপূর্ব্ব দীপ্তি! চোখের কানায় কানায় দু'ফোটা অশ্রু টলমল্ করতে লাগ্‌লো—যেন এখুনি ঝরে পড়বে! মনে মনে তরুণ স্বীকার করলো—সত্যিই সে-লীলা আর এ-লীলা এক নয়। সে ছিল হাস্যময়ী, চটুল ও চঞ্চল, এ যেন অনুরাগে উদ্দীপ্ত—দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ—কর্ত্তব্যে কঠোর—মহিমময়ী—সীমন্তিনী!

হঠাৎ লীলা তরুণের বুকের উপর মাথাটা রেখে কেঁদে উঠ্‌লো—লক্ষীটি আমার! আর কাঁদিও না আমাকে। কাল সারারাত আর সারাদিন, আমি কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছি। সত্যি বলছি—এখন তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে হ'লে—আমি কাঁদতে কাঁদতেই মরে যাবো···

লীলার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের মধ্যে চেপে ধরে তরুণ বল্‌লো—সেতো আর হয় না লীলা! আমি কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার-লিষ্টে নাম দিয়েছি—আইন-অমান্য করবো—প্রয়োজন হ'লে নিরুপদ্রব-ভাবে কারাবরণও করতে হবে আমাকে···

—নাম দিয়েছ? কারাবরণ করবে?

—হ্যাঁ—কালই আমাকে ক্যাম্পে যেতে হবে—পিছিয়ে আস্‌বার কোনো উপায় নেই!

—আমিও যাবো তোমার সঙ্গে—আমিও আইন-অমান্য করবো। তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে কিছুতেই পারবো না আমি···

ঘরের দরজাটাই লীলা বন্ধ করেছিল, জানলাগুলির দিকে বিশেষ

ভাবে নজর দেয় নি। খুব সামান্য-একটু-খোলা একটা জানলার কাছে এসে রায়মশাই বহুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। নাতী ও নাতনীর এই আত্মহারা দাম্পত্য-প্রণয়ের মাধুর্য্যটুকু লক্ষ্য ক'রে, তাঁর দু'চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। হঠাৎ তরুণ আইন-অমান্য-আন্দোলনে যোগদান করেছে শুনে, তিনি চমকে উঠলেন। তাইতো মেয়েটার কি উপায় হবে এখন ?

—দরজাটা খোলো তো দিদিমণি ? বাইরে দাঁড়িয়ে রায়মশাই বললেন।

লীলা দরজা খুলে দিল। ভিতরে এসে রায়মশাই বললেন—শোনো তরুণ! তোমার সঙ্গে লীলার বিয়ে হয়—এ ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। তার একটা কারণ, তুমি স্বাস্থ্যহীন। আর একটা—তুমি আমার সুশীলাকে ভুলে থাকার অন্তরায়। লীলার মত নারীরত্ন-লাভ করা ভাগ্যের কথা। আমার ইচ্ছে ছিল—কিছুদিন তোমাকে যদি কাছে পেতাম—একটু ঘ'সেমেজে দেখতাম, তোমার বদভ্যাসের মরচেগুলো তুলে-ফেলা যায় কি না ?

একটু হেসে তরুণ বললো—কোন্‌টা আমার বদভ্যাস বলুন তো ?

—কোন্‌টা নয় ? বইপড়া, কবিতা-লেখা, চরকা-চালানো, রাজনীতি কপচানো, আর চোখবুজে স্বরাজের স্বপ্ন-দেখা, এর কোনোটাই তোমাকে সুস্থ-সবল মানুষ তৈরি করতে পারে না। আমার পল্লী-আশ্রমে গেলে দেখতে পেতে—তোমার চেয়েও ছোট ছোট ছেলেরা—গাছে উঠছে—জলে সাঁতরাচ্ছে—ফাঁকা মাঠে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে···

—আর, মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় শুয়ে পড়ছে—সে কথাটাও বলুন ?

রায়মশাই একটু বিরক্তভাবে বল্‌লেন—পল্লী-অঞ্চলে ম্যালেরিয়া হয় তাদের—যারা স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন। আমার আশ্রম থেকে ম্যালেরিয়াকে আমি একেবারেই তাড়িয়ে দিইছি…

উচ্ছ্বসিতভাবে তরুণ বল্‌লো—কিন্তু—সারা বাংলাদেশ থেকে ম্যালেরিয়া-তাড়াবার উপায় হচ্ছে—স্বরাজ। সমগ্র ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান ক'রে—প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্য দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন-সংস্থানের উপায় হচ্ছে—স্বরাজ। জাতিগত বৈশিষ্ট বজায় রেখে প্রত্যেক ভারতবাসীকে আত্মসম্মানসম্পন্ন ও স্বাধীন-মনোবৃত্তি-বিশিষ্ট গড়ে-তোলার উপায় হচ্ছে—স্বরাজ। মরুভূমির মধ্যে কোথায় আপনি একটি 'ওয়েশিস্ গ'ড়ে তুলেছেন—তা, দেখে আপনাকে খুব বাহবা দিতে পারি, কিন্তু ভারতের পরাধীনতার গ্লানি তো তা'তে ঘুচ্‌বে না দাদু!

রায়মশাই বল্‌লেন—পয়সার হিসেব রাখ্‌লেই টাকার হিসেব থাকে। তোমাদের মত কতকগুলি দেশকর্ম্মী যদি মঞ্চ-বক্তৃতার বহরটা একটু কমিয়ে, সস্তা হাততালি ও জয়জয়-কারের মোহটা একটু কাটিয়ে পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ 'ওয়েশিস্' গ'ড়ে তোলে—তা'হলে ভারতের 'মরুভূমিত্ব' নিশ্চয়ই দূর হয়ে যাবে। স্বরাজ-সাধনার জন্যে তো মানুষ দরকার? তুমি একটি পূর্ণবয়স্ক যুবক। পার কি এই বাহাত্তুরে বুড়োর একটি 'থাপ্‌পড়্' সহ্য করতে? তা' যদি না পারো—কেন যাও বাতাহত-বেতসীর মত দোদুল-দুল অঙ্গসৌষ্ঠব নিয়ে কারাবরণের দুঃসাহস দেখাতে?

তরুণ হোহো করে হেসে উঠ্‌লো। লীলার দিকে চেয়ে—রায়মশাইকে শুনিয়ে বল্‌লো—বাহাত্তুরে হ'লেও তোমার ঠাকুরদা

এখনো যাত্রাদলের ভীমের পার্ট 'একটো করতে পারেন। 'ধর্ যুদ্ধ ধর্' ব'লে দুঃশাসনকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করতে পারেন···

—কিন্তু তার কি কোনো প্রয়োজন আছে দাদু? হাজার হাজার লোক আহত হচ্ছে—আজ একটি ছোট বোমার আঘাতে। মহাত্মার নিক্রিয়-প্রতিরোধ যে সেই বৈজ্ঞানিক বোমার চেয়েও বেশী শক্তিশালী—তাও প্রমাণিত হ'য়ে যাচ্ছে। ভেবে দেখুন—ঋষিযুগের কথা। ক্রুদ্ধ ইন্দ্র বজ্র তুললেন। ঋষি-বশিষ্ট চোখরাঙিয়ে বললেন—"বজ্র! ত্বং স্তম্ভিতো ভব!" ইন্দ্রের উদ্যত হাত 'প্যারালাইজড্' হয়ে থাকলো। ভারতের পূণ্যতীর্থে মহাত্মা গান্ধীও আজ উদ্বোধন করতে চান—*সেই শক্তির*। একজন তপঃক্লিষ্ট ঋষি—অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ক্ষত্রিয়-রাজাকে বলছেন—'নেবে এসো সিংহাসন থেকে'! তখনি তিনি নেবে আসছেন—পোষা মেষ-শাবকের মত। কেন? এ প্রভাব কিসের? মহাত্মা গান্ধী বলছেন—হে অমৃতের পুত্রগণ! জাগ্রত করো সেই আত্মিক-শক্তিকে, প্রতিবাদ করো আত্মাবমানজনক প্রত্যেকটি অন্যায়ের। বুক ফুলিয়ে মৃত্যুভয়কে জয় করো—নিরস্ত্র-ভাবে গোলা-বারুদের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দেবে—যারা সত্যসন্ধ ও নির্ভীক! দেহধর্ম্মী-দেশকর্ম্মীরা পিছিয়ে পড়বেই···তা' জানি···তরুণ হাসতে লাগ্‌লো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রায়মশাই বললেন—হুঁ, বুঝ্‌লাম···

—কি বুঝ্‌লেন দাদু?

—*বুঝ্‌লাম তোমাদের স্বরাজ মানে সোনার পাথর-বাটি! নীলমণি* বলতো—তুমি স্বপ্ন-বিলাসী—এখন দেখ্‌ছি—সে কথাটা খুব সত্যি! তুমি যা' করবে তা' বুঝ্‌তে পারছি। আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি

আমি। যাবার আগে জেনে যেতে চাই—ওই দিদিমণি কি করবেন ?

লীলা ব'লে উঠ্‌লো—আমিও আইন-অমান্য করবো ঠাকুরদা !

তরুণ বল্‌লো—না, না, তা, হতে পারে না লীলা ! তোমাদের কারাবরণের দিন এখনো আসে নি। তুমি তোমার ঠাকুরদার সঙ্গে যাও···

লীলার গণ্ড বেয়ে দু'ফোটা গরম অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

রায়মশাই কদলীকে বসিয়ে রেখে এসেছিলেন মাধুরীর কাছে। মাধুরীর অনর্গল বকুনি শুন্‌তে শুন্‌তে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সে। হঠাৎ একটা গান গেয়ে উঠ্‌লো—

"নুতন প্রেমেতে তোমার যতন বেড়েছে !

তুমি বাঁকা, কুব্‌জী বাঁকা

দু'বাঁকাতে মিলেছে।"

চোখমুছে বিস্মিত ভাবে লীলা জিজ্ঞাসা করলো—নীচেয় গান গাইছে কে ?

রায়মশাই বল্‌লেন—একটি পথে-কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েকে নিয়ে এসেছি আমি। আমার সঙ্গে আশ্রমে যেতে রাজী হয়েছে সে···

কান পেতে গান শুন্‌তে শুন্‌তে লীলা বল্‌লো—চমৎকার মিষ্টি গলা তো !

—পরিচয় দিলে তরুণ ওকে চিন্‌তে পারবে···

—কে বলুন তো ? তরুণ জিজ্ঞাসা করলো।

—তোমাদের ওয়েদার-ককের স্ত্রী—কদলীদেবী।

—তাই নাকি ?

তখনো গান চল্‌ছিল—

"তুমি যেমন বাঁকা-আঁখি—

কুব্‌জী তেমন কোটর-চোখী।

মাথার উপর টাকের বাহার—

পরচুলোতে ঢেকেছে।"

লীলা বারান্দায় ছুটে গেল—মেয়েটিকে একবার দেখতে।

রায়মশাই বল্‌লেন—শোনো তরুণ! সত্যিই যদি তুমি আইন-অমান্য করে জেল খাটো, লীলাকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। সেও যেন তোমার সঙ্গে নেবে না পড়ে ওপথে···

তরুণ হেসে বল্‌লো—কেন বলুন তো? আপনিই কি একদিন বলেন নি—এ-দেশের মেয়েরা সহধর্ম্মিণী—ও-দেশের ওয়াইফ নয়?

রায়মশাই একটু বিরক্তভাবে বল্‌লেন—বাহাদুরী দেখিয়ে হাততালি নিতে ওয়াইফ্‌রাই পারে—সহধর্ম্মিণীরা পারে না। তাদের আত্মসম্মানের দাবী, পতি পরমগুরুর খোস্‌খেয়ালের চেয়েও অনেক বড় জিনিষ—বল্‌তে বল্‌তে নীচেয় নেবে গেলেন তিনি।

লীলা ঘরে এসে বল্‌লো—চলো, আমিও আজ ভলান্টিয়ার-লিষ্টে নাম লিখিয়ে আসি···

দৃঢ়কণ্ঠে তরুণ বল্‌লো—না।

হাতখানা চেপে ধরে লীলা জিজ্ঞাসা করলো—কেন, না?

আদেশের সুরে তরুণ বল্‌লো—তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করো লীলা! অযাচিতভাবে নিজেই তুমি বলেছিলে—কপালে এক ফোঁটা সিঁদুর পরিয়ে দিলে, দাদুর সঙ্গে চলে যাবে, এখানে আর থাকবে না।

লীলা আঁচল দিয়ে চোখমুখ চেপে ধরলো। বহুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদলো। তরুণ তাকে কোনো সান্ত্বনা দিল না। শুধু একটু বিদ্রূপের সুরে বল্‌লো—কিছু আগে আমার হাতে একটা চাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলে তুমি—আমার চেয়েও তোমার গায়ের জোর ঢের বেশী! কিন্তু এখন কি বুঝতে পারছো—সে জোর কিছু নয়?

অস্ফুটস্বরে লীলা বল্‌লো—উঃ! তুমি যে এত নিষ্ঠুর! তা, আমি জান্‌তাম না—তা' আমি জান্‌তাম না…

ব্যুঝিয়ে দেব সব। কোনো অসুবিধে হবে না। আমি এখন যাচ্ছি—তরুণের সঙ্গে একবার দেখা করতে…

কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখদুটো চেপে ধরে—লীলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লো। দাদাও নেই—ঠাকুরদাও থাক্‌বেন না!

রায়মশাই নিজের চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লেন—আঃ, কাঁদিস্‌নে পাগ্‌লী! তোর সাধনার ধন তরুণকে তো পাবি?

(৪)

লীলা ও তরুণের বিয়ে দেখ্‌তে—মেসের সবাই এসেছিল, শুধু আসেনি অরুণ। কিন্তু লোকমারফৎ উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিল সে—একটি সোনার সিঁদুরের কৌটা! তা'তে ভর্ত্তি ছিল—অরুণের বুকের রক্তের মতই টকটকে লাল সিঁদুর!

বিয়ের পর বিহারীবাবু সাতদিন মাত্র লীলাদের বাড়িতে ছিলেন। তা'তে আর কারো কোনো কষ্ট না-হলেও মাধুরী হাঁপিয়ে উঠেছিল। যেন সে আর সহ্য করতে পারছিল না।

একদিন তরুণকে সে বল্‌লো—জামাইবাবু! আপনি যে বলেছিলেন আপনার মা নেই—লীলাদির কোনো শাশুড়ীর বালাই থাকবে না? ওরে বাপ্‌রে—এযে দেখছি—সৎমা-শাশুড়ী! জোড়হাত কপালে ঠেকালো!

বিহারীবাবুর অন্তর্দ্ধানের পর, আবার হ'লো রায়মশাইয়ের আবির্ভাব। তিনি এসেই লীলাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে—সিঁদুরভরা সিঁথিতে একটি চুমু খেলেন। লীলা তাঁর বুকটা ভিজিয়ে দিল—চোখের জলে।

রায়মশাই সস্নেহে বল্‌লেন—তা'হলে আমি এখন রওনা হই, দিদিমণি! আমার কর্ত্তব্য তো শেষ হয়েছে? তোমরা এখন সুখে সংসারধর্ম্ম করো—মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবো···

লীলা বল্‌লো—আমিও আপনার সঙ্গে আশ্রমে যাবো···বাড়িটা ভাড়া-দেবার ব্যবস্থা করুন···

—সে কি, কেন বলো তো?

—এখানে একলা থাক্‌বো কি করে ?

—তরুণ কোথায় ?

—পরশু বিকেলেই মেসে চ'লে গেছেন। তাঁর মনের অবস্থা নাকি ভাল নয়···

খুব গম্ভীর ভাবে রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—কারণ ?

লীলা বল্‌লো—অরুণবাবু চাকরী নিয়ে এলাহাবাদ চলে গেছেন···

—হ্যাঁ, তা' আমি জানি। যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেছে······

—কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো দেখা করেননি !

—নাইবা করলো ? সে জন্যে প্রয়োজন হয়—ডজনখানেক স্মেলিংসল্ট এনে ঘরে রাখো। মেসে তো বন্ধু-বিরহের কণ্ডুদাবানল নেই ? সেখানে কেন পড়ে থাক্‌তে চান্ তিনি ?

লীলা অধোবদনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সে কথার কোনো জবাব দিল না।

একটু চিন্তা করে রায়মশাই বল্‌লেন—আচ্ছা, আমি এখুনি মেসে যাচ্ছি—দেখি না-এসে পারে কি করে ? হেঁঃ বন্ধু-বিরহ ! যত সব···

লীলা বল্‌লো—আজ বোধ হয় আস্‌তে পারেন একবার···

—তা' কি ক'রে জান্‌লে ?

—চরকাটা ফেলে গেছেন এখানে। পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন। সকালে এসেছিল মেসের চাকরটা। ব'লে দিয়েছি—তিনি নিজে না এলে পাঠাবো না।

—বেশ করেছ। শোনো দিদিমণি—তোমাকে একটি কথা বলি। তরুণের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো। হয় বইপড়া বা কবিতা

লেখা—আর না হয় চরকা চালানো। এর কোনোটাই তার মত যুবকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত শারীরিক শ্রমের কাজ নয়। তার বয়সে, রোজ আধসের কি একপোয়া ঘাম না-ঝরালে শরীর সুস্থ থাকবে কেন?

লীলা একদৃষ্টে চেয়েছিল রায়মশাইয়ের মুখের দিকে। হঠাৎ তার বড় বড় চোখ দিয়ে দু'ফোটা গরম অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

—ওকি তুমি কাঁদছো কেন দিদিমণি? রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

চোখ মুছে লীলা বল্‌লো—আমার ভয় হচ্ছে ঠাকুরদা! উনিও বোধহয় বাবার মত···কথাটা সম্পূর্ণ বলতে না পেরে আঁচল দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরলো।

—বাবার মত অকালে পটল তুল্‌তে পারেন—এই তো বল্‌তে চাও? রায়মশাইয়ের কোঠরগত চোখদুটিও ছল্‌ছলিয়ে উঠ্‌লো! একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে খুব গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন—সেই আশঙ্কাতেই··· যাক্‌গে, এখন আর সে অনুশোচনায় তো কোনো লাভ নেই? সাম্‌লে নিতে হবে। নীলমণিকে আমি বলতাম্—তোমার লেখাপড়ার নেশা, শৈলেনের মদের নেশার চেয়ে কম নয়। দেখেছো তো? তোমার বাবা কলেজে একবার যেতো—তারপর বাড়িতে ফিরেই পড়ার ঘরে দরজা এঁটে বস্‌তো! কেউ কখনো তা'কে রাস্তায় একটু পায়চারী করতেও দেখেনি। তাইতো এলো ডায়বেটিস্, ব্লাড্‌প্রেসার, ভারটিগো, প্যাল্‌পিটেসান, কতকি! শেষে মারা গেল—কারবাঙ্কেলে! সে যা' হবার তা'তো হয়েই গেছে। এখন তরুণের সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে। সবসময় তাকে কাছে রাখতে চেষ্টা করবে। সকালে বিকেলে হাতের বই টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—কান দু'টো ধরে 'ওঠবোস' করাবে···

লীলার পাশে দাঁড়িয়ে মাধুরী অবাক হয়ে শুনছিল—ঠাকুরদার

বক্তৃতা! তরুণের এমন কি কঠিন ব্যাধি হলো—যার জন্তে লীলার চোখ দিয়েও জল গড়াচ্ছে, ঠাকুরদার চোখে-মুখেও ফুটে উঠেছে ভয়ানক আশঙ্কার চিহ্ন! মাধুরী তা' ঠিক বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ কান ধরে যে 'দাওয়াই' দেবার ব্যবস্থা হলো—তা শুনে ফিক্ করে একটু হেসে ফেলে বল্‌লো—ঠাকুরদার যে কথা! দিদিমণি তা' পারবে কি করে?

রায়মশাই চটে উঠ্‌লেন—কেন পারবে না? পারতেই হবে। তরুণের জন্তে যখন পাগল হয়ে উঠেছিলেন—তখন মনে ছিলনা?

লজ্জিতভাবে লীলা সেখান থেকে চলে গেল।

মস্তব্যটা বড় কর্কশ হয়ে গেছে—ভাব্‌তে ভাব্‌তে রায়মশাই বল্‌লেন—আমিও যাই একটু ঘুরে আসি। তরুণ যদি আগেই আসে —একটু বস্‌তে ব'লো। আমার সঙ্গে দেখা না-ক'রে যেন ফিরে যায় না।

রায়মশাই বেরিয়ে পড়লেন। মাধুরী চোখমুখ ঘুরিয়ে আপন মনে বলে উঠ্‌লো—জামাইবাবুর কিচ্ছু হয়নি! মিছেমিছি তোমাদের যত কুলক্ষুণে আলোচনা···

. মেসে তখন একটা মজার ব্যাপার চল্‌ছিল। কদলীদেবী এসে হাজির হয়েছেন, তার স্বামীর খোঁজে। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের মেয়েটি—চাঁপা কলার মত রং। কিন্তু নাক-কান-চোখ-মুখ দেখ্‌লে মনে হয় যেন একটিও তার নিজের নয়। সবই ধার-করা। রূপের উপকরণ সবই আছে, কিন্তু সেগুলি এতই বে-মানান্ ও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো যে, তাকে দেখলেই মনে হবে—শুধু শিল্পীর অযত্নে, অর্থাৎ একটু সাজিয়ে রাখার অভাবে—মেয়েটিকে সুন্দরী বলা যায় না।

পাঁচবছর পরে স্বামী-পরিত্যক্তা কদলীদেবীর মনে শ্রীরাধা-ভাব জেগেছে—তার ধারণা হয়েছে—শ্যামচাঁদ আজ···

"রাজা হয়ে বসেছে মথুরা-ধামে—
কুব্জাদাসী রাণী হয়ে বসেছে তার বামে!"

অতি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর! মেসে এসে বিরহ-কীর্ত্তন গাইতে আরম্ভ করেছেন তিনি। মেস-মেম্বররা ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাঁকে! যখন রায়মশাই এসে উপস্থিত হলেন তখন করুণকণ্ঠে কদলীদেবী গাইছেছিলেন—

"আমার শ্যাম-সুখ-পাখী, সুন্দর নিরখি—
আমি, ধরেছি নয়ন-ফাঁদে"

রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—কে এ মেয়েটি?

মেসের একটি ছেলে বল্‌লো—লেডি ওয়েদার-কক্!

রায়মশাই বুঝ্‌লেন—ব্যাপার কি। তারপর অনুসন্ধানে জান্‌লেন তরুণ অনেকক্ষণ মেস থেকে বেরিয়ে গেছে। মেয়েটির কাছে এসে বল্‌লেন—মা, আমি তোমার শ্যামচাঁদের খবর জানি—এসো আমার সঙ্গে···

বিস্মিতভাবে রায়মশাইয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কদলীদেবী বল্‌লেন—তুমি অক্রূর বুঝি?

একটু হেসে রায়মশাই বললেন—হ্যাঁ মা, আমার ভিতর কোনো ক্রুরতা নেই—তুমি নির্ভয়ে চলে এসো···

একটা রিক্‌সা ডেকে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে রায়মশাই রওনা হলেন।

লীলাদের বাড়ির দোতলায় লীলার শোবার ঘর। চুল ছড়িয়ে, একটা বালিশ বুকে দিয়ে, লীলা পড়েছিল বিছানার উপর। মনে মনে

সঙ্কল্প করছিল—তরুণকে একদিন সে অরুণের চেয়েও স্বাস্থ্যবান-সুপুরুষ গ'ড়ে তুলবে। ঠাকুরদা বলেছেন—"সব সময় তাকে কাছে রাখ্‌তে চেষ্টা করো।" নিশ্চয়ই! আজ যদি তরুণ না আসে—কাল নিজেই সে যাবে মেসে। ছুটো মুটের মাথায় বাক্স-বিছানা-বই—যা-কিছু সব চাপিয়ে দিয়ে, বাধ্য করবে তাকে এ বাড়িতে আসতে……

তারপর, বাজার থেকে কিনে আনবে একজোড়া মুগুর ও একজোড়া 'চেষ্ট-ডেভেলপার'! ছাতের উপর খোলা-হাওয়ায় নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে চালাবে—সকালে মুগুর—বিকেলে ডেভেলপার! খেতে দেবে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। আঙুর, বেদানা, কমলালেবু, সব-সময় ঘরে মজুত রাখ্‌বে। বাড়িতে গরু এনে ছুধ ছুইয়ে দিয়ে যাবে গয়লা, আর ঠাকুরদা পল্লী-অঞ্চল থেকে পাঠিয়ে দেবেন অতি বিশুদ্ধ মাখম। রান্নাঘরের পাশেই একটা খাঁচার ভিতরে থাকবে 'চিকেন্‌'!

তরুণকে লীলা কিছুতেই কৃশ থাক্‌তে দেবে না। এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসে অরুণ তো চিন্‌তেই পারবে না তাকে! ছ'মাস পরে ঠাকুরদা যখন কলকাতায় আস্‌বেন—তখন তিনিও অবাক হয়ে যাবেন।

অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনার সঙ্গে মনে মনে সঙ্কল্পগুলি আওড়াতে আওড়াতে লীলা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তরুণ এসে কড়া নাড়তেই মাধুরী দরজা খুলে দিয়েছে। পড়ার ঘরে বসে তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—তোমার দিদিমণি কোথায় মাধুরী?

—ঘুমুচ্ছেন···

—আমার চরকাটা কোথায় জানো?

—জানি। উপরে শোবার ঘরের বড় আলমারীর ভিতর তালাচাবি দিয়ে আটকে রেখেছেন। আপনাকে আর সুতো কাটতে দেবেন না।

—কেন ?

—আচ্ছা, আপনার কি কোনো কঠিন রোগ হয়েছে ?

—আমার ? বিস্মিতভাবে মুখের দিকে চেয়ে রইলো তরুণ।

—লীলাদির বাবার মত রাস্তায় ঘুরে পড়ে গেছেন কখনো ?

—আমি ? কি বল্‌ছো মাধুরী ? তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছিনে···

—কি আবার বুঝ্‌বেন ? আমি জানি আপনার কিচ্ছু হয়নি জামাইবাবু ! হয়েছে লীলাদির মাথাখারাপ। আপনার রোগের কথা ভেবে—লীলাদি একেবারে কেঁদেই আকুল। আর এক মাথাখারাপ ঠাকুরদা। তিনি ব্যবস্থা দিলেন—সকালে-বিকেলে কান ধরে 'ওঠ-বোস্' করাও—সেরে যাবে।

দরজা পর্য্যন্ত এসে লীলা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। মাধুরীর শেষ-কথাক'টি শুনে সে বুঝ্‌লো—আগাগোড়া 'রিপোর্ট' দাখিল-করা হয়ে গেছে। মাধুরীকে ধমক দিয়ে লীলা বল্‌লো—বেরিয়ে যা এ ঘরে থেকে···

একটু হেসে তরুণ বল্‌লো—মাধুরীকে তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন লীলা ? এখুনি কান ধরে ওঠ-বোস করাবে নাকি ?

—হ্যাঁ, তবে এখানে নয়—ওপরে চলো···বলেই তরুণের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একটু জোরে চাপ দিল। তরুণ উঃ বলে হাতখানা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না।

তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—আমার চরকা নাকি 'আণ্ডার—লক্' এও কি ?

—সে-সম্বন্ধে এখানে কিচ্ছু বল্‌বো না—ওপরে চলো···আঃ ! চলো বল্‌ছি···

যো হুকুম্—বলে একটা কুর্নিশ করে লীলার আগেই তরুণ উপরে চলে গেল। মাধুরী দূরে দাঁড়িয়ে আঁড়চোখে চেয়ে আপন মনে বল্‌লো—দুটো করে সিঁড়ি টপ্‌কাচ্ছে! তবু বলবে—ওই মানুষের নাকি খুব কঠিন রোগ হয়েছে—মাথাখারাপ নাতো কি?

ঘরে ঢুকে লীলা দরজাটা বন্ধ করলো। তারপর খুব মুরুব্বীয়ানার সঙ্গে বল্‌লো—তুমি আর মেসে ফিরে যেতে পারবে না, এখানেই থাক্‌বে···

—কারণ?

—কারণ, একটি দিনের জন্যেও আমি আর থাকতে পারছিনে—তোমাকে ছেড়ে···

—কী আশ্চর্য্য! তোমার ঠাকুরদার সঙ্গে 'পল্লীবাসিনী' হবে না? নাকে নথ, পায়ে মল, কাঁকে কলসী! আমি মেসে থেকে চোখ বুজে তোমার সে রূপ ধ্যান করবো, আর গাইবো···

"ওগো, রূপসী-পল্লীবাসিনী!
শূণ্যঘাটে, কেন বলো একাকিনী, সুহাসিনী!
খেলিছে রঙ্গে, কত বিভঙ্গে—
বক্ষে তব তরঙ্গিণী,
উলসি, বিলসি, নাচিছে কলসী
তব সোহাগে সোহাগিনী!
ওগো, রূপসী-পল্লীবাসিনী!"

তরুণ বিছানার উপর একটু কাৎ হ'য়ে বসেছিল। লীলা—ছুটে গিয়ে তার কাঁধ-দুটো ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে, উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠ্‌লো না, না, চোখ বুজে নয়—চোখ চেয়ে তুমি আমার সে-রূপ দেখ্‌বে আর এই গান গাইবে! যাবে? আমার সঙ্গে যাবে? বলো? বলো?

তরুণ একটু হেসে বললো—বিয়ের আগে তো বলেছিলে—তোমার কপালে এককৌটো সিঁদুর পরিয়ে দিলেই আমার নিষ্কৃতি !

—তোমাকে সে-প্রতিশ্রুতি যে দিয়েছিল, সে আমি নই···

লীলার চোখেমুখে ফুটে উঠলো এক অপূর্ব্ব দীপ্তি ! চোখের কানায় কানায় দু'ফোটা অশ্রু টলমল করতে লাগলো—যেন এখুনি ঝরে পড়বে ! মনে মনে তরুণ স্বীকার করলো—সত্যিই সে-লীলা আর এ-লীলা এক নয়। সে ছিল হাস্যময়ী, চটুল ও চঞ্চল। এ যেন অনুরাগে উদ্দীপ্ত—দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ—কর্ত্তব্যে কঠোর—মহিমময়ী—সীমন্তিনী !

হঠাৎ লীলা তরুণের বুকের উপর মাথাটা রেখে কেঁদে উঠলো—লক্ষ্মীটি আমার ! আর কাঁদিও না আমাকে। কাল সারারাত আর সারাদিন, আমি কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছি। সত্যি বলছি—এখন তোমাকে ছেড়ে থাকতে হ'লে—আমি কাঁদতে কাঁদতেই মরে যাবো···

লীলার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের মধ্যে চেপে ধরে তরুণ বললো—সেতো আর হয় না লীলা ! আমি কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার-লিষ্টে নাম দিয়েছি—আইন-অমান্য করবো—প্রয়োজন হ'লে নিরুপদ্রব-ভাবে কারাবরণও করতে হবে আমাকে···

—নাম দিয়েছ ? কারাবরণ করবে ?

—হ্যাঁ—কালই আমাকে ক্যাম্পে যেতে হবে—পিছিয়ে আসবার কোনো উপায় নেই !

—আমিও যাবো তোমার সঙ্গে—আমিও আইন-অমান্য করবো। তোমাকে ছেড়ে থাকতে কিছুতেই পারবো না আমি···

ঘরের দরজাটাই লীলা বন্ধ করেছিল, জানলাগুলির দিকে বিশেষ

ভাবে নজর দেয় নি। খুব সামান্য-একটু-খোলা একটা জানলার কাছে এসে রায়মশাই বহুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। নাতী ও নাত্‌নীর এই আত্মহারা দাম্পত্য-প্রণয়ের মাধুর্য্যটুকু লক্ষ্য ক'রে, তাঁর দু'চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। হঠাৎ তরুণ আইন-অমান্য-আন্দোলনে যোগদান করেছে শুনে, তিনি চম্‌কে উঠ্‌লেন। তাইতো মেয়েটার কি উপায় হবে এখন ?

—দরজাটা খোলো তো দিদিমণি ? বাইরে দাঁড়িয়ে রায়মশাই বল্‌লেন।

লীলা দরজা খুলে দিল। ভিতরে এসে রায়মশাই বল্‌লেন—শোনো তরুণ! তোমার সঙ্গে লীলার বিয়ে হয়—এ ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। তার একটা কারণ, তুমি স্বাস্থ্যহীন। আর একটা—তুমি আমার সুশীলাকে ভুলে থাকার অন্তরায়। লীলার মত নারীরত্ন-লাভ করা ভাগ্যের কথা। আমার ইচ্ছে ছিল—কিছুদিন তোমাকে যদি কাছে পেতাম—একটু ঘ'সেমেজে দেখ্‌তাম, তোমার কদভ্যাসের মরচেগুলো তুলে-ফেলা যায় কি না ?

একটু হেসে তরুণ বল্‌লো—কোন্‌টা আমার কদভ্যাস বলুন তো ?

—কোন্‌টা নয় ? বইপড়া, কবিতা-লেখা, চরকা-চালানো, রাজনীতি কপ্‌চানো, আর চোখবুজে স্বরাজের স্বপ্ন-দেখা, এর কোনোটাই তোমাকে সুস্থ-সবল মানুষ তৈরি করতে পারে না। আমার পল্লী-আশ্রমে গেলে দেখ্‌তে পেতে—তোমার চেয়েও ছোট ছোট ছেলেরা—গাছে উঠ্‌ছে—জলে সাঁতরাচ্ছে—ফাঁকা মাঠে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে···

—আর, মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া জ্বরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বিছানায় শুয়ে পড়ছে—সে কথাটাও বলুন ?

রায়মশাই একটু বিরক্তভাবে বল্‌লেন—পল্লী-অঞ্চলে ম্যালেরিয়া হয় তাদের—যারা স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন। আমার আশ্রম থেকে ম্যালেরিয়াকে আমি একেবারেই তাড়িয়ে দিইছি···

উচ্ছ্বসিতভাবে তরুণ বল্‌লো—কিন্তু—সারা বাংলাদেশ থেকে ম্যালেরিয়া-তাড়াবার উপায় হচ্ছে—স্বরাজ। সমগ্র ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান ক'রে—প্রত্যেক ভারতবাসীর জন্য দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন-সংস্থানের উপায় হচ্ছে—স্বরাজ। জাতিগত বৈশিষ্ট বজায় রেখে প্রত্যেক ভারতবাসীকে আত্মসম্মানসম্পন্ন ও স্বাধীন-মনোবৃত্তি-বিশিষ্ট গড়ে-তোলার উপায় হচ্ছে—স্বরাজ। মরুভূমির মধ্যে কোথায় আপনি একটি 'ওয়েশিস্' গ'ড়ে তুলেছেন—তা, দেখে আপনাকে খুব বাহবা দিতে পারি, কিন্তু ভারতের পরাধীনতার গ্লানি তো তা'তে ঘুচ্‌বে না দাদু!

রায়মশাই বল্‌লেন—পয়সার হিসেব রাখ্‌লেই টাকার হিসেব থাকে। তোমাদের মত কতকগুলি দেশকর্ম্মী যদি মঞ্চ-বক্তৃতার বহরটা একটু কমিয়ে, সস্তা হাততালি ও জয়জয়-কারের মোহটা একটু কাটিয়ে পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ 'ওয়েশিস্' গ'ড়ে তোলে—তা'হলে ভারতের 'মরুভূমিত্ব' নিশ্চয়ই দূর হয়ে যাবে। স্বরাজ-সাধনার জন্যে তো মানুষ দরকার? তুমি একটি পূর্ণবয়স্ক যুবক। পার কি এই বাহাত্তুরে বুড়োর একটি 'থাপ্‌পড়্‌' সহ্য করতে? তা' যদি না পারো—কেন যাও বাতাহত-বেতসীর মত দোদুল-দুল অঙ্গসৌষ্ঠব নিয়ে কারাবরণের দুঃসাহস দেখাতে?

তরুণ হোহো করে হেসে উঠ্‌লো। লীলার দিকে চেয়ে—রায়মশাইকে শুনিয়ে বল্‌লো—বাহাত্তুরে হ'লেও তোমার ঠাকুরদা

এখনো যাত্রাদলের ভীমের পার্ট 'একটো' করতে পারেন। 'ধর্ যুদ্ধ ধর্' ব'লে দুঃশাসনকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করতে পারেন···

—কিন্তু তার কি কোনো প্রয়োজন আছে দাদু? হাজার হাজার লোক আহত হচ্ছে—আজ একটি ছোট বোমার আঘাতে। মহাত্মার নিস্ক্রিয়-প্রতিরোধ যে সেই বৈজ্ঞানিক বোমার চেয়েও বেশী শক্তিশালী— তাও প্রমাণিত হ'য়ে যাচ্ছে। ভেবে দেখুন—ঋষিযুগের কথা। ক্রুদ্ধ ইন্দ্র বজ্র তুল্লেন। ঋষি-বশিষ্ট চোখরাঙিয়ে বল্লেন—"বজ্র! ত্বং স্তম্ভিতো ভব!" ইন্দ্রের উদ্যত হাত 'প্যারালাইজড্' হয়ে থাক্‌লো। ভারতের পূণ্যতীর্থে মহাত্মা গান্ধীও আজ উদ্বোধন করতে চান— সেই শক্তির। একজন তপঃক্লিষ্ট ঋষি—অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ক্ষত্রিয়-রাজাকে বল্‌ছেন—'নেবে এসো সিংহাসন থেকে'! তখনি তিনি নেবে আস্‌ছেন—পোষা মেষ-শাবকের মত। কেন? এ প্রভাব কিসের? মহাত্মা গান্ধী বল্‌ছেন—হে অমৃতের পুত্রগণ! জাগ্রত করো সেই আত্মিক-শক্তিকে, প্রতিবাদ করো আত্মাবমানজনক প্রত্যেকটি অন্যায়ের। বুক ফুলিয়ে মৃত্যুভয়কে জয় করো—নিরস্ত্র-ভাবে গোলা-বারুদের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দেবে—যারা সত্যসন্ধ ও নির্ভীক! দেহধর্ম্মী-দেশকর্ম্মীরা পিছিয়ে পড়বেই···তা' জানি···তরুন হাস্‌সে লাগ্‌লো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রায়মশাই বল্লেন—হুঁ, বুঝ্‌লাম···

—কি বুঝ্‌লেন দাদু?

—বুঝ্‌লাম তোমাদের স্বরাজ মানে সোনার পাথর-বাটি! নীলমণি বল্‌তো—তুমি স্বপ্ন-বিলাসী—এখন দেখ্‌ছি—সে কথাটা খুব সত্যি! তুমি যা' করবে তা' বুঝ্‌তে পারছি। আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি

আমি। যাবার আগে জেনে যেতে চাই—ওই দিদিমণি কি করবেন ?

লীলা ব'লে উঠ্‌লো—আমিও আইন-অমান্য করবো ঠাকুরদা !

তরুণ বল্‌লো—না, না, তা, হতে পারে না লীলা ! তোমাদের কারাবরণের দিন এখনো আসে নি। তুমি তোমার ঠাকুরদার সঙ্গে যাও…

লীলার গণ্ড বেয়ে দু'ফোটা গরম অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

রায়মশাই কদলীকে বসিয়ে রেখে এসেছিলেন মাধুরীর কাছে। মাধুরীর অনর্গল বকুনি শুন্‌তে শুন্‌তে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সে। হঠাৎ একটা গান গেয়ে উঠ্‌লো—

"নূতন প্রেমেতে তোমার যতন বেড়েছে !
তুমি বাঁকা, কুব্‌জী বাঁকা
দু'বাঁকাতে মিলেছে।"

চোখমুছে বিস্মিত ভাবে লীলা জিজ্ঞাসা করলো—নীচের গান গাইছে কে ?

রায়মশাই বল্‌লেন—একটি পথে-কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েকে নিয়ে এসেছি আমি। আমার সঙ্গে আশ্রমে যেতে রাজী হয়েছে সে…

কান পেতে গান শুন্‌তে শুন্‌তে লীলা বল্‌লো—চমৎকার মিষ্টি গলা তো !

—পরিচয় দিলে তরুণ ওকে চিন্‌তে পারবে…

—কে বলুন তো ? তরুণ জিজ্ঞাসা করলো।

—তোমাদের ওয়েদার-ককের স্ত্রী—কদলীদেবী।

—তাই নাকি ?

তখনো গান চলছিল—

> "তুমি যেমন বাঁকা-আঁখি—
> কুব্‌জী তেমন কোটর-চোখী!
> মাথার উপর টাকের বাহার—
> পরচুলোতে ঢেকেছে।"

লীলা বারান্দায় ছুটে গেল—মেয়েটিকে একবার দেখতে।

রায়মশাই বললেন—শোনো তরুণ! সত্যিই যদি তুমি আইন-অমান্য করে জেল খাটো, লীলাকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। সেও যেন তোমার সঙ্গে নেবে না পড়ে ওপথে···

তরুণ হেসে বললো—কেন বলুন তো? আপনিই কি একদিন বলেন নি—এ-দেশের মেয়েরা সহধর্ম্মিণী—ও-দেশের ওয়াইফ নয়?

রায়মশাই একটু বিরক্তভাবে বললেন—বাহাদুরী দেখিয়ে হাততালি নিতে ওয়াইফ্‌রাই পারে—সহধর্ম্মিণীরা পারে না। তাদের আত্মসম্মানের দাবী, পতি পরমগুরুর খোস্‌খেয়ালের চেয়েও অনেক বড় জিনিষ—বলতে বলতে নীচেয় নেবে গেলেন তিনি।

লীলা ঘরে এসে বললো—চলো, আমিও আজ ভলাণ্টিয়ার-লিষ্টে নাম লিখিয়ে আসি···

দৃঢ়কণ্ঠে তরুণ বললো—না।

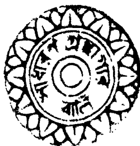
হাতখানা চেপে ধরে লীলা জিজ্ঞাসা করলো—কেন, না?

আদেশের সুরে তরুণ বললো—তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করো লীলা! অযাচিতভাবে নিজেই তুমি বলেছিলে—কপালে এক ফোঁটা সিঁদুর পরিয়ে দিলে, দাদুর সঙ্গে চলে যাবে, এখানে আর থাকবে না।

লীলা আঁচল দিয়ে চোখমুখ চেপে ধরলো। বহুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদলো। তরুণ তাকে কোনো সান্ত্বনা দিল না। শুধু একটু বিদ্রূপের সুরে বল্‌লো—কিছু আগে আমার হাতে একটা চাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলে তুমি—আমার চেয়েও তোমার গায়ের জোর ঢের বেশী! কিন্তু এখন কি বুঝতে পারছো—সে জোর কিছু নয়?

অস্ফুটস্বরে লীলা বল্‌লো—উঃ! তুমি যে এত নিষ্ঠুর! তা, আমি জান্‌তাম না—তা' আমি জান্‌তাম না···



(৫)

লীলা, মাধুরী, ও কদলীকে নিয়ে রায়মশাই এসে পৌছেচেন তার পল্লী-আশ্রমে। আশ্রমটির নাম "স্বাবলম্বী বিদ্যার্থী-ভবন।"

প্রায় শতাধিক গরীব ছেলেমেয়ে এই বিদ্যার্থী-ভবনে বাস করে। তাদের অধিকাংশই পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া। বোধ হয় ভরণ-পোষণ করতে না পেরেই দরিদ্র মা-বাপ্ তাদের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। তা'ছাড়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থ-পল্লীর ছেলেমেয়েরাও এখানে আসে, লেখাপড়া শিখ্‌তে ও খেলাধুলা করতে।

সুবিন্যস্ত ও বাসোপযোগী কতকগুলি 'টাইলড্-সেডে' স্থানীয় বিদ্যার্থীরা বাস করে। বালকবিভাগ ও বালিকাবিভাগ সুনির্দ্দিষ্টভাবে দুই দিকে রেখে মাঝখানে আছে একটি বিদ্যালয় গৃহ। সেখানে বালক-বালিকারা সহশিক্ষা লাভ করে।

পাশাপাশি দুইটি বড় দীঘি। একটি স্নানের, আর একটি পানীয় জলের। দু'টিতেই মাছ ভর্ত্তি। কয়েকটি ধানের মড়াই—সারা বছরের ধান তা'তে বাঁধা থাকে। একটি গোশালায় অনেকগুলি গাভী—বিদ্যার্থীদের দুধ জোগায়। দূরে দূরে দুইটি সব্‌জী-বাগে সব রকম শাক্-সব্‌জী উৎপন্ন হয়। তা' ছাড়া আম-জাম-কাঁঠাল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের বড় বড় গাছগুলি বিক্ষিপ্তভাবে চারিদিক ছড়িয়ে আছে। কোথাও দলবেঁধে আলো-বাতাসের গতি রোধ করেনি। এই সব গাছতলা অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। তাদের ছায়ায় ব'সে

ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনা করে। পাকাফল তলায় পড়লে কাড়াকাড়ি করে খায়। কোনো কাঁচা-ফল্ পাড়ার হুকুম নেই।

প্রায় পাঁচশো বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই বিষ্যার্থী-ভবনের সীমা নির্দ্দেশ করছে—অসংখ্য নারিকেল, সুপারী ও খেজুর গাছ। মাঝে মাঝে দেশী ও বিদেশী নানাবিধ ফুলের বাগান ও সবুজ তৃণের জমিগুলি স্থানটিকে সাজিয়ে রেখেছে অতি মনোরম একটি পটে-আঁকা-ছবির মত।

সর্ব্বাধ্যক্ষ রায়মশাই লীলাকে দিয়েছেন—মেয়েদের পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনার ভার। মাধুরী ও কদলীকে দিয়েছেন, ছেলে-মেয়ে নির্ব্বিশেষে সকলের খাদ্যাদি বণ্টন ও সেবাযত্নের দায়িত্ব।

বিদ্যালয়ের রুচিবাগীশ প্রধান-শিক্ষকমশাই ছিলেন চিরকুমার। কোনো স্ত্রীলোক দেখলেই চম্‌কে ওঠেন ও পিছন ফিরে দাঁড়ান। বয়স পঞ্চাসের কোঠায়। মুখে আবক্ষ কাঁচা-পাকা দাঁড়ি। গায়ে সর্ব্বদাই একটা পৈতৃক বেমানান—তেল-চুঁয়ানো কোট্। পায়ে এক জোড়া শেলাই-বুরুশের সাহায্যে জীবিত-রাখা সেকেলে সু!

সব বিষয়েই তিনি রায়মশাইয়ের একান্ত অনুরাগী ও অনুবর্ত্তী লোক। কিন্তু হঠাৎ বিদ্যার্থীভবনে কয়েকটি মহিলা আমদানী হওয়াতে তাঁর মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হ'য়ে উঠেছে। যখন-তখন সামান্য অপরাধে ছেলেগুলিকে নিদারুণ প্রহার করতে আরম্ভ করেছেন তিনি।

অন্যান্য শিক্ষকরা যথাসময়ে বিদ্যালয়ে আস্‌তেন নিকটবর্ত্তী পল্লী হ'তে। চিরকুমার প্রধান-শিক্ষকমশাই বালকবিভাগের পর্য্যবেক্ষণের ভার নিয়ে বিদ্যার্থী ভবনেই থাকেন। মাধুরীর বড্ড লোভ হয় এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় জমাবার—কিন্তু পেরে ওঠে না।

বালকবিভাগ ও বালিকাবিভাগের—দোসীমানায় আজ হঠাৎ সামনাসামনি সাক্ষাৎ হওয়াতে, মাধুরী বলে উঠ্‌লো—মাষ্টারমশাই ! আপনার ওই দাঁড়িগুলো কামিয়ে ফেল্‌তে পারেন ?

পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর সুরে মাষ্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন—কেন বলুন তো ?

—ওর ভিতর ছারপোকা ঢুক্‌লে আর বেরুতে চাইবে না। শেষে নিজেই চুল্‌কে চুল্‌কে ঘা করে তুল্‌বেন সারা মুখে ! শুনুন তবে বলি···আমার দাদাশ্বশুরের মুখেও ছিল···আপনার মত দাড়ি······ ঢুক্‌লো তা'তে ছারপোকা···শেষে চুল্‌কানি······

—থামুন্‌ ! ধমক দিয়ে মাষ্টার-মশাই বল্‌লেন। আমার মুখে যা হোক, পোকা পড়ুক্‌—তাতে আপনার কি ?

—আমরা তো চোখবুজে থাকবো না ? ঘেঁয়ো-মুখ দেখ্‌লে, নিশ্চয়ই ঘেন্না করবে ? সুন্দর সুশ্রী মুখখানি দেখ্‌লে—কার না ভাল লাগে, কার না-ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে ? কী সুন্দর মুখখানি আপনার ! কেন ও-রকম নোংরা ক'রে রাখেন ?

—অশ্লীল ! অশ্লীল ! ব'লে চিৎকার করতে করতে তিনি একেবারে রায়মশাইয়ের কুটীরে গিয়ে হাজির হলেন।

সেখানে একটা খাটিয়ার উপর—রায়মশাই কাৎ হ'য়ে বিশ্রাম করছিলেন। সাম্‌নে আর একটা খাটিয়ার উপর বসেছিল লীলা ও কদলী। তাদের দেখেই মাষ্টারমশাই সংযত হলেন। খুব শান্তভাবে বল্‌লেন—আমার গুরুতর অভিযোগ আছে। লিখিত ভাবেই দাখিল করবো। নমস্কার······বলেই লীলা ও কদলীর দিকে পিছন ফিরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লীলা জিজ্ঞাসা করলো—লোকটি কি মাথা-খারাপ?

রায়মশাই বললেন—হ্যাঁ, একটু, কিন্তু—খুব পণ্ডিত লোক!

এখানে আসবার সময় সারা পথে লীলা শুধু তরুণের কথাই ভেবেছে। তরুণকে ছেড়ে সে কোথায় যাচ্ছে? এ পৃথিবীতে কি এমন কোনো স্থান আছে—তরুণ কাছে না-থাকলে, যেখানে গিয়ে আজ সে সুখী হ'তে পারে? নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু উপায় কি? তরুণ যে এত নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর হ'তে পারে—তা' সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—এ জায়গাটা তোমার কেমন লাগছে দিদিমণি?

লীলা কোনো জবাব দিতে পারলো না। মাথাটি নীচু ক'রে ব'সে রইলো। গোপন করতে চেষ্টা করলেও রায়মশাই বুঝলেন—তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

—দেখো দিদিমণি! রায়মশাই বলতে লাগলেন—স্বাস্থ্য যতই ভাল হোক, গায়ের জোর যতই বাড়িয়ে নাও, তোমাদের স্নায়ু-দুর্ব্বলতা বড্ড বেশী! সে প্রতিযোগিতায় পুরুষের কাছে বেজায় হেরে যাও তোমরা। তরুণ কি তোমার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলছে? সুশীলার বাবা আমি। আমি ছিলাম মাতাল। এ কথা শুনে মনের ঘেন্নায় সুশীলা বিষ খেলো। কিন্তু আমার জামাই বিহারীর বাবা ছিল অতি ছোটলোক গেঁজেল! কতদিন মদের মুখে বিহারীকে আমিই বলেছি—বটতলায় ইট পেতে-বসা, এক পয়সার নেশাখোরের ছেলে তুই! কই! সে তো বিষ খায়নি? আমার বোকা-মেয়ে মরে গেল। কিন্তু সেই গেঁজেলের ছেলে তো আজ আবার আর একজনের মেয়ে বিয়ে ক'রে পরম সুখে ঘর-সংসার করছে?

রায়মশাইয়ের চোখের সামনে সুশীলার একটা ফটো টাঙানো ছিল। সেই দিকে তিনি অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। সজল চোখ-তুটো মুছে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—তুমি আর তরুণ তুজনেই দেশকে ভালবাসো। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি—তোমাদের মিলনাকাঙ্ক্ষার মূলেও ছিল—সেই আকর্ষণ। মুক্তির পথ-সম্বন্ধে যে মত-বিরোধ আজ তোমাদের তু'জনকে বিচ্ছিন্ন করেছে—তা যেন উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ না করে। দেশপ্রীতির পরিচয়ে তুমি যে তরুণের চেয়ে ছোটো বা খাটো, একথা প্রমাণ হ'তে দিও না। এই 'স্বাবলম্বী বিদ্যার্থী ভবনে' আমি তোমাদের তু'জনকেই চেয়েছিলাম। তরুণকে পাইনি, তোমাকে পেয়েছি। তুমি একে সার্থক ক'রে তোলো—কোনো দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়ে তরুণের কাছে হেরে যেওনা……

চোখ মুছে রায়মশাইয়ের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে লীলা বল্‌লো—আজ থেকে আমি সেই চেষ্টাই করবো। আশীর্ব্বাদ করুন—যেন পারি……

কদলী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো।

—হাস্‌ছো কেন কলি? রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন। কদলীর 'দ' বাদ দিয়ে, তিনি শুধু 'কলি' বলে ডাকৃতে সুরু করেছেন। মেয়ের সেই বিপ্লবাত্মক ফলের নামটা এখানে আর প্রচারিত না হয়—সে বিষয়ে লীলা ও মাধুরীকেও সতর্ক ক'রে দিয়েছেন।

কলি বল্‌লো—লীলা যে কেন কাঁদে তা' বুঝি। কিন্তু আপনি তা'কে কি বোঝালেন, আর সে কি বুঝ্‌লো, তা' আমি মোটেই বুঝ্‌লাম না…

রায়মশাই একটু হেসে বল্‌লেন—বুঝ্‌বে। আজ নয় তু'দিন বাদে

—তোমাকে আর মাধুরীকেও বুঝিয়ে দেব যে—তোমাদের জীবনও ব্যর্থ হ'য়ে যায় নি……

—ওসব আমি বুঝিনা ঠাকুর! আপনি বলেছেন—এখানে এলে আমার শ্যামচাঁদের দেখা পাবো। সে ভাগ্যি আমার কবে হবে—তাই বলুন……

রায়মশাই বল্‌লেন—তোমার শ্যামচাঁদের নাম তো ব্রজেশ্বর চৌধুরী?

কলি রেগে উঠ্‌লো—আপনি কিচ্ছু বোঝেন না। যে ব্রজেশ্বর, সেই তো শ্যামচাঁদ! চৌধুরীটা আবার কে? তা'কে কে চাইছে? ওসব চৌধুরী, থোড়বড়ি, ঝাল-চচ্চড়ি, প্যাঁজের ফুলুরী—লীলাকে আর মাধুরীকে এনে দেবেন। ওদের জিভে রস আছে। আমার এই বুকটা পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে! আমি আমার শ্যামচাঁদকে চাই……

—আচ্ছা, আচ্ছা—রায়মশাই হাস্‌তে লাগ্‌লেন। তাহলে একটি বছর এই ব্রজবালকদের সেবাযত্ন করো—অক্রুর যা' বলে তা' শোনো। নিশ্চয়ই ব্রজেশ্বরের দয়া হবে। তিনি নিজেই এসে উদয় হবেন এখানে…

মাথাটা ঝেঁকে কলি বল্‌লো—ঠাকুর! মাথাভরা সাদাচুল নিয়ে মিছে কথা ব'লো না। তাহলে একদিন জুতোর কালি মাখিয়ে ও চুলগুলো সব কালো ক'রে দেবো……

—চুল কালো হ'লে মিছে কথা বল্‌তে পারবো তো?

—কেন পারবেন না? কালো মাথায় মিছে কথা বল্‌লে কোনো দোষ হয় না। কি বলিস্‌ লীলা?

রায়মশাই হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞাসা করলেন—যাদের মাথা অর্দ্ধেক পাকা, অর্দ্ধেক কাঁচা—তারা কি করবে?

লীলা বল্‌লো—হয়—পাবলিক মিটিংএ বক্তৃতা করবে—আর না হয়—ঘরে ব'সে নাটক-নভেল লিখ্‌বে…

রায়মশাই হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন! ঠিক বলেছ দিদিমণি! সত্যির সঙ্গে মিথ্যে ভেজাল দিয়ে একটা-কিছু গড়ে-পিটে তুল্‌তে পারেন যাঁরা বক্তা বা লেখক! কথাটা খুব সত্যি…

রায়মশাইয়ের কুটির-প্রাঙ্গনের এককোণে ছিল—একটি বড় বকুল গাছ। তার ডালে ডালে বাঁধ বেঁধে, আর খুব পুরু তক্তা বিছিয়ে—গাছের উপর তৈরি করা হয়েছিল একটি প্রশস্ত আসন। তাকে জব্দ রাখা হয়েছিল বেশ মজবুত কাঠের রেলিং দিয়ে ঘিরে। গাছের রংয়ে রং মিশিয়ে, কৌশলী-মিস্ত্রী তাকে এমন ভাবে ডাল-পালার ভিতর লুকিয়ে তৈরি করেছিল যে, রায়মশাই যখন সেখানে উঠে ব'সে থাক্‌তেন, কেউ হঠাৎ তাঁকে দেখ্‌তে পেত না।

সেই 'বকুলাসনে' ব'সে রায়মশাই কিন্তু দেখ্‌তে পেতেন সমস্ত বিদ্যার্থী-ভবনটিকে এক নজরে। কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, কে কোন্ দিকে যাচ্ছে বা আস্‌ছে, কার সঙ্গে কে কথা বলছে—এ সব কিছুই তাঁর চোখ এড়াতো না। রায়মশাইয়ের বকুলাসনের উদ্দেশ্য ও কার্য্য সবাই জান্‌তো। তিনি সেখানে থাকুন বা না-থাকুন, ন্যায় বা অন্যায় যে-কোনো কাজ যে করতো, সেই ভাব্‌তো—'রায়মশাই দেখ্‌ছেন!' ভগবানের অদৃশ্য-দৃষ্টির মত— তিনিও ছিলেন 'সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্'! রাত্রেও সেই বকুলডালের ভিতর থেকে খুব দূর-পাল্লা টর্চের আলো গিয়ে পড়তো যেখানে সেখানে।

সাধারণভাবে রায়মশাই একাই গিয়ে বস্‌তেন বকুলাসনে। তবে

কখনও যদি কারো সঙ্গে কোনো গোপন পরামর্শের দরকার হতো—তাকেও সঙ্গে নিতেন।

জ্যৈষ্ঠ-মাসের অপরাহ্ন বেলা। সূর্য্যদেব রাঙা হয়ে পশ্চিম আকাশে ঢ'লে পড়েছেন। সমস্ত বিদ্যার্থী-ভবন যেন চোখ-জুড়ানো বর্ণ-সুষমায় স্নিগ্ধ ও মধুর হয়ে উঠেছে। দূরে একটি ছেলেকে দেখে রায়মশাই ডাক্‌লেন—কানাই! শুনে যা···

কানাইকে নিয়ে তিনি উঠ্‌লেন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। বকুলাসনে ঢুকে খুব নীচু স্বরে তাকে বল্‌লেন—হ্যাঁরে কানাই, লিচু কি পেকেছে?

কানাই বল্‌লো—হুঁউ! ইয়া বড় বড় থোপে থোপে সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে ঝুল্‌ছে···

—চুরি ক'রে এক থোপ্ আন্‌তে পারিস্? দুজনে মিলে এখানে ব'সে খাবো, কেউ জান্‌তেও পারবে না!

কানাই একটু চিন্তিতভাবে মাথা চুল্‌কে বল্‌লো—মালী যদি জেনে ফেলে? যে খিঁটখিটে মাষ্টার! মেরে ভূত ভাগিয়ে দেবে···

রায়মশাই বল্‌লেন···তাইতো কানাই, বড্ড লোভ হচ্চে। আচ্ছা এই পয়সা চারগণ্ডা নিয়ে যা। ধরাই যদি পড়িস্—গুঁজে দিবি মালীর হাতে। তা'হলে সে হারামজাদা আর কাউকে কিছু বলবে না।

—আচ্ছা·· বলেই কানাই ছুটে চলে গেল পয়সা নিয়ে।

খুব সাবধানে একরাশ গাছপাকা লিচু কাপড়ে ঢেকে কানাই যখন ফিরে এলো—তখন সাঁঝের আঁধার নেবে এসেছে। রায়মশাই আহ্নিকে বসেছেন—কুটিরের বারান্দায়। লীলা ও কলি চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে গরম জলের অপেক্ষা করছে। পাশেই একখানি একচালা রান্নাঘরে জল গরম করছিল মাধুরী।

বারান্দায় অন্ধকারে আহ্নিকরত রায়মশাইয়ের কানের কাছে এগিয়ে গিয়ে খুব নীচু স্বরে কানাই বল্‌লো—এনেছি···

কানাইয়ের গলাটা জড়িয়ে ধ'রে কানের কাছে মুখ নিয়ে রায়মশাই বল্‌লেন—ঘরের ভিতরে নিয়ে যা, আমি আস্‌ছি···

একটু ইতস্ততভাবে কানাই বল্‌লো—ঘরের ভিতরে যে দিদিমণিরা রয়েছেন ?

—ওদের কিছু ভাগ দিলেই হবে। কোনো ভয় নেই···ভিতরে যা··· আমি এখুনি আস্‌ছি···

আহ্নিক সেরে রায়মশাই একটি লোক পাঠিয়ে দিলেন মালীকে ডাকৃতে। তারপর ঘরে ঢুকে বল্‌লেন—আয় কানাই! সবাই মিলে ব'সে লিচু খাওয়া যাক্‌······তোমরাও এসো লীলা !

ঘরের মেঝেয় একটা মাদুর বিছানো হ'লো। কানাই লিচুগুলো ঢেলে দিল তার উপর। ছুটো প্লেট এনে—লীলা ও কলি লিচু ছাড়াতে বস্‌লো। গরম জলের কেৎলীতে চা ছেড়ে দিয়ে—মাধুরীও এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

ছাড়ানো-লিচু খেতে খেতে রায়মশাই বল্‌লেন—তারপর কানাই চন্দর ! পয়সা চারগণ্ডা কি মালীকে দিতেই হলো ?

কানাই বল্‌লো—হ্যাঁ—আমি যখন চুপিচুপি গাছে উঠি—শালা মালী তখন কিচ্ছু জান্‌তে পারেনি। তারপর লিচু নিয়ে নাব্‌বার সময় হাতেনাতে ধরে ফেল্‌লো···

লীলা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলো—কানাই কি এগুলো চুরি করে এনেছে ?

রায়মশাই চোখমুখ ঘুরিয়ে, মাথা ঝেঁকে বল্‌লেন—শুধু কি চুরি করে? ধরা পড়ে—পাহারোলাকে ঘুষ্ দিয়ে—তবে এনেছে···

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ গো···কানাই খুব কেরামৎ চোর! এবার পারিতোষিক বিতরণ-সভায় ওকে একটা মেডেল দেব আমি। তুমি দু'টো বেশী ক'রে খাও কানাই···

কানাই বুঝ্‌লো রায়মশাই তাকে বিদ্রূপ করছেন। তাই একটু ক্ষুন্ন মনে অভিমানের সুরে বল্‌লো—আপনিই তো শিখিয়ে দিলেন···

রায়মশাই হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—চুরি-বিদ্যেটা তো তোমার খুব ভালই জানা ছিল কানাই? সত্যি বলো তো, আজ আমি তোমাকে কি শিখিয়ে দিলাম? ধরা-পড়লে কি উপায়ে বেঁচে আস্‌তে হয়—মাত্তর সেইটুকু! তাই নয় কি? চারগণ্ডা পয়সা ব্যয় করে—আজ তোমাকে দিলাম—একটু 'হায়ার-এডুকেশন'!

লীলা, মাধুরী ও কলি অবাক্ হয়ে—রায়মশায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। এমন সময় সেখানে এসে হাজির হ'লো বেচারা মালী। রায়মশাই, কানাই ও লিচু এক-আসনে সমাবেশ হয়েছে দেখেই তার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল। লিচু খেতে খেতে তার মুখের দিকে চেয়ে—রায়মশাই খুব হাস্‌তে লাগ্‌লেন। সে-হাসি সহ্য করতে না পেরে করজোড়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বেচারা হঠাৎ কেঁদে পড়লো—হুজুর! আমাকে রক্ষে করুন···

—হুঁ, তুই মাইনে পাস্ কতো? গালে একটা লিচু ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন রায়মশাই।

—আজ্ঞে, বারো টাকা···

—পোষাচ্ছে না—না? আচ্ছা, কাল থেকে তোর মাইনে হলো পনেরোটাকা আর কাঁদিস্‌নে—যা এখন। খবরদার—কিন্তু! এমন কাজ আর কখ্‌খনো করিস্‌নে…

মালীটা সজোরে নিজের কান দুটো মলতে মলতে বললো—আবার? এই যে হুজুর—সে পয়সা চারগণ্ডা…

রায়মশাই হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—লোভে পড়ে, হঠাৎ কিছু উপরি-আয় যদি করেই ফেলেছিস্—কেন আর ফিরিয়ে দিচ্ছিস্?

হাত কচ্‌লে মালী বল্‌লো—না না ও কথা আর বলবেন না দেবতা! আপনি আমার তিনটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন। তবু যদি, ও চোরাই পয়সা আমার ঘরে থাকে—নিশ্চয়ই ছেলেটা মরে যাবে ওলাউঠো হয়ে! সে যেন ভয়ে শিউরে উঠে—পয়সাগুলো ফেলে দিল। তারপর টিপ্‌ করে একটা প্রণাম রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কানাই লিচু খাওয়া ভুলে—আড়ষ্ট ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওলাউঠোর কথা শুনে তারও চোখমুখ যেন আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে উঠলো!

রায়মশাই সস্নেহে বল্‌লেন—শোন্ কানাই! তুই যে লিচু-চুরি করতে গিয়েছিলি, একথা আমরা কাকেও বল্‌বো না। কিন্তু আমার একটী কথা সব সময় মনে রাখিস্। যদি কখনো চুরি করার ইচ্ছে মনের ভিতর উঁকি দেয়—তখুনি ছুটে আস্‌বি আমার কাছে, আমি তোকে বাঁচবার পথ বাৎলে দেবো। চুরি করা খুব সোজা! কিন্তু চোর-অপবাদে দাগী-আসামী না-হওয়াই খুব কঠিন। সে বিষয়ে হুঁসিয়ারীর অভাব হলেই ঠক্‌বি। বুঝ্‌লি আমার কথা?

ঘাড় কাৎ ক'রে কানাই বল্‌লো—হ্যাঁ, বুঝ্‌লাম…

হাতখানা ধ'রে একটু আদর ক'রে লীলা বল্‌লো—আর ক'টা লিচু খাও কানাই!

—না, না, ও চোরাই লিচু আর আমি খাব না···বলেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কানাই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

—কী আশ্চর্য্য লোক আপনি ঠাকুরদা! লীলা বল্‌লো।

হাস্‌তে হাস্‌তে রায়মশাই বল্‌লেন—আমি যেমন বদ্‌মাইস ছিলাম—তেমনি সাধু হ'য়ে পড়েছি। কোনো চোর যদি দারোগগিরি চাকরী পায়—তাহলে সে বড় ভয়ানক দারোগা হ'য়ে ওঠে!

স্বাবলম্বী বিদ্যার্থী-ভবনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বিল্ববাবু—একজন উৎসাহী যুবক-কর্ম্মী। আয়ব্যয়ের হিসাব, চিঠিপত্র-আদান-প্রদান প্রভৃতি কাজের ভার ছিল তাঁর উপর। তাঁর দপ্তর ছিল তেঁতুল-দীঘির দক্ষিণে। বকুল-দিঘির উত্তর-পূব-কোণে রায়মশাইয়ের নিজস্ব আশ্রম বাড়ি। মেয়েরা সবাই রায়মশাইয়ের কাছে সেখানেই থাকে। সম্পাদক বিল্ববাবুকে ডেকে না পাঠালে পূর্ব্বে কখনো রায়মশাইয়ের সঙ্গে তিনি দেখাসাক্ষাৎ করতে আস্‌তেন না। কাজে অকাজে আজকাল খুব ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতে আরম্ভ করেছেন। তা'দেখে রায় মশাই একদিন হাস্‌তে হাস্‌তে লীলাকে বল্‌লেন—দেখ্‌ছো দিদিমণি! যুবককর্ম্মীদের পক্ষে তোমাদের মত সুন্দরী তরুণীরা কী উত্তেজক 'টনিক'! আমার সম্পাদক বিল্ববাবুর কর্ম্মপ্রেরণা বহুগুণ বেড়ে গেছে! লীলা লজ্জিতভাবে ঘাড়-নীচু করলো।

সকালে রায়মশাইয়ের কাছে ডাকের সমস্ত চিঠিপত্তর নিয়ে আস্‌তো একটি দারোয়ান। পূর্ব্বে প্রধান-শিক্ষকমশাই নিজেই এসে বিদ্যালয় সংক্রান্ত চিঠিপত্তর নিয়ে যেতেন—এখন তাঁকে পাঠিয়ে দিতে হয়।

আর, সম্পাদক বিশ্ববাবুকে পাঠিয়ে দিতে হতো—এখন তিনি নিজেই এসে নিয়ে যান্। ডাক এলে লীলা ছুটে আসে সকলের আগে। খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রিকাগুলি বেছে নিয়ে, একধারে চুপটি করে ব'সে থাকে।

আজকের কাগজে লীলা পড়লো—নিষিদ্ধ সভায় রাজদ্রোহপূর্ণ বক্তৃতা ক'রে কংগ্রেসকর্মী তরুণ ব্যানার্জ্জির কারাদণ্ড হয়েছে তিনবছর!

লীলার চোখ সজল হ'য়ে উঠ্‌লো। কোনো কথা না ব'লে, কাগজখানা রায়মশাইয়ের হাতে দিয়ে, সে উঠে গেল সেখান থেকে।

নিকটেই একটা ফুল-বাগানে ব'সে ছিল কলি। তার কাছে গিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধ'রে লীলা বল্‌লো—একটা গান গাওনা কলিদি! মনটা বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছে···

কলি গাইল—

মনের মানুষ শ্যামচাঁদে বল—
মনের কথা মন্‌টা খুলে!
শ্যাম-সোহাগী শ্যাম পানে চা'
লজ্জা ভুলে, ঘোম্‌টা তুলে।
ভয়-ভাবনা থাক্‌লে মনে—
প্রেম হবে না শ্যামের সনে,
ব্যথার কাঁটায়—ফুল ফুটে যায়—
শ্যামের রাঙা-চরণ ছুঁলে।

দূর থেকে রায়মশাই ডাক্‌লেন—লীলা! লীলা! ও দিদিমণি!
লীলা ব্যস্তভাবে ছুটে গেল।

একখানা চিঠি হাতে নিয়ে, অন্যমনস্কভাবে বকুল-তলায় দাঁড়িয়ে-ছিলেন রায়মশাই। লীলা জিজ্ঞাসা করলো—আমাকে ডাকলেন?

—হ্যাঁ, অরুণ চিঠি লিখেছে—কাল সে এখানে আসছে। আজকের কাগজে দেখেছ বোধ হয়—তরুণের জেল হয়েছে—তিনবছর?

—হ্যাঁ, দেখেছি। লীলা বল্‌লো। কিন্তু, অরুণবাবু কেন আস্‌ছেন এখানে?

রায়মশাই বল্‌লেন—তরুণের কেস্‌-কনডাক্‌ট্‌ করবার জন্যে, অরুণ এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছিল। ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু তরুণ বৃটীশ-আদালতের বিচার-ক্ষমতাকে অস্বীকার ক'রে—বিচারকের প্রতি অসম্মান দেখিয়েছে। ফলে, জেলের মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে।

লীলা বল্‌লো—কিন্তু, অরুণবাবু এখানে কেন আস্‌ছেন—সে কথা কি কিছুই লেখেন নি?

—হ্যাঁ, তাও লিখেছে। যখন জেলে যায়—তখন নাকি তরুণ হঠাৎ অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিল। জলভরা চোখে অরুণকে বলেছিল—লীলা কেমন আছে—কি করছে—সবিশেষ জেনে—এলাহাবাদে ফিরবার পথে তাকে যেন একটু জানিয়ে যায়। পড়েই দেখনা…… হাতবাড়িয়ে রায়মশাই চিঠিখানা লীলার দিকে এগিয়ে ধরলেন।

চিঠি পড়বার কোনো আগ্রহ না-দেখিয়ে লীলা বল্‌লো—সবই তো শুন্‌লাম আপনার মুখে। আর কি দরকার? বলেই সে চোখের জল আড়াল করে—ফুল-বাগানের দিকে চলে গেল।

উঃ জগদীশ! রায়মশাই নিজের কপালে একটা করাঘাত করলেন। আজ দু'মাসের বেশী, লীলা মাধুরী ও কলি এসেছে এখানে

অবকাশ মত মাঝে মাঝে তারা নিকটবর্ত্তী পল্লীগুলিতে বেড়াতে যায়। অতি অল্পদিনের মধ্যেই কোনো-কোনো বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে মা-মাসী-সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে—আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতাও জমিয়ে তুলেছে খুব।

লীলা যেন সকলের নয়নের মণি! তার অভিমানশূণ্য ও অন্তরঙ্গতাপূর্ণ অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হয়ে পড়েছে। দূর থেকে লীলাকে দেখ্‌লে—'ওই যে লীলা আস্‌ছে!' ব'লে সবাই আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। তার নিখুঁৎ অঙ্গসৌষ্ঠব ও অসামান্য রূপ-লাবণ্যের প্রশংসাও ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। পল্লীর নিরক্ষর ঝি-বৌরা এই কলেজে-পড়া ইংরাজি-জানা অতি মার্জ্জিতরুচি মেয়েটাকে মনে করে—জগতের নবম আশ্চর্য্য!

ক'লকাতা হ'তে আস্‌বার সময়—রায়মশাইয়ের পরামর্শে লীলা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল—কয়েকখানি হোমিওপ্যাথী বই ও এক বাক্‌সো ওষুধ। সকাল আট্‌টা থেকে ন'টা পর্য্যন্ত—মাত্র একঘন্টার জন্যে রায় মশাইয়ের কুটিরের বারান্দায় সে বাক্সটা নিয়ে বসে। বিদ্যার্থী-ভবনের ছেলেমেয়েরা আসে ওষুধ খেতে। অসুখ—খুব সাধারণ ভাবের মাথা-ধরা, পেটব্যথা, সর্দ্দিকাশি প্রভৃতি। কারো কোনো কঠিন অসুখ হ'লে তু'মাইল দূরবর্ত্তী বন্দরের এম, বি, ডাক্তারকে কল্‌ দেওয়া হয়।

পার্শ্ববর্ত্তী গরীব-দুঃখীরাও লীলার কাছে আস্‌তে আরম্ভ করেছে—এককোঁটা ওষুধের জন্যে। তার একটি কারণ বোধহয়—লীলার কোনো টাকা-পয়সার দাবী-দাওয়া নেই। আর একটি কারণ—তার সহৃদয় মধুর ব্যবহার—যা' অর্থগ্রাহী ব্যবসাদার-চিকিৎসকদের কাছে কেউ পায় না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে লীলার চিকিৎসার সুনাম চারিদিকে

খুব ছড়িয়ে পড়লো। যদিও, সে ঘরের বারান্দায় ব'সেই ওষুধ দিয়ে থাকে। লেডি ডাক্তার সেজে কোনো রোগীর বাড়িতে যায় না কখনো।

আজ একটি মেয়ে এসে কাতর ভাবে বল্‌লো—মাসী! আমার ভাইটির কলেরা হয়েছে। মাথার দিব্যি দিয়ে মা বলেছে—তুমি একটিবার দেখে এসো—এক ফোঁটা ওষুধ দিয়ে এসো…

অসুস্থ ছেলেটি বিদ্যার্থী ভবনের ছাত্র। বাইরে থেকে বিদ্যালয়ে আসে যায়। লীলাকে চেনে। কিন্তু লীলা কি করবে? সে তো একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার নয়?

রায়মশাই বল্‌লেন—না, না, তা' হ'তে পারে না। হোমিওপ্যাথী খুব ভাল চিকিৎসা হলেও, তোমার তো কোনো চাপরাশ নেই লীলা! একটা জীবনের দায়িত্ব কখ্‌খনো নিতে পার না তুমি। ওদের বলে দাও—ভালো ডাক্তার নিয়ে আসুক…

মেয়েটি দুঃখিত ভাবে চ'লে গেল। আবার ঘণ্টাখানেক বাদেই ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লো—মাসী! তোমার পায়ে পড়ি, একটিবার চলো। ভাইটি আমার কাঁদছে আর বল্‌ছে—'মাসী যদি একবার এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়াতো, আর তার টুকটুকে রাঙা পা দু'খানা আমার মাথায় ছোঁয়াতো, তাহলে আমি নিশ্চয়ই সেরে উঠ্‌তাম। কোনো ওষুধ-খাবার দরকার হতো না আমার…

লীলার পাশেই রায়মশাই দাঁড়িয়েছিলেন। তার কোটরগত চোখ দু'টি জলে ভরে উঠ্‌লো! আত্মহারাভাবে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন তিনি—দিদিমণি! আমার এই বিদ্যার্থী-ভবনের সব ছেলেমেয়েগুলিকে তুমি এমন করে পোষ মানালে—কিন্তু পেরে উঠ্‌লে না সেই বুনো তরুণটাকে

এখানে টেনে আনতে। কী বিশ্রী স্বাস্থ্য তার! তিনবছর জেল খাটলে সে কি আর বাঁচবে?

ইলেকট্রিক শক্-লাগা মানুষের মত, লীলা যেন কেঁপে উঠলো! তারপর ভিতরটাকে লোহার মত শক্ত ও কঠিন ক'রে তুলে—মনে মনে বল্‌লো—নিশ্চয়ই বাঁচবে! বাঁচার দাবী এই দেহের চেয়েও মনের তো কিছু কম নয়? লীলাকে যে সত্যিই ভালবাসে—লীলার জন্যে যার চোখের কন্ন এখনো শুকিয়ে যায় নি—লীলা না-মরলে—সে কখনো মরতে পারে না।

ঠিক এই সময়ে একটি মুটে এসে দাঁড়ালো সেখানে। তার মাথায় একটা স্যুটকেস্ ও বেডিং। পিছনে সাহেবী পোষাকে অরুণ।

রায়মশাইকে একটা প্রণাম ক'রে—লীলার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে অরুণ জিজ্ঞাসা করলো—ভাল আছ লীলা?

লীলা খুব সহজভাবে জবাব দিল—হ্যাঁ, আপনি ভাল আছেন? নমস্কার···

মিলিটারী ঢংয়ে বুকটা ফুলিয়ে, একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অরুণ বল্‌লো—আমি তো কখনো মন্দ থাকি না লীলা! শরীরে আমার জোয়ার-ভাঁটা নেই। ইস্পাতের মতো শক্ত এই হাঁড়গুলো মট্‌কাবে তবু নোয়াবে না—বলেই সে তার কোট-খোলা দেহটাকে মুচ্‌ড়ে মাসেল-গুলোকে একবার খেলিয়ে নিল।

'অসহ্য'—মুখ ফিরিয়ে, ভ্রূকুটি করে অস্ফুটস্বরে বল্‌লো লীলা। সে অভিব্যক্তি রায়মশাই না দেখলেও, অরুণ দেখ্‌লো।

রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—তরুণ কেমন আছে অরুণ?

—শরীরে তার কি আছে যে ভাল থাকবে? অরুণ বল্‌তে লাগ্‌লো।

পাঁজ্‌রার হাড়গুলো তো সব গোনা যায়। কতদিন বলেছি—একটু 'একসারসাইজ্‌' কর—শরীরটা বেঁধে উঠুক। তা' সে কিছুতেই করবে না। সে বলে—স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ-পতাকা বহনের শক্তিটুকু দেহে থাক্‌লেই—সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে। শুধু মানসিক উত্তেজনা নিয়েই সে 'কাবার-ব্রাণ্ড্‌' কর্ম্মী হবে—আত্মঘাতী 'সহিদ' হবে!

তীব্রদৃষ্টিতে অরুণের মুখের দিকে চেয়ে লীলা বল্‌লো—মহিষের শারীরিক অহঙ্কার তো পরের বোঝা টান্‌বার জন্যে, আর গাড়োয়ানের লাথি খাবার জন্যে। শক্তি থাক্‌তেও তার মত দুর্ব্বল কে?

হাস্‌তে হাস্‌তে অরুণ বল্‌লো—তবু মহিষকে লোকে ভয় করে। সে ক্ষেপ্‌লে একটা ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, এ আশঙ্কাটা গাড়োয়ানের মনেও মাঝে মাঝে উঁকি দেয়।

একটু থেমে, পকেট থেকে একখানা সুঘ্রাণ রুমাল বের ক'রে, নিজের ঘর্ম্মাক্ত মুখখানা ভাল করে মুছে—সে আবার বল্‌তে লাগ্‌লো—শোনো লীলা! যার স্বাস্থ্য নেই, তার সুখ নেই। যে-ক'দিন বাঁচ্‌তে হবে—প্রাণ খুলে হাস্‌তে হবে। এই হচ্ছে আমার মত। মাথাটাকে সুস্থ রাখ্‌বার জন্যে চব্বিশঘন্টাই যাকে 'স্মেলিংসল্ট' হাতড়াতে হয়, নিশ্চয়ই সে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন, অর্থাৎ আত্মদ্রোহী! রাজদ্রোহ-প্রচারের কোনো অধিকার কি তার আছে? তরুণ জেলে যাচ্ছে শুনে, এলাহাবাদ থেকে ছুটে এসেছি। হাজার খানেক টাকাও ব্যয় করেছি। কেন জানো? কাল একটা মেয়ের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে—আজ এ ভাবে আত্মঘাতী হবার অধিকার তার নিশ্চয়ই নেই। আছে কি? তুমিই বলো···

—নিশ্চয়ই আছে! লীলা বল্‌লো। তাঁর কোনো স্বাধীন ইচ্ছার পথে, আমি কেন বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াবো? আত্মসুখ-পরায়ণ আপনি।

তাকেও বোঝেন না—আমাকেও চেনেন না। আমরা দু'জনাই আপনার সমালোচনার অযোগ্য···বল্‌তে বল্‌তে আঁচল দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধ'রে লীলা চ'লে গেল সেখান থেকে।

একটা গাছতলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় ব'সে, লীলা বহুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌লো। তরুণ চোরও নয়, খুনী আসামীও নয়। একজন সত্যাগ্রহী সে! মুক্তি-সংগ্রামের অপরাজেয় যোদ্ধা সে! সাম্রাজ্যবাদীর বিচারে আজ একজন সামান্য জেলের কয়েদী হলেও—তার শত্রুও কি পারে তার মনুষ্যত্বের দাবীকে অস্বীকার করতে? কখ্‌খনো পারে না। তরুণের বন্ধু ওই অরুণ কি মানুষ? অমানুষের স্বাস্থ্য-সম্পদের এত গর্ব্ব কেন? অরুণ তার 'মাসেলে'র অহঙ্কার দেখাচ্ছে—অর্থ-সামর্থের পরিচয় দিচ্ছে—লীলার সিঁদুরের প্রতি সহানুভূতি জানাচ্ছে! লীলা মনে করে—এ যেন একটা বন্য মহিষের শিং-ঝাঁকানি! তার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য!

যে-ছেলেটির কলেরা হয়েছে, তার বোন এখনো লীলার পিছন ছাড়েনি। পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে আবার বল্‌লো—মাসী! যাবেনা একবার—আমার ভাইটিকে দেখ্‌তে?

লীলা এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিল তার কথা। হঠাৎ মনে পড়্‌লো—"ছেলেটি নাকি কাঁদছে আর বল্‌ছে—মাসী যদি একবার এসে·········" লীলা শিউরে উঠ্‌লো! ছেলেটি যদি মরে যায়? সে তো ওষুধ চায়নি—চেয়েছে লীলার রাঙা পায়ের একটু ধুলো।

শূণ্যদৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে লীলা ভাব্‌তে লাগ্‌লো—অরুণবাবু তো একজন মস্ত ডাক্তার—এম, বি। এলাহাবাদে গিয়েছিলেন—একটা মোটা মাইনের চাকরী নিয়ে। নিশ্চয়ই সেখানে

গিয়ে 'আউট্-প্রাকটিস্'ও জমে উঠেছে খুব। নতুবা বন্ধুর মোকদ্দমায় হাজার টাকা ব্যয় করতে পারতেন না। লীলা যদি তাঁকে অনুরোধ করে—কলেরায় আক্রান্ত ছেলেটিকে একবার দেখে আস্‌বার জন্যে, তাহলে কি অরুণবাবু ভিজিট্ দাবী করবেন? ছেলেটির বিধবা মা যে বড্ডই গরীব। তরুণবাবুর ভিজিট কত? আট, ষোল, বত্রিশ? লীলা ছুটে গেল নিজের কুটিরে। সুটকেস্ খুলে—বত্রিশটি টাকা বের করে গুঁজ্‌লো নিজের ব্লাউজের ভিতর।

রায়মশাইয়ের কুটিরে অরুণের সাম্‌নে এক প্লেট্ খাবার ও চা দিয়ে মাধুরী তার গল্পের ব্লাডার ফাটাচ্ছিল। চা খেতে খেতে অরুণ ভাব্‌ছিল—মাধুরীর মত একটি 'অল-ওয়েভ্ রেডিও-সেট্' ঘরে থাক্‌লে—তাকেও স্মেলিংসলট্ ব্যবহার করতে হ'তো।

খুব ব্যস্তভাবে অরুণের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়ে লীলা বল্‌লো—অরুণবাবু! আপনি কি আজই ফির্‌বেন?

—হ্যাঁ, শুন্‌ছি নাকি আর ঘণ্টা-দুই বাদে একটা 'লঞ্চ' আস্‌বে—তা'তে চাপ্‌তে পারলে, বিকেলের ট্রেনটা ধরতে পারবো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লীলার মুখের দিকে চেয়ে অরুণ চায়ের কাপ্‌টা নিঃশেষ করলো। তারপর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লো—তুমি কি আমাকে এখুনি তাড়াতে চাও? এখানে আমার উপস্থিতি কি খুব বেশী অসহ্য বোধ হচ্ছে? লীলা……?

লীলা একটু লজ্জিতভাবে বল্‌লো—না, না, আমি আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছিলাম…

—অনুরোধ? বলো, বলো, কি অনুরোধ? অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলো অরুণ।

লীলা বল্লো—ওই জান্‌লা দিয়ে দেখুন মাঠের ওপারে ওই যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে—ওর নাম তার্কিক-পাড়া। ওখানকার ছেলে-বুড়ো সবাই দিনরাত বারান্দায় বসে তর্ক করে—কোনো কাজ করে না।

বিস্মিতভাবে অরুণ জিজ্ঞাসা করলো—তাদের চলে কি করে ?

লীলা বল্লো—তারা দাঁড়িয়েছে—চলাচলের বাইরে গিয়ে। তাদের মতে সবই বিধি-নির্ব্বন্ধ! অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ করে, আর—খুব কঠিন অসুখ হলেও—'রাখে কেষ্ট, মারে কে' ব'লে অতি নিশ্চিন্ত মনে বারান্দায় ব'সে থাকতে পারে।

অরুণ বল্লো—বুঝ্‌লাম। তাদের অবস্থা ঠিক অরুণের মতই। আমাদের বুদ্ধি ও বিবেচনার অতীত। কিন্তু আমাকে কি অনুরোধ করতে চাও—তা'তো বল্‌লে না ?

—বলছি শুনুন—লীলা বল্‌তে লাগ্‌লো—ওই তার্কিকপাড়ায় আমার এক বিধবা বোন্ আছে। তার একটি মাত্তর ছেলের হয়েছে কলেরা। ছেলেটি বল্‌ছে—আমার পায়ের একটু ধুলো মাথায় দিলেই সে নাকি সেরে উঠ্‌বে। আমার পায়ের ধুলোর এ মাহাত্ম্য আমি স্বীকার করতে পারছিনে। দয়া করে, আপনি যদি আমার সঙ্গে একবারটি যান্ ওখানে —ছেলেটিকে দেখে আসেন···

—মোষ্ট্ গ্লাড্‌লি ! বলেই অরুণ উঠে দাঁড়ালো। চলো লীলা। কলেরা রোগী ! অতি অল্প সময়ের মধ্যে খারাপ হয়ে পড়তে পারে···

উৎকণ্ঠিতভাবে মাধুরী জিজ্ঞাসা করলো—কার কলেরা হয়েছে লীলাদি ? মণির ?

—হ্যাঁ···

মাধুরীর চোখদুটো সজল হলে উঠলো—আহাহা—মণির মা বড্ড ভাল মেয়ে। মণির কিছু হ'লে বেচারা পাগল হয়ে যাবে। আপনি একটু দেখে আসুন অরুণ বাবু...

সুটকেসটা খুলে একটা ওষুধের ব্যাগ হাতে নিয়ে, অরুণ রওনা হলো। লীলাও চললো তার সঙ্গে।

খুব ছোটো একখণ্ড ফাঁকা মাঠ। মাঠের ভিতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা সরু পথ। রওনা হবার সময় লীলা তার হাতঘড়িটা দেখলো—বেলা প্রায় দশটা বাজে। মেঠো রোদের উত্তাপ খুব বেড়ে উঠেছে। লীলা ভাবলো—তা' হোক্—মাঠ-পেরুতে দশ মিনিটের বেশী লাগবে না তো?

মাঠের ওপারে একটা গাছতলায় গিয়ে তারা দুজনেই দাঁড়ালো। অরুণের মাথায় ছিল টুপী। হঠাৎ লীলার মুখের দিকে চেয়ে সে চমকে উঠলো। সুন্দরী লীলার গালদুটি রাঙা হয়ে উঠেছে—যেন পাকা টোম্যাটো! আইভরি-কাগজের মত চক্‌চকে সাদা কপাল বেয়ে ঘর্ম নেবেছে। গায়ের জামা-কাপড় এমনভাবে ঘামে ভিজে গেছে যে—দেখলেই মনে হয়—কোনো পুকুর থেকে স্নান করে উঠে এলো সে।

অরুণ বললো—ওঃ, তুমি কী ভয়ানক ঘেমে গেছ লীলা!

নিজের জামা-কাপড়ের অবস্থা লক্ষ্য করে লীলা খুব লজ্জিত হয়ে পড়লো।

অরুণ একটু হেসে বললো—উত্তাপে খুব বেশী ঘেমে-ওঠা—রক্ত-প্রাচুর্য্যের লক্ষণ! কী চমৎকার স্বাস্থ্যবতী তুমি...

অরুণের মুখে কোনো স্বাস্থ্য-সমালোচনা শুনলেই লীলার মাথা গরম হ'য়ে ওঠে। একটা রুমাল দিয়ে চোখমুখ আর ঘাড়-গলা মুছতে মুছতে

সে বলে উঠ্‌লো—চলুন, চলুন, একটু পা চালিয়ে—ওদিকে কলেরা কেস্‌ ...বলেই সে অরুণকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

রোগীকে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করবার পর—অরুণ একটা ইন্‌জেকসান্‌ দিল। তারপর দু'দাগ ওষুধ দিয়ে বল্‌লো—কেমন থাকে —সন্ধ্যে নাগাত জানাবেন।

বাড়ির বাইরে এসে—বুকের ভিতর থেকে টাকাগুলো বের ক'রে—লীলা বল্‌লো—এই নিন্‌ আপনার ভিজিট্‌...

—তুমি দিচ্ছ?

—আমি দিচ্ছি মানে? পেসেন্ট দিচ্ছে!

—নোট্‌গুলো ঘামে ভিজে গেছে। এতক্ষণ যে ওরা তোমার বুকের ভিতরেই ছিল—তা' বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু লীলা! এখানে এসেছি আমি—তোমার বোন্‌পোকে চিকিৎসা করতে—তোমার অনুরোধে। ভিজিটের লোভে তো নয়? অবশ্য, ডাক্তারি আমার ব্যবসা, আর অর্থোপার্জ্জন-বিষয়েও আমি খুব হুসিয়ার। সে কথা স্বীকার করছি। কিন্তু, ডাক্তার মানেই চামার নয়। একথাটা তোমার বোঝা উচিত...

লীলা আর-কোনো কথা না বলে, টাকাগুলি নিজের কাছে রেখে দিল।

আশ্রমে ফিরে অরুণ রায়মশাইকে খুঁজ্‌লো। শুন্‌লো, তিনি বকুলাসনে। বকুলাসনের ব্যাপারটা তার জানা ছিল না। চুপি চুপি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখ্‌লো—রায়মশাই একখানা গীতা খুলে নিয়ে চুপটি করে বসে আছেন।

অরুণ ডাক্‌লো—দাদু!

রায়মশাই গীতার ভিতর ডুবে ছিলেন। হঠাৎ দাদু-ডাক শুনে চমকে উঠলেন—কে? অরুণ? এসো, এসো……মণিকে কেমন দেখ্‌লে? বাঁচ্‌বে তো?

অরুণ বল্‌লো—সে কথা এখন বল্‌তে পারবো না। রাতটা কি রকম থাকে, দেখে, কাল বল্‌বো…

—আজ আর তুমি এলাহাবাদ রওনা হচ্ছোনা তা' হলে? বিস্মিত-ভাবে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

—না।

—তখন যে বল্‌ছিলে, আজ না গেলে চাকরী থাকবে না?

—হ্যাঁ, এলাহাবাদের চাকরীটা বোধহয় খতম্ করেই দিলাম… যাক্‌গে…চাকরী আর করবো না ভাব্‌ছি…

তীক্ষ্ণভাবে বহুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে, রায়মশাই কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

সন্ধ্যার পর একটা লোক এসে খবর দিল—মণির অবস্থা খুব খারাপ হ'য়ে পড়েছে…

রোগীর অবস্থা সবিশেষ শুনে—অরুণ বল্‌লো—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। এখুনি 'স্যালাইন' দিতে হবে…লীলা! তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

—আমাকে সঙ্গে-নেওয়া কি খুব দরকার মনে করেন?

—বাঃ, একজন-কেউ 'অ্যাসিষ্ট' না করলে—একলা আমি স্যালাইন দেব কি করে?

—চলুন তা' হলে যাচ্ছি…খুব সহজ ভাবে লীলা বল্‌লো। চট্ করে আপনি তৈরি হয়ে আসুন…আর দেরি করবেন না…

অরুণ চলে গেল। মাধুরী অবাক্ হয়ে হাঁ-করে চেয়ে থাক্‌লো

লীলার মুখের দিকে। তারপর ঢোক্ গিলে, চোখ ছুটো বড় ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লো—এই রাত্রিকালে! ওই মাঠের পথে! অরুণবাবুর সঙ্গে! একলা তুমি…

ধমক দিয়ে লীলা বল্‌লো—থাম্! অরুণবাবু কি? বাঘ না ভালুক? মানুষের মাংস তিনি নিশ্চয়ই খান্ না…

—খেতেও পারেন! বলা যায় না…পিছন থেকে রায়মশাই বলে উঠ্‌লেন। শোনো দিদিমণি! যেখানে-সেখানে রেস্তোরাঁতে ব'সে অজানা ও অচেনা মাংস খেয়ে খেয়ে, মানুষ যেভাবে ভয়ানক মাংসাশী হয়ে উঠ্‌ছে—তাতে আমার সন্দেহ হয়—আজকালকার 'অরুণ-বরুণ-যম-পবন'রা হয়তো একদিন মানুষের মাংসও পছন্দ ক'রে বস্‌তে পারে…

লীলা একটু বিরক্ত ভাবে বল্‌লো—তা'হলে কি অরুণবাবুর সঙ্গে যেতে, আমাকে নিষেধ করছেন আপনি?

দাঁতে জিভ্ কেটে রায়মশাই বল্‌লেন—কি যে বলো দিদিমণি! তুমি কি ওই মাধুরীর মত মেয়ে? মাধুরী একটু চম্‌কে উঠ্‌লো। রায়-মশাই সে দিকে লক্ষ্য না-করে বল্‌তে লাগ্‌লেন—সাতদিন, সাতরাত্তির অরুণের সঙ্গে নির্জ্জন—পাহাড়ে, পর্ব্বতে, ঘুরে বেড়ালেও—তোমার আত্মসম্মানের দাবীটুকু হারাতে পারোনা তুমি—এ বিশ্বাস আমার আছে। আসল কথা কি জানো দিদিমণি! শিক্ষা-দীক্ষার ফলেই ছেলেমেয়েদের ভিতর বিভিন্ন জাত গ'ড়ে ওঠে। কে-যে কোন জাতের মেয়ে, আর কে যে কোন জাতের ছেলে, তা' তাদের দিকে—চাইলেই আমরা এখন বুঝ্‌তে পারি—কারণ আমরা বহুদর্শী!

লীলা একটু অধৈর্য্য ভাবে বল্‌লো—সে কথা তো অস্বীকার করছি

না—ঠাকুরদা! সোজাসুজি বলুন—আমি যাবো কি—না—অরুণ-বাবুর সঙ্গে?

—নিশ্চয়ই যাবে! রায়মশাই বল্‌তে লাগ্‌লেন। তবে, আমার কথা হচ্ছে—'অরুণ-বরুণ-যম-পবন'দের ষোল-আনা বিশ্বাস কর়ো না। মানুষের মাংস তাদের পক্ষে অরুচিকর নাও হ'তে পারে! এইটুকু ছাড়া আমার আর কোনো বক্তব্য নেই···

লীলা চুপ্‌ করে দাঁড়িয়ে রইলো—এমন সময় 'স্যালাইন—অ্যাপারেটাস্' সঙ্গে নিয়ে অরুণ এসে বল্‌লো—চলো লীলা!

কোনো ইতস্তত না ক'রে লীলাও বল্‌লো—চলুন···

হাতে টর্চ নিয়ে দু'জনাই বেরিয়ে পড়লো—মাঠের পথে।

গরমের দিন। অন্ধকার রাত। রোদের তাপে জ্বালিয়ে-দেওয়া মাঠের বুকে—কে যেন ছোট্টো একখানি হাতপাখা দিয়ে হাওয়া দিচ্ছিল। বাতাস খুব মৃদু হলেও স্নিগ্ধ ও মধুর। জঙ্গলের জানোয়াররাও হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়েছে। লোকালয়ের কুকুরগুলো ভয়ানক আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। তাদের অবিশ্রান্ত ঘেউ-ঘেউ আর মাঠে-বেরিয়ে পড়া শেয়ালগুলোর হুক্কাহুয়া—নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। দূরে দূরে বিলাঞ্চলে, আলেয়ার আলোগুলি দপ্‌ করে জ্বলে উঠেই আবার নিভে যাচ্ছে।

তার্কিকপাড়ার পথটা লীলার বেশী পরিচিত বলেই, সে আগে চলেছে। সাপের ভয়ে সর্ব্বদাই টর্চ্চ ফেল্‌ছে পথের পরে। হঠাৎ একটা সাপ দেখে লীলা থমকে দাঁড়াল। সাপটা ফণা তুলে উচু হ'য়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু যখন দেখ্‌লো আগন্তুকরা আক্রমণকারী নয়—তখন ধীরে ধীরে মাথাটা নীচু করলো।

অরুণ চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—ওরে বাপ্‌রে! কত বড় সাপ! স'রে এসো লীলা, সরে এসো···বলেই সে লীলার বাঁ হাতখানা ধরে টান্‌তে লাগ্‌লো···

—আঃ, হাত ছাড়ুন···ঝাঁকি দিয়ে হাতখানা ছাড়িয়ে নিল সে।

—সাপের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে?

উত্তেজিত ভাবে লীলা বল্‌লো—কেন থাক্‌বো না? আমি তো ওর শত্রু নই? আমার সঙ্গে ও কেন শত্রুতা করবে? ওই দেখুন মাথা নীচু করে চ'লে যাচ্ছে···



—কি ভয়ানক দুঃসাহসী তুমি!

—সে পরিচয় তো আগেই দিয়েছি—আপনার সঙ্গে এই রাত্রিকালে মাঠে বেরিয়ে এসে···

—আমাকে কি তুমি সাপের মতই ভয়ানক মনে করো?

লীলা হেসে উঠ্‌লো। তারপর অরুণের দিকে মুখটা ফিরিয়ে বল্‌লো—আমার কাছে ভয়ানক, ও সাপটাও নয়—আপনিও নন্‌··· চলুন···চলুন···

ও-বেলায় লীলা ও অরুণ যখন মণিকে দেখ্‌তে এসেছিল···তখন তার্কিকপাড়ার বারান্দায় বারান্দায় ভয়ানক তর্ক বেধে গিয়েছিল—অরুণ লীলার কে? একদল বলেছিল 'স্বামী' আর একদল বলেছিল 'ভাই'।

আজ রাত্রিকালে লীলা ও অরুণ এসে যখন হাজির হলো—তখন 'ভাইয়ের দল' পরাজয় স্বীকার করলেন। অরুণ যে লীলার 'স্বামী' এ বিষয়ে আর কারো কোনো সন্দেহ থাক্‌লো না। সারা রাত্রি জেগে অরুণ করলো মণির চিকিৎসা, আর লীলা করলো সেবা ও শুশ্রূষা। মণি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো। সকালে তারা যখন বিদায় নিয়ে চলে

আস্‌ছিল—তখন মণির মা লীলাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগ্‌লেন —সত্যিই লীলা! আর জন্মে তুই আমার মায়ের পেটের বোন্ ছিলি···

মণির ঠাকুরদাদা জীবিত ছিলেন। তিনি অতিবৃদ্ধ ও রুগ্ন। তা'তে আবার অতি অল্পদিন হলো পুত্র-শোক পেয়েছেন। মণির কলেরা হয়েছে শুনে, পৌত্র-শোকের জন্যেও প্রস্তুত হ'য়ে হতাশভাবে বারান্দায় ব'সে ছিলেন।

আজ সকালে মণি সুস্থ হ'য়ে কথা বল্‌ছে—শুনে, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উচ্ছ্বসিতভাবে অরুণের হাত দু'খানা ধ'রে বৃদ্ধ বল্‌তে লাগ্‌লেন—বাবাজী! তোমরা মর্ত্তের মানুষ নও, স্বর্গের দেবতা। গোলকের লক্ষ্মী আর নারায়ণ! আমার ওই লীলা-মার মত সহধর্ম্মিণী যাঁর—তাঁর মত ভাগ্যবান পুরুষ এ পৃথিবীতে নেই—একথা আমি উচুগলায় বল্‌তে পারি।

লীলা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। বৃদ্ধ বল্‌তে লাগ্‌লেন—আমরা যে কত গরীব তা' তোমরা জানো না। চিকিৎসার মূল্য তো দূরের কথা, এমন দুর্ভাগ্য আমরা যে, তোমাদের মত দু'টি মহাপ্রাণকে একটু আদর-যত্ন করতেও পারলাম না। তাঁর চোখের জলে বুক ভাস্‌তে লাগ্‌লো। অরুণ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিল।

চোখমুখ মুছে, আঙুলে পৈতেটা জড়িয়ে, অরুণের মাথায় হাত রেখে বৃদ্ধ বল্‌তে লাগ্‌লেন—তোমার হাতে দুটো টাকা দিতে না পারলেও তোমার মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করছি—তোমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনা দীর্ঘায়ু হ'য়ে পরম সুখে সংসারধর্ম্ম করো। তোমাদের দাম্পত্য-জীবনে যেন কোন অশান্তির কারণ না ঘটে। শীগ্‌গীরই পরম-সুকুমার সন্তানের মুখ দেখে শান্তি পাও···

লীলার চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল। লজ্জায় সে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। ভয়ানক রাগ হচ্ছিল অরুণের উপর। কেন সে প্রতিবাদ করছে না? কেন সে পরিস্কারভাবে বল্‌ছে না—লীলা আমার বৌ নয়?

অরুণ ভাব্‌ছিল—প্রতিবাদ করলে ভয়ানক মুস্কিলে পড়তে হবে। লীলা যে তার কে—সে কথাটা এই গেঁয়ো সরল-বিশ্বাসীরা খুব সহজে বুঝতে পারবে না। তার চেয়ে বৃদ্ধ যা বল্‌ছে ব'লে যাক—কথাগুলো শুন্‌তেও তার খুব মন্দ লাগ্‌ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ যখন সন্তানের মুখ দেখিয়ে দিলেন—তখন অরুণও একটু বিচলিত হয়ে উঠ্‌লো।

লীলার প্রায় সমবয়সী একটি মেয়ে এসে লীলার হাতখানা ধ'রে বল্‌লো—লীলাদি! তোমার বরকে ব'লে আমার এই মেয়েটাকে একটু ওষুধ দাও না ভাই? কোনো অসুখ নেই অথচ দিনদিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে···

হাত জোড় করে লীলা বল্‌লো—আজ মাপ্‌ করো ভাই! আর একদিন আস্‌বো। সারারাত জেগেছি। মাথা ঘুরছে। আজ এখন আসি···বলেই লীলা বেরিয়ে পড়লো।

অরুণ তার ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে মাঠ পর্য্যন্ত এসে দেখ্‌লো—লীলা যেন দৌড়াচ্ছে! মাঠের প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছে গেছে সে!

পথ চল্‌তে চল্‌তে অরুণ ভাব্‌ছিলো লীলা কি তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে? সে তো কাউকে বলে নি যে—লীলা তার বৌ! তবে তার অপরাধ কি?

এই ঘটনার পর, কয়েক দিন পর্য্যন্ত লীলা খুব খোলাখুলি ভাবে অরুণের সঙ্গে মিশ্‌তে পারে নি। বা, কোনো আলাপ-আলোচনায়ও যোগ দেয় নি তার সঙ্গে।

আজ বিকেলে, ফুলবাগানে বসে লীলা যখন কলির গান শুনছিল, অরুণও এসে বস্‌লো সেখানে।

—থাম্‌লে কেন কলিদি! গাও। আমিও যে এলাম তোমার একটা গান শুনতে—অরুণ বল্‌লো।

হাস্‌তে হাস্‌তে কলি বললো—আচ্ছা ডাক্তার! যে তোমার হবে না—বা হ'তে পারবে না—রাহুর মত 'হাঁ' করে তার পিছনে পিছনে ঘুরছো কেন? যে মেয়ে তোমার হাঁড়িতে চাল দিয়েছে—তাকে খুঁজে পেতে নাও—গাঁটছড়া বাঁধো—লেঠা চুকে যাক···

অরুণ জিজ্ঞাসা করলো—কথাটা কার? তোমার না লীলার?

হঠাৎ লীলা উঠে দাঁড়ালো—আমি এখন আসি কলিদি! আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে···বলেই সে চ'লে গেল।

অরুণের দিকে চেয়ে কলি বল্‌তে লাগ্‌লো—কথাটা লীলারও নয়, আমারও নয়, শ্রীমতীর। যুগে যুগে মেয়েদের পিছনে—'ছেলে-রাহু', আর ছেলেদের পিছনে 'মেয়ে-রাহু' হাঁ করে গিল্‌তে আসছে। শুধু গেলা ছাড়া রাহুরা কি আর-কিছু বোঝে?

অরুণ জান্‌তো কলির মাথায় একটু ছিট্ আছে। কিন্তু লীলাও কি তাকে রাহু মনে করে?

কলি বল্‌তে লাগ্‌লো—শোনো ডাক্তার! আমি দেখ্‌ছি, চারিদিকে শুধু হাঁ-করা রাহু ঘুরছে। তাইতো আমার শ্রীমতী কেঁদে কেঁদে গাইছেন—

কুব্‌জী-রাহু গ্রাস করেছে—
আমার সে শ্যামচাঁদে!
তাইতো আমার প্রাণ কাঁদে গো—
প্রাণ কাঁদে গো, প্রাণ কাঁদে।

আর কতদিন শ্যাম-সোহাগী
কাঁদবে নিঠুর শ্যামের লাগি,
শ্যাম বিনে আর, কে আছে তার?
কার আশে বুক বাঁধে গো—
কার আশে বুক বাঁধে?

গানে বাধা দিয়ে অরুণ জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা কলিদি! লীলাও কি আমাকে রাহু মনে করে? সত্যিই কি আমার জন্যে সে বিপন্ন?

ভুরু কুঁচ্‌কে একটু উত্তেজিতভাবে কলি বল্‌লো—তোমার চোখ নেই? তুমি কি কানা? দেখ্‌তে পাওনা—মেয়েটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে? তুমি এখানে আস্‌বার পর, তার মুখেও হাসি নেই—বুকেও উৎসাহ নেই। আমি পাগলের মত গান গাই—আর, সে পাগলের মত সে-গান শোনে। আমি গান গাইতে গাইতে মরবো। আর লীলা মরবে সেই গান শুন্‌তে শুন্‌তে···

—লীলা যদি মরে, তরুণের জন্যেই মরবে, তা' আমি জানি···অরুণ বল্‌লো—

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কলি বল্‌লো—তোমার শ্রাদ্ধের জন্যে! তোমার পিণ্ডির জন্যে! বল্‌তে পার—তরুণ কে? তরুণ কি? তরুণ কৈ? তুমি বুঝি ভাবো—তোমার ভিতর তরুণ নেই? আছে, আছে, তরুণ যে আমার সেই শ্যামচাঁদের বাঁশীর একটি সুর—একটি রাগ! যে রাগ কোনো বস্তুও নয়, ব্যক্তিও নয়, শুধু একটি ভাব! যে ভাবকে জাগালে জাগে, না-জাগালে কখ্‌খনো জাগে না। কেন জাগাও তাকে? ঘুম-পাড়ানির গান জানো না? তোমরা শ্যামচাঁদকে জাগাও বলেই

তো, আমাদের শ্রীমতী জেগে ওঠেন, কেঁদে ওঠেন! চোখ বুজে একটু মৃদু হেসে—কলি গাইতে লাগ্‌লো—

শ্যাম-সোহাগী মান করেছে—
দেখ্‌বে না শ্যাম-অঙ্গ!
চোখ বুজেছে, দেখ্‌ছে তবু
শ্যামের কপট-রঙ্গ।
বুকের ভিতর নুপুর বাজে—
কানের ভিতর বাঁশী!
নাকের ভিতর গন্ধ আসে
চোখের ভিতর হাসি।
মাথার ভিতর কখন এসে—
দাঁড়ালো ত্রি-ভঙ্গ?
লজ্জা দিলে তোমরা তখন
বাজিয়ে মৃদঙ্গ!......

রায়মশাই বলেন—কলির মাথাটা একটু বিকারগ্রস্ত হলেও, তার ভাবধারা অতি উচ্চাঙ্গের। অরুণ আজ মনে মনে সে কথাটা স্বীকার করলো। মনস্তত্ত্বের কত বড় একটা সমস্যার কথা অতি সহজ ও সরল ভাবে বলেছে সে···

কলি বলেছে—যে ভাবকে জাগালে জাগে, না জাগালে ঘুমিয়ে থাকে —কেন জাগাও তাকে? সত্যিই কি লীলার কোনো ঘুমন্ত ভাবাবেগকে সে আজ জাগিয়ে তুল্‌ছে?

অরুণ লীলাকে ভালবাস্‌তো—আজও ভালবাসে—একথা লীলা জানে। লীলা অরুণকে ঘৃণা করতো—অতি নীচ স্বার্থপর ভেবে। কিন্তু

আজ দেখছে, সে তা' মোটেই নয়। তরুণের পাশে আজ সে একটুও ম্লান হয়ে উঠছে না। অরুণের ঔজ্জ্বল্য আজ তরুণের চেয়ে একটুও কম মনে হচ্ছে না তো?

মানুষ কতকগুলি ভাব-সমষ্টি। অন্তর্নিহিত ভাবধারাই তার রক্ত-মাংসের চাঞ্চল্য ঘটায়—কাজে ও অকাজে প্রবৃত্তি জাগায়। খুব বিপদে সে তখনই পড়ে—যখন তার অবচেতন-মনের অপরিস্ফুট ভাবাবেগকে সে চিন্‌তে ও বুঝ্‌তে না পারে—যখন সে ঘুমিয়েও মনে করে, এই তো বেশ জেগে আছি! লীলার অবস্থাও আজ দাঁড়িয়েছে ঠিক তাই…

অরুণ চিন্তিতভাবে চলে যাচ্ছিল। কলি তাকে ডেকে বল্‌লো—শোনো ডাক্তার! মেয়েটার আর সর্ব্বনাশ না-করে—শীগ্‌গীর এখান থেকে চলে যাও। নইলে—আমি একদিন তোমার মাথায় গরম ফ্যান্ ঢেলে দেব…

সে কথার কোনো জবাব না-দিয়ে অরুণ একটু হেসে চ'লে গেল।

(৬)

মাধুরীর বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষকমশাই আজ পর্য্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন নি।

হঠাৎ এক-সুপ্রভাতে রায়মশাই দেখ্‌লেন—মুখখানি তাঁর অতি পরিষ্কারভাবে কামানো। গোঁফদাঁড়ির চিহ্নমাত্র নেই। মাথার অতি দুর্বিনীত ও রুক্ষ চুলগুলি চিরুনীর শাসন মেনে নিয়েছে। পরিধানের অপরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়ও ধোপ্‌-দুরস্ত হ'য়ে উঠেছে!

হাসতে হাস্‌তে রায়মশাই বল্‌লেন—কিহে মাষ্টার! ব্যাপার কি?

একটু ঢোক্ গিলে ও থতমত খেয়ে মাষ্টার বল্‌লেন—আমার গোঁফ-দাঁড়ির কথা জিজ্ঞেস্ করছেন বুঝি?

—হ্যাগো, হ্যাঁ! এ বয়সে যদি ওদের কামালে, মাথাটাকেই বা রেহাই দিলে কেন? একক্ষুরে সব মুড়্‌লেই তো ভালো হ'তো, কবে আবার আমাকেই হয়তো পরামাণিক ডাকতে হবে—গয়লাকেও খবর পাঠাতে হবে......

মাষ্টার একটু বিব্রতভাবে বল্‌লেন—ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন? হঠাৎ দেখি আমার গলা বেয়ে দাঁড়ির ভেতর ঢুক্‌ছে একটি ছোট্টো ছারপোকা! তাইতো একটু 'প্রি-কসান্' নিতে হ'লো...

চোখদুটো বুজে, ভুরু কুঁচ্‌কে রায়মশাই বল্‌লেন—উহুঁ, কথাটা তো ঠিক হলোনা মাষ্টার! মাঝখানে একটু 'সাপ্রেসান-অব-ফ্যাক্টস্' হ'য়ে গেল যে......

—সে কি রকম ?

—তোমার নিজের গলা তো তুমি দেখ্‌তে পাওনা ? নিশ্চয়ই কেউ গলায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল বলো···

—কেন ? আয়না দিয়ে তো দেখা যেতে পারে ?

হাস্‌তে হাস্‌তে রায়মশাই বল্‌লেন—আয়না-চিরুণী যে তোমার কোনো দিন ছিল না, তা' আমি জানি। বাজার থেকে তা' যদি কিনে এনে থাকো, তাহলে এখন একটা স্নো আর পাউডারও কেনো। পঞ্চাশের পরে বনে-গমন তো 'কম্‌পাল্‌সরি' নয়। কেউ যদি এ-বয়সে নবোদ্যমে ঘরদরজা বাঁধ্‌তে উৎসাহী হয়—আমার মতে, সে তো খুব বাহাদুর ! আমি তাকে খুব তারিফ্‌ করি। তবে আমার এ আশ্রম— বোধ হয়, তার পক্ষে তেমন স্বাস্থ্যকর নয়···কি বলো ?

মাষ্টার ভয়ানক মুস্কিলে প'ড়ে গেলেন। বারবার এদিক-ওদিক চাইতে লাগ্‌লেন। তিনি যে সত্য-গোপনের চেষ্টা করছিলেন হঠাৎ সে কথাটা স্বীকার ক'রেই ব'লে উঠ্‌লেন—নাঃ আপনার কাছে কিছুই গোপন রাখ্‌বার উপায় নেই···সত্যি ঘটনাই বল্‌ছি, শুনুন···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যিই বলো। সত্যির ভিত্তি হচ্ছে—'সিমেন্ট-কন্‌ক্রিট্‌'! মিথ্যের চোরাবালির উপর দাঁড়ালে—উকিলের জেরার ঝাঁকুনি সহ্য করা যায় না। একেবারে আকণ্ঠ ডুবে যেতে হয়···

মাষ্টার বল্‌তে লাগ্‌লেন—কিছুদিন আগে মাধুরীদেবী আমাকে বলেছিলেন—গোঁপদাড়ি কামিয়ে ফেল্‌তে···

—হুঁ, তারপর ?

—আমাকে একটু সুন্দর ও সুশ্রী দেখ্‌তে তাঁর নাকি বড্ড বাসনা হয়েছে ! প্রস্তাবটা অত্যন্ত অশ্লীল মনে হয়েছিল। বোধহয় আপনার

মনে আছে, একদিন একটু উত্তেজিতভাবে ছুটে গিয়েছিলাম আপনার কাছে—একটা অভিযোগ পেশ করতে?

—হ্যাঁ, মনে আছে···

—কিন্তু, পরে ভেবে দেখ্‌লাম—মাধুরীদেবীর প্রস্তাবটা তো অশ্লীল নাও হ'তে পারে? মায়ের জাত! সন্তানকে একটু সুন্দর ও সুশ্রী দেখ্‌বার আকাঙ্ক্ষাটা যে তাঁর মাতৃহৃদয়ের স্নেহপূর্ণ আবেদন নয়—তাই বা কি ক'রে জান্‌লাম আমি? নিশ্চয়ই আমার মনে ছোট্টো একটি ছারপোকার মত পাপ ঢুকেছে!

তখন তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগ্‌লো। ভেবে দেখ্‌লাম—গোঁফ-দাঁড়ি নিয়ে তো কেউ মায়ের কোলে জন্মায় না? অতএব ছেলের মুখে গোঁফদাঁড়ি দেখ্‌লে, মায়ের চক্ষুপীড়া হওয়া খুবই স্বাভাবিক। গোঁফ-দাঁড়ি হচ্ছে—'ডেকরেশন্ অব্ ম্যান্‌হুড্'! 'অ্যাসারশন্ অব ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স'! 'ডিফায়ান্স্ অব মাদারস্ প্রোটেকশন্'! মনে পড়লো শৈশব ও যৌবনের স্মৃতি! হ্যাঁ ঠিক তাই···যৌবনে পা দিয়ে মানুষ যখন মাকে অগ্রাহ্য করতে শেখে, নিজের স্বাধীন-সত্তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে, তখনি আরম্ভ হয় তার প্রথম গোঁফোদ্‌গম! তারপর সে মাকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণভাবে—আর স্ত্রীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নতজানু হ'য়ে। এই সময় তার পৌরুষ এত বেশী প্রকট হ'য়ে ওঠে যে 'ডেলি-শেভ্' করেও গোঁফ-দাঁড়িকে আর বাগে আন্‌তে পারে না।

প্রথম যৌবনে—মেয়েরা তাদের মায়ের আঁচল ছাড়বার জন্যে একটু ছট্‌ফট্ করলেও—ছেলেদের মত একেবারে ছাড়ে না। তাই, তাদের কারো কারো মুখে একটু মসীবর্ণের রেখাপাত হলেও পুরোপুরি গোঁফ-দাঁড়ি গজিয়ে ওঠে না। বর্ত্তমানে আমি 'নরনারীর গোঁফদাঁড়ি' সম্বন্ধে

একটা 'থিসিস্' লিখ্‌ছি…আর, মাধুরীদেবীকেও মাতৃ-সম্বোধন ক'রে একখানা চিঠি লিখেছি। সে-চিঠিতে একথা আমি খুব স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছি যে—উপস্থিত আমার এই গোঁফদাড়ি কামিয়ে ফেলে, খোকাত্ব লাভ করার উদ্দেশ্য—মাতৃ-স্বরূপা মাধুরীদেবীর মনস্তুষ্টি-সম্পাদন!

তন্ময়ভাবে 'ঈডিপাসে'র এই উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা শুনতে শুনতে রায়মশাইয়ের চোখদুটি সজল হ'য়ে উঠ্‌লো। এমন একটি বয়োবৃদ্ধ শিশুকে অতি কুৎসিৎ সন্দেহ করেছিলেন ব'লে—মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন। উঠে দাঁড়িয়ে মাষ্টারের পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্‌লেন—তোমার থিসিস্ লেখা শেষ হ'লে—আমাকে একবার শোনাবে তো?

—নিশ্চয়ই শোনাবো…নীচু হ'য়ে রায়মশাইয়ের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে মাষ্টার বল্‌লেন—শ্রীভগবানের মত ওই বকুলাসনে গীতা নিয়ে ব'সে, আপনিই তো জোগাচ্ছেন—আমার 'ইনস্‌পিরেশন্-অব-রাইটিং'!…

রায়মশাই বল্‌লেন—চলো মাষ্টার, ছেলেদের হাডু-ডুডু খেলা দেখে আসি। সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি তোমার ওই সব ছেলেরাও যেন তোমারি মত মাতৃভক্ত হ'য়ে ওঠে…

অরুণের আস্তানা ছিল রায়মশাইয়ের কুটিরে। এলাহাবাদের চাকরী ছেড়ে দিয়ে, আপাতত সে বিদ্যার্থী-ভবনেই থাকবে ঠিক করেছে। একজন আশ্রমবাসী চিকিৎসক-হিসাবে আজ সে দেশ-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে চায়। রায়মশাই তার এ ইচ্ছা অসমীচীন মনে করেন নাই। অর্থোপার্জ্জন ক'রে বড়লোক হওয়ার প্রবৃত্তি ক্রমেই যেন অরুণের মন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পার্শ্ববর্ত্তী দরিদ্রপল্লীর অধিবাসীরা তাকে 'কাঙালের বন্ধু' মনে করছে। কোথায়ও বিনা-ভিজিটে, কোথায়ও বা সামান্য ভিজিটে দু'বেলাই সে রোগী দেখে বেড়াচ্ছে। অর্থের চেয়েও

দরিদ্রের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবহার ও আন্তরিক শ্রদ্ধানিবেদন, যেন তাকে বেশী তৃপ্তিদান করছে! অনিচ্ছাসত্বেও লীলা মাঝে মাঝে অরুণের সঙ্গিনী হ'য়ে রোগীর সেবা ও শুশ্রূষা করতে বাধ্য হয়। কাজটা তার অত্যন্ত ভাল লাগে, তাই সে অনেক সময় আত্মবিস্মৃতভাবেই মেতে ওঠে। অরুণের সঙ্গে যেখানে-সেখানে যেতে এখন আর ইতস্তত করেনা।

লীলা যে ডাঃ অরুণের স্ত্রী, এ ধারণা আশ্রমের ভিতরে ও বাইরে ছেলেবুড়ো সকলের মনেই বদ্ধমূল হ'য়ে উঠেছে। অপরিচিত দেশ। কি উপায়ে, এখানে কেউ জানবে যে অরুণের সঙ্গে লীলার সম্বন্ধ কি? জানেন শুধু রায়মশাই। আর জানে মাধুরী ও কলি। এই তিনজন এখন নিয়মিতভাবে প্রচারকার্য্য না-চালালে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদের মন থেকে এরূপ একটি সুনিশ্চিত ধারণা দূর হওয়ার আর কোনো উপায় নেই।

জনসাধারণের অপরাধ কি? তারা দেখছে—নির্লোভ-চিকিৎসকের সঙ্গে, নিঃস্বার্থ শুশ্রূষাকারিণীর সহযোগিতা। জিজ্ঞাসিত হ'লে—অরুণের মৌন-সমর্থন আর লীলার সলজ্জ সঙ্কোচ-প্রকাশ তাদের অনুকূল মত পোষণের সহায়তাই ক'রে থাকে। সম-বয়সী মেয়েরা অনেক সময় লীলাকে প্রশ্ন করেছে—ডাক্তারবাবু তোমার কে ভাই? লীলা জবাব দিয়েছে—আমার স্বামীর বন্ধু...তারা বিশ্বাস করেনি। হাসতে হাসতে পরিহাস ক'রে বলেছে—স্বামীকে স্বামীর বন্ধু-পরিচয় দিয়ে কি লুকোনো চলে ভাই?

লীলা যেন আজকাল শুকিয়ে যাচ্ছে। তার চোখেও সে দীপ্তি নেই, মুখেও সে লাবণ্য নেই। অরুণ যখন বিদ্যার্থী-বালকদের নিয়ে খেলাধূলা করে, শারীরিক কসরৎ শেখায় ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক

যুক্তি দেখিয়ে উপদেশ দেয়, লীলা তখন দূরে দাঁড়িয়ে দেখে ও শোনে। অরুণকে তার খুব ভাল লাগে। হঠাৎ কেন যেন চোখদুটো জলে ভ'রে ওঠে। আঁচল দিয়ে চোখ চেপে ধ'রে তখনি সে পালিয়ে যায় সেখান থেকে।

ফুল-বাগানে ব'সে, কলি একদিন লীলার পিঠে দুম ক'রে একটা কিল্ বসিয়ে দিয়ে বল্লো—তোর ঠাকুরদাকে বল্, ও পালোয়ানটাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিক্। আর না হয়, তুই নিজেই পালিয়ে যা। মনে মনে ওর সঙ্গে কুস্তি ল'ড়ে তুই কেন পেরে উঠবি রে পোড়ারমুখি! মরে যাবি, মরে যাবি, মরে যাবি···

কলির বুকে মুখ লুকিয়ে লীলা নিঃশব্দে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। গালে হাত রেখে কলি বল্লো—লোকটা কি বেহায়া গো! সেদিন ব'লে দিইছি—'মাথায় গরম ফ্যান্ ঢেলে দেব।' তব্ কি নড়ে? দেব নাকি একদিন—নাঃ, আগে বুড়ো অক্রূরকে ব'লে দেখি সে কি ব্যবস্থা করে···

লীলাকে একদিন এক গাছতলায় নির্জ্জনে পেয়ে অরুণ জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা লীলা! তুমি এমন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন. বলো তো? ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ধরেছে বুঝি? চারিদিকে কি সুন্দর ফাঁকা মাঠ! অন্ধকার থাকতে রোজ আমি, ছেলেদের নিয়ে মাঠে বেরিয়ে পড়ি—ছুটোছুটি করি—সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরে যায়—তারপর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসি। বেরোবে তুমি আমাদের সঙ্গে? তোমার শরীর আবার ভাল হ'য়ে উঠ্‌বে ··

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে লীলা জিজ্ঞাসা করলো—এখানে আর কতদিন থাকবেন আপনি?

একটু হেসে অরুণ বল্‌লো—জীবনটা তো এখানেই কাটাবো মনে করছি। আমার তো আর কেউ নেই লীলা! কি দরকার—ব্যাঙ্কে কতগুলো জমাবার? মানুষের মত বাঁচ্‌বার জন্যে—এতগুলি ছেলের শরীর গড়ে তোল্‌বার সুযোগ পাচ্ছি। রোগ-যন্ত্রণায় এক ফোঁটা ওষুধ না খেয়ে, কুকুর-শেয়ালের মত যারা মরে যাচ্ছিল—শতকরা তাদের দশটাকেও অন্তত বাঁচিয়ে রাখ্‌বার সুবিধা পাচ্ছি। এই তো বেশ···

—বিয়ে করবেন না?

—নিশ্চয়ই না।

—কেন?

—ইচ্ছে নেই···

—দেশসেবা- সম্বন্ধে আমি যখন কোনো কথা বল্‌তাম্—আমাকে কত বিদ্রূপ করতেন। আপনার জীবনের লক্ষ্য ছিল বাড়ি, গাড়ী, আর রায়বাহাদুরী! আজ এসব কি হচ্ছে বলুন তো?

সন্ধ্যা কাল। শুক্লপক্ষের এক টুক্‌রো নিষ্প্রভ চাঁদ আকাশের গায়ে ঝুলছিল। মাথাটা উঁচু করে সেই দিকে চেয়ে—নিজের ডান-হাতের মাসেলটা বাঁ-হাতে মুচ্‌ড়ে ও ফুলিয়ে অরুণ বল্‌লো—আমার জীবনে কি আর কোনো লক্ষ্য ছিল না লীলা? তুমিই যাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছ—তার জীবনের লক্ষ্য-সম্বন্ধে আজ আর কোনো প্রশ্ন না-তুল্‌লেই বোধ হয়—ভাল হয়।

হঠাৎ লীলার চোখদুটো যেন আগুনের মত জ্বলে উঠ্‌লো। চিৎকার ক'রে সে ব'লে উঠ্‌লো—আপনি বিয়ে করবেন কিনা বলুন···

চম্‌কে উঠে লীলার দিকে চেয়ে অরুণ বল্‌লো—ওকি লীলা! তুমি কাঁপ্‌ছো কেন?

—অন্য কোনো কথা শুনতে চাইনে—বলুন, আপনি বিয়ে করবেন, কিনা? বলুন্—বলুন্…

—পড়ে যাবে যে! না, না, উঠে দাঁড়িও না…ব'সো ব'সো…

—ব'ল্‌বেন্ না? ব'ল্‌বেন না? উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্তের মত লীলা তার নিজের মাথার দু'গোছা চুল দু'হাতে মুঠো-ক'রে, টেনে ছিড়ে ফেল্‌তে চেষ্টা করছিল। বলিষ্ঠ হাতে হাত-দু'খানা চেপে ধ'রে অরুন চুলগুলি ছাড়িয়ে দিতেই, লীলা ঢ'লে পড়লো অরুণের বুকের উপর! বিপন্নভাবে চারিদিকে চাইতে চাইতে অরুণ লীলার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে—মাটিতে শুইয়ে দিল তাকে।

লীলা অজ্ঞান। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে আস্‌ছে। আশ্রম কুটিরগুলি সেখান থেকে অনেকটা দূরে—চিৎকারেরও বাইরে। অরুণ ভাব্‌তে লাগ্‌লো—সে এখন কি উপায় করবে। লীলাকে সেখানে একলা ফেলে তো যেতেও পারছে না! এইভাবে চুপটি ক'রে বসেই বা থাকবে কতক্ষণ? একী অসহ্য অবস্থা তার? বারবার চারিদিকে চাইতে লাগ্‌লো—কিন্তু কোথায়ও কেউ নেই! কলি বা মাধুরী কেন আস্‌ছে না লীলাকে খুঁজ্‌তে?

মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ অরুণের মনে হলো—লীলা বুঝি 'হার্টফেল' করেছে! নাকের কাছে হাতটা রেখে সে ঠিক বুঝ্‌তে পারলো না—শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কিনা? 'ষ্টেথিস্‌কোপ'ও সঙ্গে নেই। মস্ত একজন ডাক্তার সে। কিন্তু এ কী অসহায় অবস্থা তার? অরুণের কোলে মাথা রেখে লীলা কি এইভাবে মরবে? লীলার বুকে কানটা পেতে—অরুণ শুন্‌লো—অতি মৃদু ও বিলম্বিত 'লব্‌ডব্' শব্দ! কিন্তু সে 'হার্টবিট্' কার? তার নিজের না লীলার? না, না, আর অপেক্ষা

করা উচিত নয়। এখুনি একবার—'আর্টিফিসিয়াল্-রেস্পিরেশনে'র চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বে—তারপর তাকে বুকে করে নিয়ে যাবে আশ্রমে। উঠে দাঁড়িয়ে অরুণ তার মাজার কাপড়টা ভাল ক'রে বাঁধ্‌লো···

দূর থেকে রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—অন্ধকারে ও গাছতলায় কে?

—আমি—আমি অরুণ!

—লীলা কোথায় বল্‌তে পার?

—এই তো এখানে! শীগ্‌গীর আসুন এদিকে···

ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে রায়মশাই দেখ্‌লেন—অরুণের পায়ের কাছে পড়ে আছে লীলা! বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি?

—ফিট্ হয়েছে। আপনি একটু বসুন এখানে—আমি ছুটে গিয়ে ওষুধের ব্যাগটা নিয়ে আসি···

অরুণ গেল দৌড়ে, এলো সাইকেলে। সে আস্‌বার আগেই লীলা উঠে বসেছিল। শুক্‌নো গলায় অতি কাতর ভাবে বল্‌ছিল—বড্ড পিপাসা—একটু জল···

অরুণ ওষুধ এনেছিল—জল আনেনি। অবার ছুটে গেল জল আন্‌তে।

সেই রাত্রেই রায়মশাই অরুণকে সঙ্গে নিয়ে উঠ্‌লেন বকুলাসনে। সস্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন—শোনো দাদু। তরুণ আমার বুকের রক্ত, তুমি কেউ নও। তবু তরুণের চেয়েও তোমাকে আমি বেশী ভালবাসি! এই বিদ্যার্থী-ভবনে লীলার চেয়েও তোমার মূল্য বেশী, আমার চেয়েও তোমার আবশ্যকতা বেশী! কিন্তু

উপায় নেই ভাই! কিছুদিনের জন্যে তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে—লীলাকে বাঁচাতে হবে…

—লীলা কি আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেছে? কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রে অরুণ ছল্‌ছল্ চোখে চেয়ে রইলো, রায়মশাইয়ের মুখের দিকে।

রায়মশাই হেসে বল্‌লেন—পাগল! নিজের বিরুদ্ধে ছাড়া, আজ আর কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই তার। তাইতো সে নিজেই শুকিয়ে যাচ্ছে, বোঁটা-ছেঁড়া ফুলটির মত…

—আপনি কি মনে করেন—তরুণকে এখন আর লীলা ভালবাসে না? বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলো অরুণ।

—নিশ্চয়ই বাসে। রায়মশাই বল্‌তে লাগ্‌লেন। আমার মনে হয়—আগের চেয়ে এখন আরো বেশী ভালবাসে। ব্যবধান আর অদর্শন ভালবাসার গভীরতা বাড়ায়। বিয়ে বহিরঙ্গ, আর ভালবাসা অন্তরঙ্গ। বিয়ের অঙ্গচ্ছেদ করে—মানুষ তার বৈবাহিক ভুলটা খুব সহজেই শোধ্‌রাতে পারে—যেখানে হৃদ্‌পিণ্ডের কোনো প্রতিবাদ না-থাকে। নাক কেটে দিলে কেউ মরে না। কিন্তু শ্বাস-রোধ করলে—কেউ কি বাঁচে? আজ তোমার স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য, চরিত্র-মাধুর্য্য, আর ব্যক্তিত্বের প্রভাব—লীলার শ্বাসরোধের কারণ ঘটাচ্ছে! তার্ হৃদ্‌পিণ্ডে আঘাত করছে! আর যদি বেশী দিন তুমি এখানে থাকো, তা'হলে নিশ্চয়ই সে মরে যাবে—তবু তরুণকে ভুলে, তোমাকে ভালবাস্‌তে পারবে না। একটু থেমে রায়মশাই আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন…

মেয়েদের ভালবাসা বুক-দিয়ে-চলা শামুকের গতি! উঠতেও দেরি, নাব তেও দেরি! পুরুষ তো সহস্রপদী—সরীসৃপ! তার ওঠা-নাবা—

যেমন দ্রুত, তেমনি অনিশ্চিত। তুমি যা'তে খেলাধূলোর আনন্দ পাবে —লীলার তা'তে ঘটবে মৃত্যু!

পরের দিন অরুণ তার স্যুটকেস্ আর বেডিং গুছিয়ে ফেল্‌লো। বাইরে প্রকাশ থাক্‌লো—সে এখান থেকে চ'লে যাচ্ছে, তার নিজেরই বিশেষ কোনো প্রয়োজনে।

বিকেলে একটা জনসভা আহ্বান করা হ'লো। বিদ্যার্থী-ভবনের ছেলেরা রাশীকৃত ফুলের মালা পরিয়ে দিল অরুণের গলায়। পার্শ্ববর্ত্তী দরিদ্র পল্লীগুলির স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেই এসে উপস্থিত হ'লো সেই সভায়। সকলেই বিমর্ষ ও মর্ম্মাহত। রায়মশাই সভাপতির আসনে ব'সে বারবার চোখ মুছতে লাগ্‌লেন। প্রধান শিক্ষকমশাই অরুণকে 'হারকিউলিস্-অব্-স্বাবলম্বী বিদ্যার্থী-ভবন' ব'লে সম্বোধন ক'রে —নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। অরুণের ব্যক্তিত্ব, আর্ত্তসেবার প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্যচর্চ্চার আগ্রহ প্রভৃতি বিবৃত ক'রে—অতি উচ্ছ্বসিত-প্রশংসা করলেন তিনি। বালকগণকে উপদেশ দিলেন—তারা যেন অরুণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে···

ফুলের মালার ভারে ঘাড়টা নীচু করে—অরুণ উঠে দাঁড়ালো! তার দু'চোখে দু'ফোঁটা জল টলমল্ করছিল। অরুণ বল্‌তে লাগ্‌লো— অতি অল্প দিনের মধ্যে এই বিদ্যার্থী-ভবনের প্রত্যেকটি ধূলিকণাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। দেশকে ভালবাসার বা দেশবাসীকে সেবা করার কোনো প্রবৃত্তি, কোনো দিন, ছিল না আমার মধ্যে। এই প্রেমধর্ম্মে আমাকে যিনি দীক্ষা দিয়েছেন—যাঁর চোখের দীপ্তি, মুখের হাসি, আর বুকের ভালবাসা···

রায়মশাই উঠে দাঁড়ালেন। চিৎকার ক'রে বললেন—তাঁর কথা এ সভায় আলোচনা-করার কোনো প্রয়োজন নেই অরুণ!

অরুণ বলতে লাগ্‌লো—আপনাদের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে, জনসাধারণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কানে শুনে, আর আমার প্রিয়তম ছেলেদের-দেওয়া এই সম্মানের বোঝা গলায় প'রে, আমি কি একটা অকৃতজ্ঞ চোরের মত পালিয়ে যাবো এখান থেকে? একবারও কি মুখে উচ্চারণ করতে পারবো না তাঁর নামটা—যিনি আমার জীবনের গতি-মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমাকে ধন্য করেছেন এই দেশসেবার পবিত্র কাজে উদ্বুদ্ধ ক'রে···

—না, না···সভাপতির আসন থেকে আমি তোমাকে আদেশ করছি—এ সভায় তাঁর নামটা উচ্চারণ ক'রো না তুমি···রায়মশাই আবার চিৎকার ক'রে বললেন।

দুঃখিতভাবে অরুণ বললো—তা'হ'লে আমার আর কিছু বল্‌বার নেই···নমস্কার···চোখ মুছে ব'সে পড়লো সে।

প্রধান-শিক্ষকমশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—শুনুন অরুণবাবু! আপনি যে আমাদের ভবন-গুরু রায়মশাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করতে চান্—তা' আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি। আমরা জানি—তিনি প্রশংসা শুনলে একটু বিচলিত হ'য়ে ওঠেন। তবু আমি আপনার কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলছি—আমাদের গুরুদেবের চোখের দীপ্তি, মুখের হাসি ও বুকের ভালবাসা, শুধু আপনাকে নয়, আমাদের সবাইকে উদ্বোধিত করে, উজ্জীবিত করে, উৎসারিত করে···নিজেই ঘন ঘন হাততালি দিয়ে, তিনি সকলকে হাততালি দেবার জন্যে উত্তেজিত করতে লাগ্‌লেন।

রায়মশাইও সে আনন্দ-প্রকাশে সহযোগিতা করলেন—হাত-তালি দিয়ে, আর হো হো ক'রে খুব খানিকটা হেসে! শিক্ষকমশাই অবাক হ'য়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। নিজের প্রশংসা শুনলে—এভাবে তো তিনি কখ্খনো হাসেন না। ব্যাপার কি?

সভা-অন্তে শিক্ষকমশাই অরুণকে একান্তে ডেকে নিয়ে গেলেন। গলাটা জড়িয়ে ধ'রে, কানের কাছে মুখটা নিয়ে, খুব নীচুস্বরে বল্লেন—আপনার স্ত্রীকে কি এখানে রেখে যাচ্ছেন?

—কেন বলুন তো?

—আমাদের সম্পাদক বিশ্ববাবুর কোনো নীতিজ্ঞান নেই। অনেক সময় লক্ষ্য ক'রে দেখেছি—মা-লীলার মুখের দিকে তিনি অতি কুৎসিৎভাবে তাকিয়ে আছেন। বিশেষ প্রতিবাদ ক'রেও, তাঁর এ বদভ্যাসটি ত্যাগ করাতে পারিনি…

অরুণ একটু হেসে বল্লো—কি দরকার? লীলা অপূর্ব্ব সুন্দরী। তাঁর মুখখানা দেখে কেউ যদি একটু তৃপ্তি পায়—নিজের সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয় দেয়—আপনিই বা কেন প্রতিবাদ করেন?

—বলেন কি? তিনি হচ্ছেন—পরস্ত্রী! অবাক হ'য়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

অরুণ বল্লো—অপূর্ব্ব সুন্দরী হলেও, নিজের স্ত্রীকে দেখে দেখে মানুষের চোখ যখন অত্যন্ত 'টায়ার্ড' হ'য়ে ওঠে, নিতান্ত কুৎসিৎ হলেও—পরস্ত্রীকে তখন একটু 'রিলিফ' মনে হয়। চিরকুমার ব'লেই আপনি বোধ হয় এ তত্ত্ব অবগত নন্…

—কী আশ্চর্য্য! আপনিও কি ওই বিশ্ববাবুর মত নীতিজ্ঞানহীন? রাগে শিক্ষকমশাইয়ের চোখমুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্লো।

তরুণ খুব খানিকটা হেসে বল্‌লো—"পরস্ত্রীর প্রতি চাহিবামাত্র—দর্শকের চক্ষু-উৎপাটন!" খুব সুস্থ নীতি ব'লে তো মনে হয় না? চোখের একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-স্পৃহা আছে। তা' যে সব সময় কুৎসিৎ একথা কি আপনি জোর ক'রে বলতে পারেন?

—হুঁ, বুঝ্‌তে পেরেছি···শিক্ষকমশাই বলতে লাগ্‌লেন। বিশ্ব-বাবুর মত আপনার কপালেও আগুন লেগেছে। যাক্‌গে—আপনার স্ত্রীকে আপনি একজিবিসনে দিতে চান্—দিন্। মিউজিয়মে রাখ্‌তে চান্—রাখুন্। তা'তে আমার আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? তবে, শুনুন অরুণবাবু! একটা 'নোট্ অব্ ওয়ার্নিং' আপনাকে দিতে চাই। 'মাতৃবৎ পরদারেষু'—এ নীতিবাক্য কণ্ঠস্থ না-করিয়ে—কোনো যুবকের দেহস্থ শক্তি-সামর্থকে বৰ্দ্ধিত ও স্পৰ্দ্ধিত করবেন না! দ্যাট্ ইজ্ ভেরি ভেরি ডেন্‌জারাস্ ফর্ দি সোসাইটি! পরস্ত্রীকে যারা মাতৃসমা মনে করতে না-পারে—তাদের শরীর যেন আমার মত শুকিয়ে যায়—সেও ভাল—তবু যেন আপনার মত 'মাস্‌কুলার' হ'য়ে না-ওঠে! অ্যাট্ দি টপ্ অব্ মাই ভয়েস্—উইথ্ অ্যাজ্ মাস্ ভোকাল ষ্ট্রেন্‌থ্ অ্যাজ্ আই ক্যান্ কমাণ্ড—আমি আবার বলছি—বিওয়ার অব্ দি ডেন্‌জার! নীতিজ্ঞান-বর্জ্জিত মাস্‌কুলার ডেভেলপ্‌মেন্ট—সমাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক!

অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে প্রধান শিক্ষকমশাই গজ্‌গজ্ করতে করতে চ'লে গেলেন।

লীলা, মাধুরী ও কলি অভিনন্দন-সভায় উপস্থিত ছিল। সভাপতি রায়মশাই যখন অরুণকে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে বাধা দিচ্ছিলেন, তখন অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় লীলা খুব কাতর হ'য়ে পড়েছিল। রাত্রে

তার ভয়ানক জর হয়েছে। কলি রায়মশাইকে খবর পাঠিয়েছে। তিনি এসে সারারাত লীলার শিওরে ব'সে আছেন। অরুণকে এ খবরটা কেউ জানায়নি।

বন্দোবস্ত ছিল—ভোরে উঠেই অরুণ গিয়ে ষ্টীমার ধরবে। একটা মুটের মাথায় স্যুটকেস্ ও বেডিং চাপিয়ে, অরুণ যখন রওনা হচ্ছিল—তখন মাধুরী এসে একটা প্রণাম ক'রে বল্‌লো—আপনি চল্‌লেন ?

—হ্যাঁ। লীলা বোধ হয় এখনো ঘুমুচ্ছে ? অরুণ জিজ্ঞাসা করলো।

—সে তো জরে অজ্ঞান···

—জর ! কখন হ'লো ? অরুণ চম্‌কে উঠ্‌লো।

—কাল রাত বারোটার পর···

অরুণ মুটেকে বল্‌লো—মোট নাবা। তারপর চিন্তিতভাবে চল্‌লো লীলার কুটিরের দিকে। দূর থেকে অরুণ দেখ্‌লো—রায়মশাই গালে হাত রেখে বারান্দায় ব'সে আছেন। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—

—লীলার নাকি জর হয়েছে ?

—হ্যাঁ। তুমি রওনা হওনি ! ষ্টীমার কি আর ধরতে পারবে ?

সে কথার কোনো জবাব না-দিয়ে অরুণ জিজ্ঞাসা করলো—লীলার চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করেছেন ?

—বন্দর থেকে ডাক্তার আন্‌তে পাঠিয়েছি···

—আমি একবার দেখ্‌তে চাই তাকে।

রায়মশাই একটু চিন্তা ক'রে বল্‌লেন—এসো···তারপর অরুণকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুক্‌লেন তিনি। অরুণ দেখ্‌লো—শয্যায় শায়িত লীলার চোখ দুটো যেন জবাফুলের মত রাঙা ! বহুক্ষণ

অপলক চোখে অরুণের মুখের দিকে চেয়ে থাকলো সে। জ্বরের উত্তাপ বুঝবার জন্যে অরুণ তার কপালে হাত দিতেই লীলা চিৎকার ক'রে উঠলো—না, না, না, সরে দাঁড়ান আপনি···

—অমন করছো কেন লীলা? অরুণ জিজ্ঞাসা করলো।

উত্তেজিত ভাবে লীলা বলতে লাগলো—শুনুন অরুণবাবু! আপনার বন্ধুর পা'দুখানা স্পর্শ করবার যোগ্যতাও নেই আপনার। আমার কি ইচ্ছে হ'চ্ছিল জানেন? ফুলের মালাগুলো আপনার গলা থেকে কেড়ে নিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলি···

লীলার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হ'য়ে উঠলো। কুপিত অজগরের মত, নিশ্বাসের তালে তালে বুকটাও তার ফুলে ফুলে উঠছিল।

স্নেহার্ত্ত কণ্ঠে অরুণ ডাকলো—লীলা!

লীলা চীৎকার ক'রে উঠলো—চুপ করুন—শুনুন—যা' বলি··· বন্ধুর আত্মিক শক্তির কাছে, আপনার বুকের ছাতি আর হাতের মাসেল পাহাড়ের গায়ে দু'টি ছোট্টো মাটির ঢিল্‌। জেলে বসে তিনি করছেন দারিদ্র্য-নিপীড়িত পরাধীন ভারতের মুক্তি-কামনা, আর এই বিদ্যার্থী-ভবনের প্রাচুর্য্যের কোলে ব'সে আপনি করছেন—পল্লী-সেবার বিলাসিতা! তাঁর সঙ্গে আপনার কি কোনো তুলনা হয়? তিনি বীর, তিনি সাহসী—আপনি ভীরু, আপনি কাপুরুষ···

বাধা দিয়ে রায়মশাই বল্‌লেন—শান্ত হও লীলা! তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে···

—না'না, কোনো কষ্ট হচ্ছে না। আমি বল্‌বো—লীলা তেমনি চিৎকার করে বল্‌তে লাগ্‌লো···রাজশক্তিকে উপেক্ষা ক'রে কারা-প্রাচীরে আবদ্ধ থেকে—তিনি দিচ্ছেন স্বাধীনতার হোমাগ্নিতে বিন্দু বিন্দু

বুকের রক্ত! আর আপনি এসেছেন এখানে ব্যক্তি-কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে—রোগার্ত্তের মুখে এক ফোঁটা বিলিতি ওষুধ দিয়ে। তিনি ছুটে গেছেন এই সুন্দরী লীলার মত আত্ম-নিবেদিতার বাহুবন্ধন ছিন্ন ক'রে—কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বানে! আর আপনি ছুটে এসেছেন একটা হ্যাংলা কুকুরের মত, তারই পিছনে-পিছনে—যে আপনাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, আপনাকে দেখ্‌লে যার চোখদুটো জ্বালা করে—আপনার নাম শুনলে যার কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে। আমি শুধু ভাবি—আপনি কি? রক্তমাংসের মানুষ কি আপনার মত নির্লজ্জ হতে পারে?

একটু চঞ্চল ভাবে অরুণ বল্‌লো—আমাকে ক্ষমা করো লীলা! ক্ষমা করো···আজই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি···

লীলা বল্‌তে লাগ্‌লো—হ্যাঁ যাবেন—নিশ্চয়ই যাবেন···কিন্তু, কোথায় যাবেন বলুন তো? আগে জেলের দরজায় গিয়ে ফুলের মালাগুলি সব পরিয়ে দেবেন আপনার বন্ধুর গলায়—তারপর তাঁকে বল্‌বেন—'লীলা তাঁর সাধনার পথে কখ্‌খনো কোনো বিঘ্ন-সৃষ্টি করবে না,···বল্‌তে বল্‌তে সে ঢুকরে কেঁদে উঠ্‌লো। কলি তার শিওরে বসে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লো। অরুণের দিকে চেয়ে বল্‌লো—দয়া করে আপনারা এখন এ ঘর থেকে বেরিয়ে যান্ তো···

সস্নেহে অরুণের হাতখানা ধ'রে রায়মশাই বল্‌লেন—এসো অরুণ···

অরুণকে নিয়ে তিনি বকুলাসনে উঠে বস্‌লেন। তারপর তাকে বোঝাতে লাগ্‌লেন—বিকারগ্রস্ত লীলার তিরস্কারগুলি সত্যিই তার অন্তরের অভিব্যক্তি নয়। অরুণের অভিনন্দন, লীলার মর্ম্মস্পর্শ করেছে। অরুণকে আজ লীলার খুব ভাল লেগেছে। যে ভাল-লাগা সে সহ্য করে উঠ্‌তে পারছে না। তরুণ আজ তার চোখে অতি

নির্মম ও নিষ্ঠুর! তবুও তরুণের কারাবরণ-সম্বন্ধে সে যে-মৌখিক শ্রদ্ধা-নিবেদন করলো—তা' অত্যন্ত কৃত্রিম। অরুণকে শুনিয়ে বুকের জ্বালা জুড়াবার জন্যেই, কথাগুলি লীলা খুব উচ্চ চিৎকারে বলেছে, ভাষার ছটা দিয়ে অন্তরের সহজ অনুভূতিকে গোপন করতে চেষ্টা করেছে। যদি আর একটি দিনের জন্যেও তুমি এখানে থাকো—তা'হলে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে না পেরে—হয় তার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, আর না হয় মস্তিষ্ক-প্রদাহের অতি কঠিন অবস্থায় পৌঁছে—হঠাৎ সে মারা যাবে।

অরুণ খুব ব্যগ্রভাবে বল্‌লো—বারোটার লঞ্চেই আমি রওনা হচ্ছি। লীলাকে বল্‌বেন—আমি চলে গেছি। জীবনে আর কখনো তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াবো না। সে যেন আমাকে আর তিরস্কার না করে। একেবারেই যেন ভুলে যায় আমার কথা…

একটু হেসে রায়মশাই বল্‌লেন—উত্তেজনার জবাব তো উত্তেজনা নয় অরুণ! অতি শান্ত ও সংযত সহানুভূতি। জীবনে আর কখনো তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াবে না, কেন বলো তো? তুমি যে লীলাকে ভালবাসো, এ সত্য কি অস্বীকার করতে পার? তাকে ভালবাসো বলেই তো এখান থেকে চলে যাচ্ছ? প্রয়োজন হ'লে, এই ভালবাসার আকর্ষণেই আবার তুমি আস্‌বে—লীলাও তোমাকে অভ্যর্থনা করবে, মনের অপরিসীম স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য নিয়ে। উত্তেজনা—দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। যে বলিষ্ঠ, সে অচঞ্চল ও ক্ষমাশীল। চুপ করে ব'সে শোনো গীতার কয়েকটি শ্লোক পড়ি…'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা—সুখেষু বিগতস্পৃহঃ'…অরুণ মাথা নীচু করে বসে রইলো।

লীলা ঘুমিয়ে পড়েছে। মাধুরীকে কাছে বসিয়ে রেখে কলি ফুল

বাগানে এসে বস্‌লো। লীলাকে সে অত্যন্ত ভালবাসে। লীলার দুঃখে তার সহানুভূতির সীমা নেই। লীলার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে গান গাইতে আরম্ভ করলো…

শ্যামের চেয়েও বেশী হ'লো—
　　শ্যামের বাঁশীর যাতনা।
শ্যাম-সোহাগীর নিন্দে করো—
　　যা' ভেবে—ঠিক্ তা'তো না?
শ্যামের বাঁশী সর্ব্বনাশা!
ক'জন বোঝে তার সে ভাষা?
শ্যামকে যদি চাও তবে তার—
　　বাঁশীর সুরে মেতো না?
কেউ খোঁজে—ওই গহন বনে—
কেউ চেয়ে রয় নীল-গগনে!
শ্যাম- সোহাগীর মত, ও-কান—
　　নিজের বুকেই পাতো না।

সুরের টানে ধীরে ধীরে অরুণ এসে দাঁড়ালো কলির সাম্‌নে। তাকে দেখেই কলি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লো—সেদিন কেন আমার কথা শুন্‌লে না ডাক্তার? তাহলে কি আজ এত অপদস্থ হ'তে? কী বকুনিটাই খেলে লীলার কাছে! ছিঃ।

—লীলা এখন কেমন আছে? অরুণ জিজ্ঞাসা করলো।

—ঘুমুচ্ছে—কলি বল্‌লো। তোমাকে দেখে খানিকটা বকাবকি ক'রে তার জ্বরের তাপ বেশ কমে গেছে। তুমি চ'লে গেছ শুন্‌লে বোধ হয় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠ্‌বে…

—আশ্চর্য্য !

কলি চোখমুখ ঘুরিয়ে বল্‌লো—আশ্চর্য্য, লীলাও নয়—তুমিও নও। আশ্চর্য্য সেই শ্যামের বাঁশী ! যে বাঁশী মেয়েদের বুকে বুকে বাজে। কেউ শোনে, কেউ শোনে না। ওগো শ্যামচাঁদ ! বাঁশীটি কেন বাজাও ? কেন শ্রীমতীকে এত দুঃখ দাও ?

ঠিক্ এই সময়ে, ব্রজেশ্বর চৌধুরী—ওরফে ওয়েদার-ককুকে সঙ্গে নিয়ে রায়মশাই এসে উপস্থিত হলেন সেখানে।

ব্রজেশ্বরকে খুঁজ্‌বার জন্যে, রায়মশাই তাঁর—কল্‌কাতার কয়েকজন বন্ধুকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কয়েকদিন আগে তাঁদেরই একজন খবর পাঠিয়েছেন—"উপস্থিত ব্রজেশ্বরের চাকরী নেই। আপীসে আপীসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি।"

সুযোগটা রায়মশাই গ্রহণ করলেন। প্রস্তাব পাঠালেন—'অবিলম্বে ব্রজেশ্বর যদি বিদ্যার্থী-ভবনে এসে পৌছান, তা'লে তাঁর চাকরী সুনিশ্চিত।' ব্রজেশ্বর—বি, কম্। রায়মশাই মনে মনে স্থির করলেন—বিল্ববাবুকে জবাব দিয়ে, ব্রজেশ্বরকে বহাল করবেন সম্পাদক-সেরেস্তায়।

দূর থেকে কলিকে দেখিয়ে, রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—ওই মেয়েটিকে চেনেন ব্রজেশ্বরবাবু ?

কাছে এসে, শুধু কদলীকে কেন—অরুণকেও ব্রজেশ্বর চিন্‌লেন। বিস্মিতভাবে তাদের দু'জনের দিকে চেয়ে রইলেন। এ কী আশ্চর্য্য ঘটনা ! এরা এখানে এলো কি ক'রে ? অরুণের সঙ্গেই বা কদলীর সম্বন্ধ কি ?

হঠাৎ কলি উঠে দাঁড়ালো। অত্যন্ত অস্থির ভাবে, চোখ দুটো বড় ক'রে, অন্ধকারে ভূত-দেখে-ভয়-পাওয়া—লোকের মত কাঁপতে

কাঁপ্‌তে ব'লে উঠ্‌লো—না, না, ওঁকে আমি চিনি না···উনি আমার কেউ নন্‌···কেউ নন্‌···ব্যস্তভাবে ছুটে গিয়ে লীলার ঘরে ঢুক্‌লো সে।

ব্রজেশ্বরের পিঠে হাত বুলিয়ে, খুব শান্তভাবে রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—উনি কি আপনার স্ত্রী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ···

—ওঁকে ত্যাগ করেছেন কেন?

—সে অনেক কথা। শুন্‌তেই যদি চান্‌—'মোষ্ট্‌ প্রাইভেট্‌লি' বল্‌তে পারি···

—বেশ, তাই বল্‌বেন। তবে, জেনে রাখুন—এই ঘটনার সন্তোষজনক কৈফিয়তের 'পরে নির্ভর করছে—আপনার এখানকার চাকরী।

—যে আজ্ঞে— আমার কৈফিয়ৎ খুবই সন্তোষজনক হবে, আশা করি···

—তবে আর ভাবনা কি? আসুন আমার সঙ্গে···দু'এক পা অগ্রসর হয়েই রায়মশাই ফিরে দাঁড়ালেন। অরুণের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—বেলা তো প্রায় সাড়ে দশটা বাজ্‌লো অরুণ!

রায়মশাইয়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে অরুণ বল্‌লো—এখুনি রওনা হচ্ছি আমি···

কাল ছিল পূর্ণিমা-তিথি। সন্ধ্যালগ্নে বিদ্যার্থীভবনের পশ্চিম-আকাশে হ'য়েছিল সূর্য্যাস্ত, আর পূব-আকাশে চন্দ্রোদয়। আজ প্রতিপদে অরুণকে বিদায় দিয়ে, ব্রজেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে—রায়মশাই উঠ্‌লেন বকুলাসনে।

(৭)

বকুলাসনে ব'সে রায়মশাই বল্‌তে লাগ্‌লেন—শোনো ব্রজেশ্বর! এতক্ষণ তোমাকে 'আপনি' বলেছি, এখন বল্‌বো 'তুমি'—কিছু মনে করো না।

—তোমার পরিবার কদলী এখানে 'কলি' নামে পরিচিত। কলিকে আমি খুব ভালবাসি। চমৎকার মেয়েটি। কথা-প্রসঙ্গে মাথাটা একটু গোলমেলে মনে হ'লেও—কী চমৎকার স্বভাব তার। কত শান্ত ও সংযত সে। 'অসহ্য' ব'লে ত্যাগ করতে হবে—সেরূপ মাথাখারাপ মেয়ে সে মোটেই নয়। তবু তুমি তাকে কেন ত্যাগ করেছ—আমি জান্‌তে চাই···

ব্রজেশ্বর অতি স্বল্পভাষী লোক। কিন্তু আজ তিনি অত্যন্ত মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন। জীবনের একটা বিশিষ্ট অধ্যায়, এতদিন সকলের কাছে গোপন রেখেছিলেন। লজ্জা ও সঙ্কোচের বাধা অতিক্রম করে—যা' এতদিন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও বলেন নি—তা' আজ রায়মশাইকে সবিস্তারে বল্‌বার জন্যে, ব্রজেশ্বর কৃতনিশ্চয় হ'য়ে ব'স্‌লেন।

ব্রজেশ্বর বল্‌তে লাগ্‌লেন—আমাদের গাঁয়ে ছিল একটি 'কেষ্টযাত্রার' দল। কেষ্ট-ঠাকুর সাজ্‌তো গয়লাদের মিশ্‌-কালো-রংয়ের অকালপক্ক একটা ছেলে। নাম ছিল তার—কালো-মাণিক!

পাঠশালায় ব'সে, ছ'সাতবছর বয়সেই কালো-মাণিক বিড়ি-সিগারেট ফুঁকতে শিখেছিল। তারপর বারো—কি—তের-তে পৌঁছে,

'প্রমোশন' পেলো যাত্রাদলে, বিড়ির ভিতরকার তামাক বের ক'রে ফেলে—তখন সে গাঁজা ভর্‌তে আরম্ভ করলো...

কোকিলকণ্ঠ কালো-মাণিক যখন কেষ্টঠাকুর সেজে ভাবাবেশে নেচে নেচে ও গান গেয়ে—বিরহী-রাধার সঙ্গে রসিকতা করতেন্, তখন গাঁয়ের বুড়োবুড়ীরা কেঁদে ভাসাতেন। আর বয়সের মেয়েরা উঠ্‌তেন পাগল হ'য়ে। সেই পাগ্‌লামো একটু বেশী মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছিল—আপনার ওই কলির ভিতর...

শ্রীমান কলির কেষ্টকে যখন-তখন কলি ডাকিয়ে আন্‌তেন নিজের বাড়িতে। নানারকম পিঠে-পায়েস্ তৈরি ক'রে রাখ্‌তেন—ঠাকুরের সেবার জন্যে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি—সেই অসভ্য নোংরা ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে, কলি কেঁদে ভাসাচ্ছেন—আর ঘন ঘন চুমু খাচ্ছেন তার সেই ডাবা হুঁকোর মত কালো মুখে! সে দৃশ্য আমার অসহ্য বোধ হ'তো। ঝগড়া-ঝাটি করতাম। কিন্তু, কলির কেষ্ট-প্রীতি একটুও কমাতে পারতাম না।

কলির কেষ্টর বেশ-একটু হাত-দোষ ছিল। আজ—ফাউণ্টেন্‌পেন, কাল—রিষ্ট্‌ওয়াচ্, পরশু—জামার বোতাম, প্রভৃতি একে একে উধাও হ'তে লাগ্‌লো। ভয়ানক বিপদে পড়লাম। ঠাকুর আমাকে একেবারে উদ্‌বাস্ত ক'রে তুল্‌লেন। কিন্তু উপায় কি?

মা বল্‌লেন—বৌকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দে। অগত্যা তাই ক'রতে হ'লো। কিছুদিন পরে খবর পেলাম—ঠাকুরও গিয়ে জুটেছেন সেখানে। মা আর সে-বৌ ঘরে আন্‌তে রাজী হলেন না। আমাকে আর-একটি বিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। আমিও তা'তে রাজী হলাম না...

ব্রজের কেষ্ট ক্রমে মথুরার কেষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লেন। কলি ছিল তার প্রায় সাত-আট বছরের বড়। শুন্‌লাম বয়সের অসমতা-সত্ত্বেও, তারা যুগলে বেরিয়ে পড়েছেন—তীর্থ-পর্য্যটনে। তারপর, কলির আর কোনো—খোঁজখবর রাখি না আমি।

—কালো মাণিকের খোঁজ রাখো? রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্রজেশ্বর বল্‌তে লাগ্‌লেন—আজ্ঞে হাঁ, রাখি···কালো-মাণিক এখন মেসার্স কে, এল, ম্যাণিক এণ্ড কোং! গবর্ণমেন্টের রেশন-সাপ্লাই-কণ্ট্রাক্টারস্। আটা ও ময়দার সঙ্গে 'ফাইন-ষ্টোন্-ডাস্ট্' মিশিয়ে—চালের ভিতর কিছু মোটাদানার ষ্টোন্-চিপ্‌স্ ছড়িয়ে, এবং একই মাল দু'চার বার ডেলিভারী দিয়ে, অতি অল্পদিনের মধ্যেই কোটিপতি হ'য়েছেন। কলকাতায় আট-দশখানা বাড়ি কিনেছেন। পুত্রকন্যা সমন্বিতা এক বুড়ী মেমকে বিয়ে করে যীশুখৃষ্টকে ভজনা করছেন।

একটু চিন্তিতভাবে রায়মশাই বল্‌লেন—শোনো ব্রজেশ্বর! তুমি যাঁর কথা বল্‌ছো, সেই ম্যাণিক-সাহেবকে আমি চিনি। এই বিদ্যার্থী ভবনে বহুটাকা দান করেছেন তিনি। কিন্তু, সে ভদ্রলোক তো বলেন—তিনি বাঙালী নন্—সিলনীজ্! ভাঙা-ভাঙা বাংলা বল্‌তে পারেন। ইংরেজি বলেন—খুব চমৎকার!

—আজ্ঞে হাঁ, আপনি ঠিকই বল্‌ছেন। ব্রজেশ্বর বল্‌তে লাগ্‌লেন—চাকরীর খোঁজে সে-দিন আমিও মিঃ ম্যাণিকের আপীসে গিয়ে উঠেছিলাম···

—তারপর?

—চেহারা দেখে মনে হ'লো—ঠিক আমাদের সেই কালো-মাণিক! কিন্তু তার সাহেবী ঢং—আর বাংলা-বলার ভঙ্গিমা দেখে—আমার মনেও

একটু সন্দেহ হ'লো। গাঁয়ের যে-ছেলেটি এ খবরটা আমাকে দিয়েছিল—মনে হ'লো—সেও বোধ হয় চেহারা দেখে ভুল করেছে। এক-চেহারার দু'টি লোক থাকা তো অসম্ভব নয়? কিছুক্ষণ এই সন্দেহ নিয়েই ব'সে রইলাম—মেসার্স কে, এল, ম্যাণিক এণ্ড কোংএর আপীসে। হঠাৎ মিঃ ম্যাণিক উঠে গেলেন তাঁর চেম্বারে। আমাকেও বয়-মারফৎ ডেকে পাঠালেন…

আমি ঢুকবা-মাত্তর, মিঃ ম্যাণিক নিজেই দরজাটা বন্ধ করলেন। তারপর আমার হাত দু'খানা ধরে অতি কাতরভাবে বল্লেন—'আই-ও—ইউ—অ্যাপোলজি—ব্রজেশ্বরবাবু! এখানে আপনার চাকরী হতে পারে না। আমাকে মাপ্ করবেন। অতি পরিষ্কার দেশী বাংলায় বলতে লাগ্লেন—'আপনাকে একখানা হাজার টাকার চেক্ দিচ্ছি। তাই নিয়ে দেশে গিয়ে ব্যবসা করুন। চাকরী আর করবেন না…'

—চেক্টা নিলে? রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

—আজ্ঞে না। চাকরী দিলেও নিতাম না। আমি গিয়েছিলাম—একটা কৌতুহল-নিবৃত্তির জন্যে। মনের ঘৃণা মনেই চেপে—একটা ধন্যবাদ জানিয়ে—উঠে দাঁড়ালাম…

কালো-মাণিক আমার পথ-আগ্লে দাঁড়িয়ে বল্তে লাগ্লো—টাকা যে আপনি নেবেন না, তা'জানি। চাকরী করতে আসেন্নি—তাও বুঝ্তে পারছি। তবে, আমার একটা কথা বিশ্বাস করুন ব্রজেশ্বর বাবু! আপনার স্ত্রী সতীসাধ্বী! তাঁর সম্বন্ধে আপনারা যে কুৎসিৎ ধারণা করেছেন—তা' সম্পূর্ণ মিথ্যে। তিনি আমাকে ভালবাসতেন—সে ভালবাসা স্বর্গের, মর্ত্ত্যের নয়। বয়স-বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে যখন কুপ্রবৃত্তি জাগ্লো—বৃন্দাবনে প্রথম যেদিন আমি তাঁকে

কুভাবে চেয়েছিলাম, ঠিক সেইদিনই, আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন তিনি। আজ পর্য্যন্ত কোথায়ও আর খুঁজে পাইনি তাঁকে। আপনি কি কোনো খোজ রাখেন ?

আমি বল্লাম—না…

কালো-মাণিক বলতে লাগ্‌লো—যদি কখনো খুঁজে পান—আমার বিনীত অনুরোধ—কোনো অশ্রদ্ধা বা অসম্মান করবেন না তাঁকে। এ জগতে তিনি অতি দুর্লভ মেয়ে! তবে আমার বিশ্বাস—তিনি বেঁচে নেই…বেঁচে নেই…বেঁচে নেই…পকেট থেকে একখানা রুমাল বের ক'রে চোখ মুছ্‌লো সে।

—তারপর…তারপর ?

—আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি এমন চমৎকার সাহেব সেজেছ—এতবড় ধনী হয়েছে—কি উপায়ে বলো তো ?

কালো মাণিক বল্‌লো—সে অনেক কথা। আমি একজন বিজিনেস্‌ম্যান—আপীসে ব'সে অতো কথা বল্‌বার ফুরসুৎ কই আমার ? দয়া ক'রে যদি বাড়ীতে যান একদিন—আমার মেমের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেন…

—তোমার মেম্ ? অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম মুখের দিকে।

একটু হেসে কালো-মাণিক বল্‌লো—তা'হলে একটু সংক্ষেপে বলি শুনুন্। আপনার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবার পর—আমি অনেক দেশ ঘুরেছি। এক সাহেবের আর্দালীর চাকরী নিয়ে বিলেত ঘুরে এসেছি। সেই সাহেবের মেম্ আমাকে খুব ভালবাসতেন। সাহেবটি ছিলেন মাতাল ও চরিত্রহীন। প্রায়ই দু'জনে ঝগড়া-ঝাটি ও মারামারি হ'তো। একদিন হ'লো খুব বড়-রকমের এক ঝগড়া—

তারপরেই 'ডিসলিউশন্ অব্ ম্যারেজ'! সাহেব চ'লে গেলেন—আমি থাক্‌লাম মেমের কাছে। বছর খানেক বাদে—একদিন তিনি আমার হাত ধরেই চার্চ্চে গিয়ে উঠ্‌লেন। আমাদের বিয়ে হ'য়ে গেল। তারপর থেকেই হ'লো আমার ভাগ্যের সূত্রপাত······

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার বিদ্যে তো ছিল—পাঠশালার বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ। সাহেব-মেম্ চরাবার মত ইংরেজি শিখ্‌লে কোথায়?

সে খুব হেসে বল্‌লো—মেম্ বিয়ে করলে, ইংরেজি শিখ্‌তে লাগে মাত্তর একমাস, আর নাম-দস্তখৎ করতে, একদিন! তারপর কমন-সেন্স্, ইন্‌টেলিজেন্স্, আর মাষ্টারি-ওভার-ইন্‌করমেশনস্! আর কি চাই বলুন? ডুলো-গয়লার ছেলে ব'লে আপনারা আমাকে ঘৃণা করতে পারেন। কিন্তু, ভাগ্যে যদি থাকে—একদিন হয়তো স্বাধীন ভারতের 'প্রাইম-মিনিষ্টার'ও হতে পারি আমি! পুরুষের ভাগ্যের কথা কিছুই বলা যায় না। তা' হ'লে এখন······মিঃ ম্যাণিক হাত জোড় ক'রে উঠে দাঁড়ালেন।

বুঝ্‌লাম—আমাকে এবার বেরিয়ে যেতে হবে। সবিনয়ে ভদ্রভাবে বিদায়-দেবার কী চমৎকার ইঙ্গিত। কী অপূর্ব্ব 'স্মার্টনেস্' তার চলা-ফেরা আর ওঠাবসার ভিতর। এই কি সেই গয়লাদের ছেলে কালো-মাণিক? যে গাঁজা খেতো আর কেষ্টঠাকুর সেজে নেচে নেচে গান গাইত? ভাব্‌তে ভাব্‌তে বেরিয়ে এলাম······

—কলি-সম্বন্ধে কালো-মাণিকের কথা তুমি বিশ্বাস করেছ? রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, করেছি। তারপর—কলিকে আমি অনেক খুঁজেছি···

একটু চিন্তা ক'রে রায়মশাই বল্‌লেন—আচ্ছা, তা'হলে এখন এসো ব্রজেশ্বর! স্নানাহার সেরে নাওগে। বিকেলে বিশ্ববাবুর কাছ থেকে—সম্পাদক-সেরেস্তার কাজ ও কাগজপত্তর সব বুঝে নিতে হবে। আজ থেকেই তুমি এখানকার চাকরীতে বহাল হ'লে……

কলি ব্রজেশ্বরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে না। রায়মশাই অনেক অনুরোধ করেছেন—তবুও না। লীলা এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। উঠ্‌তে-বস্‌তে চব্বিশঘন্টাই কলি থাকে লীলার সঙ্গে। লীলা একদিন কলির গলাটা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লো—আচ্ছা, কলিদি! চৌধুরীমশাইকে দেখ্‌লে তুমি অমন শিউরে ওঠো কেন? কী চমৎকার লোক তিনি…

—তোর মনে ধরেছে? কলি জিজ্ঞাসা করলো।

—সত্যিই তাঁকে আমার খুব ভাল লাগে……

—যাকে দেখিস্‌—তাঁকেই তো তোর খুব ভাল লাগে। হতচ্ছাড়ি! তোকে নিয়ে তো বড্ডই মুস্কিলে পড়া গেল?……আবার মরবি নাকি? তা' হলে কি অক্রুরকে বল্‌বো—আজই ও দুষমনটাকে বিদেয় করতে?

ব্রজেশ্বর 'ফ্যামিলি কোয়াটার' পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর খাওয়া-দাওয়া চল্‌ছে ছেলেদের মেসে। কলি কিছুতেই রাজী হ'লো না, তার ঘরে গিয়ে সংসার-পাতাতে।

আজকাল মাধুরীর সঙ্গে ব্রজেশ্বরের আলাপ-পরিচয় খুব জমে উঠেছে। মাধুরী বকতে ভালবাসে। আর ব্রজেশ্বর বকুনি শুন্‌তে ভালবাসেন। তাদের দু'জনার চৌম্বক-ঘনিষ্ঠতা রায়মশাই লক্ষ্য করতে লাগ্‌লেন। প্রায়ই দেখা যায়—কোনো গাছতলায় ব'সে ব্রজেশ্বর 'হুঁ'

দিচ্ছেন আর মাধুরী হাতমুখ নেড়ে গল্প বল্ছে। কাল নাকি খুব গোপনে এক ফাঁকে ব্রজেশ্বরের রান্না-ঘরে ঢুকে, মাধুরী দুটো ডাল-ভাত বেঁধে দিয়েও এসেছে।

কলি একদিন হাস্তে হাস্তে লীলাকে বল্লো—আর দুঃখ করিস্নে লীলা! তোর চৌধুরীর ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে—আমাকে আর দরকার হবেনা তাঁর……

—কি ব্যবস্থা হ'লো? বিস্মিতভাবে লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

কলি বল্লো—মাধুরী তার শ্যামচাঁদের সন্ধান পেয়েছে—রাসেশ্বরকে চিনে ফেলেছে……

একটু চিন্তিতভাবে লীলা বল্লো—আচ্ছা কলিদি! তোমার শ্যামচাঁদ কোথায়? কা'কে তুমি শ্যামচাঁদ বলো? সে কথাটা তো আজ পর্য্যন্ত বুঝ্তে পারলাম না? একটু বুঝিয়ে দাওনা ভাই, কে তোমার শ্যামচাঁদ?

চোখ বুজে, তন্ময়ভাবে নিজের বুকটা দু'হাতে চেপে ধ'রে কলি বল্লো—আমার শ্যামচাঁদ—চির-কিশোর, চির-নবীন, চির-মধুর! বৃন্দাবনের এক সাধু-মহাপুরুষ আমাকে 'কিশোর-কিশোরী' চিনিয়ে দিয়েছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন—'কাম-গন্ধহীন কিশোরীর প্রেম—চির-আনন্দ-উৎস!'

হঠাৎ কলির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্লো! সে বল্তে লাগ্লো—এখানে এসেই তো আমার শ্যামচাঁদকে পেয়েছি লীলা! নইলে কি এতদিন থাক্তে পারতাম? কবে, কোন্ দিকে, আবার বেরিয়ে পড়তাম্ আমার শ্যামের খোঁজে! অক্রুর আমাকে বেঁধেও রাখ্তে পারতো না।

—এখানে তুমি কা'কে পেলে ? কে তোমার শ্যামচাঁদ ? বিস্মিত ভাবে লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

—কা'কেও বল্‌বি না তো ?

—না।

—ঠিক্ ?

—ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্......

—নমোশূদ্রদের সেই ছোট্টো কালো ছেলেটা! দিনের বেলায় মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে—দেখেছিস্ তাকে ? কী সুন্দর!

—সেই ক্যাব্‌লা ? অবাক্ হ'য়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলো লীলা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই 'কেবল-কৃষ্ণ'! রোজ সন্ধ্যের পর মুড়ির মোয়া বা গুড়ে-সন্দেশ নিয়ে আমি ওই ফুলবাগানে ব'সে থাকি। সে আসে, চুপি চুপি চোরের মত—বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে, ফুলগাছগুলো আড়াল ক'রে, ওই রক্ত-করবীর তলায়। আমি আত্মহারা হ'য়ে ছুটে যাই। বুকে জড়িয়ে ধরি তাকে। কত চুমু খাই তার মুখে—গালে, ঠোঁটে, কপালে! সে হাসে আর খাবার খায়। আমার বুকটা ভ'রে ওঠে। সে যখন পালিয়ে যায়—আমি একলা ব'সে কাঁদি......

কলি গাইতে লাগ্‌লো—

কিশোরী শ্রীমতী, কিশোর-কৃষ্ণে—
কত ভালবাসে, তোরা জানিস্ নে!
সে যে কী মধুর অভিসার......
রজনীগন্ধা ছড়ালো গন্ধ—
কিশোরীর প্রাণে সে কী আনন্দ!
পরাতে সে-গলে ফুল-হার।

মোর মন-চোর—কৃষ্ণ-কিশোর!
চ'লে গেল নিশি না হইতে ভোর—
কাল যদি নাহি আসে আর?
কাঁদি সারারাতি—ওগো শ্যামরায়!
মোরে যদি নাহি রাখো রাঙা পায়—
মিছে কেন বহি দেহভার?

এতদিন পরে লীলা বুঝ্‌লো—কলির মস্তিষ্ক-বিকৃতির মূল-তত্ত্ব কি? প্রৌঢ়া কলি, প্রায় বার্দ্ধক্যের সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে। তবু তার মনটি এখনো কিশোরী সেজে কৃষ্ণ-কিশোরের চিন্তায় মস্‌গুল্! যৌবনের মাদকতা বোধ হয় তার মনে কখনো দানা বাঁধেনি। প্রেমের ইতিহাস যে কত বৈচিত্র্যপূর্ণ—মানুষের ধ্যান-ধারণার অতীত কত অসম্ভব ও অসঙ্গত যে সেখানে ঘটে—মানুষ তা' কল্পনা করতেও পারে না।

নমোশূদ্র পাড়ার ক্যাব্‌লা আজ কলির 'কেবল-কৃষ্ণ'! কলির মন-প্রাণ মাতানো শ্যামচাঁদ! ওই ফুল-বাগানে নাকি হয়—সাতবছরের ছেলে ক্যাব্‌লার সঙ্গে, ছত্রিশ বছরের বুড়ী কলির গোপন-অভিসার! এও কি সম্ভব? লীলা অবাক্ হয়ে কলির মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌লো।

কলির এই ভাবাবেগকে লোকে 'মানসিক অসুস্থতা' ব'লে হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু এক-হিসাবে একে কি অতি-সুস্থতা বলা যায় না? জীবনের চাওয়া-পাওয়াকে কলি আজ কত সহজ ও সরল ক'রে ফেলেছে! কলিও কাঁদে, লীলাও কাঁদে। লীলার বুকে কত ব্যথা—চোখের জলে কত জ্বালা! কিন্তু কলির আনন্দাশ্রু তো তার বুকটাকে স্নিগ্ধ ও শীতল রেখেছে? লীলার মত—কলির বুকের আগুন তো

কলিকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করছে না? লীলার হিসাবে—লীলা অসুখী, আর কলি—পরম সুখী।

হাস্‌তে হাস্‌তে লীলা জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা কলিদি! নমোদের ছেলের মুখে চুমু খেতে—তোমার ঘৃণা হয় না?

কলিও তেমনি হেসে জবাব দিল—আমি তো তা'কে নমোশূদ্র দেখি না? দেখি—আমার কৃষ্ণ-কিশোর! আমার শ্যামচাঁদ! বুকটা যখন ভালবাসায় পুরোপুরি ভ'রে ওঠে—তখন কি সেখানে ঘৃণার কোনো ঠাঁই থাকে? মার বুক থেকে একটা ছোট্টো ছেলে যদি পচা-নর্দ্দমার ভিতর পড়ে যায়—মা কি তাকে জিভ্‌ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করতে পারে না? 'ছুঁৎনে-ছুঁৎনে'র মূলে তো শুধু ভালবাসার অভাব ছাড়া আর কিছু নেই লীলা! ভালবাসা বুকের ব্যাকুলতা—মাথার ঘাম নয়।

হাস্‌তে হাস্‌তে লীলা বললো—কলিদি! তুমি এক দিন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করো। তোমার ওই কথাক'টা তাঁকেও ব'লে এসো···

বিস্মিতভাবে কলি জিজ্ঞাসা করলো—গান্ধীটা আবার কে?

—মহাত্মা গান্ধীর নাম শোনো নি? লীলা খুব হাস্‌তে লাগ্‌লো···

এমন সময় রায়মশাই এসে বললেন—লীলা! তোমার জিনিষ-পত্তর সব গুছিয়ে নাও—এক্ষুনি কল্‌কাতায় রওনা হতে হ'বে···

—কেন? কেন? উৎকণ্ঠিত ভাবে লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

—জেল-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তরুণ অনশন-সত্যাগ্রহ করেছিল—প্রায় পনরো দিন। অরুণ জানিয়েছে···সরকার তাকে মুক্তি দিয়েছেন··

—এখন তিনি আছেন কোথায়?

—তোমাদের বাড়িতেই এসে উঠেছেন।

—আমি কি একাই রওনা হবো ?

—পারবে ?

—কেন পারবো না ?

বেশ, তা'হলে এসো। এ দিক্কার সব ঠিক-ঠাক্ করে দু'এক দিনের ভিতরেই আমি গিয়ে পৌছাবো। মাধুরীকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।

কলি জিজ্ঞাসা করলো—সে কি যাবে ?

—তার মানে ? সন্ধানী-দৃষ্টিতে রায়মশাই কলির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

—মাধুরী বোধহয় এখানেই থাকৃতে চায়···

—এখানে কারো থাকা, বা এখান থেকে কারো যাওয়া—সম্পূর্ণ ভাবেই নির্ভর করে আমার মতামতের উপর···বলেই রায়মশাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হাস্‌তে হাস্‌তে কলি বল্‌লো—মাধুরী মরেছে···

—তুমি যা' বল্‌লে, তা' যদি সত্যি হয়—তা'হলে তো তার মরাই উচিত! খুব গম্ভীর ভাবে লীলা বল্‌লো।

—তোরা বড্ড প্রাণহীন! কলি বল্‌তে লাগ্‌লো। মাধুরীর কথা সবই তো জানিস্ লীলা? স্বামী থাকৃতেও—বেচারা বিধবা। জীবনে তো কা'কেও ভালবাসে নি বা কারো ভালবাসা পায় নি সে? বুকটা আজীবন খালি রাখ্‌তে কি কোনো মেয়ে পারে? বিধবার বুকে স্বামীর স্মৃতির একটা দাগ থাকে। মাধুরীর কি আছে? কি নিয়ে সে ভুলে থাকবে? তার খালি-বুকে শ্যামের বাঁশী তো বাজ্‌বেই!

লীলা এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল। কলির কোনো কথাই ঢুক্‌ছিল না তার কানের ভিতর। হঠাৎ সে বলে উঠ্‌লো—লক্ষের কত দেরি

তা'তো বুঝ্‌তে পারছি নে? যাই—একবার আপীস থেকে জেনে আসি...মনটা বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছে কলিদি! কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। তুমি ব'সো, আমি এখুনি আস্‌ছি...

লীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কলি একটু হাস্‌লো। মনে মনে বল্‌লো—নিজের মনের অস্থিরতা বেশ বোঝো—পরের কেন বোঝো না লীলা?

বাইরে বেরিয়ে লীলা দেখ্‌লো—ব্রজেশ্বর চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন—এক গাছ-তলায়। লীলা তাঁর কাছে গিয়ে একটু হেসে বল্‌লো—যান্ না ওই ঘরের ভিতর, কলিদি এখন একলাই আছে...

ব্রজেশ্বর বল্‌লেন—আপনি চ'লে এলেন—আমি তো ভেবেছিলাম, আপনার সামনেই একবার দেখা করবো...

—না, না, না। আপনি একলাই যান্—এখন তার মেজাজটাও বেশ ভাল আছে। বল্‌তে বল্‌তে লীলা চ'লে গেল।

ব্রজেশ্বর আজ ক'দিন ধ'রে চেষ্টা করছেন—কলির সঙ্গে একান্তে একবার দেখা করতে। কিন্তু কোনো সুযোগ পাচ্ছেন না। কলি সব সময়ই লীলার আঁড়ালে থাকে। আজ ব্রজেশ্বর প্রস্তুত হ'য়ে এসেছিলেন—লীলার সাম্‌নেই দেখা করবেন।

ব্রজেশ্বর বারান্দায় উঠে দরজা ধরে দাঁড়াতেই কলি চম্‌কে উঠ্‌লো—চোখ রাঙিয়ে চিৎকার ক'রে বল্‌লো—কেন এসেছ এখানে?

—মাত্তর একটা কথা তোমাকে বল্‌তে এসেছি...

—ওই দরজায় দাঁড়িয়ে বলো, ভিতরে ঢুকোনা।

ব্রজেশ্বর সস্নেহে বল্‌লেন—কলি, আমি বিশ্বাস করেছি—তুমি নিষ্পাপ!

—তুমি কি বিশ্বাস করেছ, তা' জানবার জন্যে আমি অস্থির হ'য়ে উঠি নি তো? আমি জানি—আমি কি…

মাথাটা নীচু ক'রে মেঝের দিকে চেয়ে ব্রজেশ্বর বললেন—মা আমাকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। গাঁয়ের একটি মেয়েকেও পছন্দ করেছিলেন। শুধু তোমার কথা ভেবেই রাজী হইনি আমি…

—ভুল করেছিলে। একটা জানলা-পথে বাইরের দিকে চেয়ে কলি বললো।

—আমার উপর কি কোনো মমতা নেই তোমার?

কলি রেগে উঠলো। আবার চোখ রাঙিয়ে ধমক দিয়ে বললো—মাত্তর একটা কথা বলবে ব'লেছিলে—বহু কথা বলেছ। এখন যাও…

—আমাকে কি ক্ষমা করবে না তুমি?

একটু বিদ্রূপের সুরে কলি বললো—তুমি যা' চাও তা'তো পেয়েছ? কেন আর বিরক্ত করতে এসেছ আমাকে? ওগো—যাও, যাও, এখন যাও বলছি…

—কি চাই? কি পেয়েছি? বলো, তবে যাবো…

কলি উত্তেজিত ভাবে বললো—তুমি চাও—নৃ-সিংহ মূর্ত্তি ধ'রে, যে-কোনো একটি মেয়ের বুকটা চিরে রক্তমাথা হাতে হাততালি দিতে! আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে, লোক-সমাজে বাহাদুরী নিতে! বেচারা মাধুরী তো বুকটা পেতে দিয়েছে? তবু আবার আমার কাছে এসেছ কেন? যাও যাও, সরে পড়ো…আমি মাধুরীর মত বোকাও নই—ছেলেমানুষও নই!

ব্রজেশ্বর ঘরে ঢুকে কলির হাতখানা চেপে ধ'রলেন। কাতর ভাবে

অনুনয়ের সুরে বললেন—তোমাকে স্পর্শ করে বলছি কলি! তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি চাই না, বা আর কাউকে ভালবাসি না···

কলির মুখের ভাব অতি হিংস্র হ'য়ে উঠলো—চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুতে লাগলো। তার মাথাটা যে সত্যিই একটু বিকৃত হ'য়েছিল—হঠাৎ একটা অত্যাহিত-কিছু করা, তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না—একথা ব্রজেশ্বর ঠিক বুঝতে পারেন নি। আর বেশী-কিছু বুঝবার সময় না দিয়ে কলি তাঁর হাতখানাকে দাঁতে ও নখে ছিঁড়ে—ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ফেললো! রক্তাক্ত হাতখানা নিয়ে ব্রজেশ্বর তখন পালিয়ে বাঁচলেন। কলকাতায় যাবার সময়—লীলাও এ ঘটনা জেনে গেল।

লঞ্চে উঠে লীলা যখন গাড়ী ধরবার জন্যে নিকবর্ত্তী রেলওয়ে-ষ্টেশনে নাবলো, তখন হঠাৎ দেখলো সেই 'লিচু-চোর' কানাইও তার পিছনে পিছনে নাবছে।

—তুমি কোথায় যাচ্ছ কানাই?

—আপনার সঙ্গে কলকাতায়··

—আমার সঙ্গে—মানে?

—আপনিই যদি চ'লে এলেন—ওখানে আর-কি থাকলো বলুন তো? সে দিন অরুণবাবু চলে গেলেন। আজ আপনিও চলে এলেন। বুড়ো দাদু এখন পাটের গুদোম করুক ওখানে···

—বুড়োদাদু বা হেডমাষ্টারকে জানিয়ে এসেছ?

—জানলে কি আসতে দিতো?

—তোমার সঙ্গে টাকা-পয়সা আছে?

—টাকা-পয়সা কোথায় পাব?

—তা'হলে কি ক'রে যাবে কলকাতায়?

—তিনটে ঘড়ি এনেছি। একটা দিয়েছি—লঞ্চের মালিককে। একটা দেব—রেলের গার্ড-সাহেবকে। আর একটা হাতে বেঁধে ক'লকাতা-সহরে ঘুরে বেড়াবো···

—কী সর্ব্বনাশ! তিনটে ঘড়ি তুমি পেলে কোথায়? লীলা বিস্মিতভাবে চেয়ে থাক্‌লো কানাইয়ের মুখের দিকে...

কানাই বল্‌তে লাগ্‌লো—একটা বুড়ো দাদুর। একটা খিট্‌খিটে মাষ্টারের। আর একটা ব্রজেশ্বরবাবুর। দাদুর আর মাষ্টারের ঘড়িদু'টো ভাল নয়। বেজায় ভারি ও বড়। জামায় বেঁধে পকেটে রাখ্‌তে হয়। কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবুরটা খুব চমৎকার—ছোটো—হাতে বেঁধে রাখা যায়। দেখ্‌বেন? পুট্‌লীর ভিতর থেকে, রিষ্টওয়াচটা বের ক'রে হাতে বাঁধ্‌লো···

টিকিটের ঘণ্টা বাজ্‌লো। গাড়ী আস্‌বার আর দেরি নেই। কানাইকে লীলা বল্‌লো—বুড়োদাদুর ঘড়িটা দাও তো কানাই! গার্ডকে না-দিয়ে, ষ্টেশানমাষ্টারকে দিলে, তোমার-আমার দুজনার টিকিটই পেয়ে যাবো···

পুট্‌লীর ভিতর থেকে—খুব বড়ো সেকেলে একটা পকেট-ওয়াচ বের ক'রে কানাই দিল লীলাকে। ঘড়িটা সুট্‌কেসে রেখে, কানাইয়ের জন্যে একখানা ইন্‌টার-হাফ্‌ ও নিজের জন্যে একখানা ফুল-টিকেট লীলা কিনে আন্‌লো—নগত টাকা দিয়ে।

গাড়ী এসে পড়লো। ছোট ষ্টেশান। ষ্টপেজ্‌ মাত্র এক মিনিট। লীলা ভেবেছিল মেয়ে-গাড়ীতে উঠ্‌বে, কিন্তু কানাইকে সঙ্গী পেয়ে—পুরুষ-গাড়ীতেই উঠে ব'স্‌লো। সুটকেস্‌ ও বেডিং প্রভৃতি তুলে দিল একটা কুলী।

গাড়ীতে ভিড় ছিল না। খুব বড় কম্‌পার্টমেন্ট। কিন্তু প্যাসেঞ্জার মাত্র দশ-বারো জন। কেউ পড়ছেন খবরের কাগজ, কেউবা নভেল, কেউবা বিছানা পেতে হাতপা-ছড়িয়ে আরামে ঘুমুচ্ছেন। একটা জান্‌লার ধারে ব'সে কানাইয়ের সঙ্গে খুব গল্প জুড়ে দিল লীলা।

লীলা বল্‌লো—আচ্ছা কানাই! লিচু-চুরির পর তুমি তো বলেছিলে—আর কখ্‌খনো চুরি করবে না?

কানাই বল্‌লো—করিনি তো! আজ যখন চ'লেই এলাম—তখন এই চুরিই তো হ'লো—আমার ওখানকার শেষ-চুরি! আর তো ফিরে যাবো না ওখানে?

—সত্যি বলো তো কানাই! ওখান থেকে চ'লে এলে কেন? লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

সদম্ভে কানাই বল্‌লো—কখ্‌খনো মিছে কথা বলি না আমি। সত্যিই বল্‌ছি—আপনি চ'লে আস্‌ছেন—শুনেই আমার মেজাজ্‌ খারাপ হ'য়ে গেল। ওখানে কে আছে? বুড়োদাদু বকুলগাছে উঠে ব'সে থাকে। খিট্‌খিটে মাষ্টার বেত হাতে ঘুরে বেড়ায়। তার সঙ্গে জুটেছে—প্যাঁচা-মুখো ব্রজেশ্বর! সত্যিই বল্‌ছি দিদিমণি! শুধু আপনাকে ছাড়া—ওখানে আর কাউকে আমার ভাল লাগে না।

—কেন, মাধুরী আর কলিদি তো আছে ওখানে?

—মাধুরীদি মাথায় থাকুন! হাতজুটো মাথায় ঠেকিয়ে, কানাই বল্‌তে লাগ্‌লো—তাঁর কাজ হচ্ছে—আমরা কে-কোথায় কোন্‌-দোষটি করলাম—কে-কতক্ষণ পড়াশুনো করলাম বা না-করলাম—এই সব খুঁজে বেড়ানো. আর খুব গোপনে খিট্‌খিটে মাষ্টারের কাছে গিয়ে

লাগানো। তারপর—কলিদি? ওরে বাপ্ রে সে তো এক জানোয়ার! যে-কাণ্ড সে করেছে...

—কি করেছে? লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

—আপনি কি তা, জেনে আসেন নি?

—কি বলো তো?

—ক্ষেপে গেলে তিনি যে মানুষ কাম্ড়ান্!

—কা'কে কাম্ড়ালেন্? লীলা হাসতে লাগ্লো।

—ব্রজেশ্বর বাবুর হাতখানা, এমন ক'রে কাম্ড়ে রক্তারক্তি ক'রে দিয়েছেন যে—ছ'মাস তাকে আর বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে হবে না। তাইতো ভয় হলো···কি জানি···যদি আমাকেও একদিন···

—তোমাকেও কাম্ড়াবেন মনে করো? কেন? লীলা বিস্মিত ভাবে চেয়ে রইলো—কানাইয়ের মুখের দিকে।

কানাই চোখ দুটো বড় ক'রে বল্লো—সে দিন যা' দেখেছি—ওরে বাপ্ রে! তা'তেই তো ভয় হয়েছে আমার...

—কি দেখেছ? লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

কানাই চুপিচুপি শঙ্কিতভাবে বল্‌তে লাগ্‌লো—সন্ধ্যের পর, অন্ধকারে···ফুলবাগানে ব'সে···ক্যাব্‌লাকে···উঃ! ভাব্‌লে এখনো আমার গায়ের রোঁয়া কাঁটা হ'য়ে ওঠে—বেচারা ক্যাব্‌লা বেঁচে আছে কিনা, তাই বা কে জানে?

কানাই কি বল্‌তে চায়—লীলা বুঝ্‌লো। সে-সম্বন্ধে তাকে আর কোনো প্রশ্ন না-ক'রে—লীলা চুপ্‌টি ক'রে ব'সে থাক্‌লো, বাইরের দিকে চেয়ে। চোখের উপর দিয়ে—সবুজ গাছ-পালা, ফাঁকা মাঠ—ধানের ক্ষেত—গরীবের ভাঙাকুঁড়ে, বড়লোকের দালান-কোঠা—কত-কি

সাজানো ছবির মত ভেসে চলেছিল—লীলার সে দিকে কোনো খেয়াল ছিল না। সে ভাব্‌ছিল কলির কথা। কী অদ্ভুত মেয়ে সে··· নেহাৎ মাথা-খারাপ ব'লেও তো মনে হয় না তাকে!

ব্রজেশ্বরের হাতখানা বিষাক্ত হ'য়ে ফুলে উঠেছে! তার সঙ্গে বিরামহীন জ্বর চল্‌ছে। বন্দরের ডাক্তার এসে মন্তব্য করেছেন—প্রাণের কোনো আশঙ্কা নেই—তবে ভুগ্‌তে হবে কিছু দিন! মাধুরী অক্লান্ত ভাবে সেবা-শুশ্রূষা করছে তাঁর।

রায়মশাই কলিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন তুমি এমন কাজ করলে?

—কেন সে আমার গায়ে হাত দিয়েছিল? কলি জবাব দিল।

রায়মশাই বল্‌লেন—সে তোমার স্বামী!

—স্বামী? কলি খুব হাস্‌তে লাগ্‌লো···

রায়মশাই লক্ষ্য করলেন—সে হাসির মধ্যে মানসিক সুস্থতার পরিচয় ছিল না। হঠাৎ তাঁকে আরও বেশী বিস্ময়াবিষ্ট ক'রে কলি নেচে নেচে গাইতে লাগ্‌লো···

আমার স্বামী নাচে
নূপুর বেঁধে পায়,
আমার বুকের তালে
চোখের দু'পাতায়।
বাজায় যখন বাঁশী—
আমার কান্নাহাসি,
পাগল করে মোরে—
মনের নিরালায়।

আমার স্বামী কালো
অন্ধকারের আলো!
দেখ্‌তে লাগে ভালো
—সবাই তা'কে চায়।

একটু উত্তেজিত ভাবে ধমক দিয়ে রায়মশাই বল্লেন—শোনো কলি! এখানে যদি থাকতে চাও—ব্রজেশ্বরের কাছে তোমাকে ক্ষমা-প্রার্থনা করতে হবে। তাকে স্বামী ব'লে মান্‌তে হবে। নিজের খোস্‌-খেয়ালের উচ্ছৃঙ্খলতা চল্‌বে না এখানে···

—চল্‌বে না?

—না।

—বেশ, তা'হলে আমি আসি—প্রণাম···কলি রওনা হ'লো। পিছনে পিছনে কিছুদূর গিয়ে রায়মশাই ডাক্‌লেন—কলি, শোনো···

—না গো না, আর দরকার নেই—অক্রুরঠাকুর! তোমাকে আমি চিনেছি···

কলি চ'লে গেল।

(৮)

গাড়ী যখন শিয়ালদা এসে পৌছালো, তখন তিনটে দশ। একটা কুলীর মাথায় জিনিষ-পত্তর সব চাপিয়ে দিয়ে—কানাইয়ের হাত ধ'রে লীলা এসে উঠ্‌লো একটা ট্যাক্সিতে।

ট্যাক্সি যখন ছাড়্‌বে—তখন হঠাৎ লীলা দেখ্‌লো—কানাইয়ের অন্য হাতে একটা ছোট স্যুট্‌কেস্! কী সর্ব্বনাশ! কানাই এসেছে—একখানা গামছায়-বাঁধা পুটলী নিয়ে। ও-স্যুটকেস্ সে পেলো কোথায়? কার স্যুট্‌কেস্ হাতে বাধিয়ে ষ্টেশানের বাইরে চ'লে এলো?

তীব্রদৃষ্টিতে কানাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে, লীলা জিজ্ঞাসা করলো—ও-স্যুট্‌কেস্ তুমি কোথায় পেলে কানাই?

—চলুন, বাসায় গিয়ে বল্‌বো···

—না, এখানেই বল্‌তে হবে। বলো—ও-স্যুট্‌কেস্ কার?

—তা'রা চ'লে গেছে···

—কতক্ষণ গেছে, কোন্ দিকে গেছে, শীগ্‌গীর বলো। নইলে, ওই স্যুট্‌কেসের সঙ্গে তোমাকেও আমি পুলীশে 'হ্যাণ্ড্‌ওভার' করবো···

পুলীশের কথা শুনে কানাই খুব ভীত হয়ে পড়লো। মুখটা আঁধার ক'রে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্‌লো—ওই যে সাদা মোটর-খানা যাচ্ছে—ওদের স্যুট্‌কেস্!

লীলার ড্রাইভার ছিল একজন বাঙালী। লীলা ও কানাইয়ের আলোচনা শুনেই সে ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পেরেছিল। তার দিকে চেয়ে

কাতরভাবে লীলা বল্‌লো—বাবা! ওই যে সাদা গাড়ীখানা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল—ওকে ধরতে পারবে?

—নিশ্চয়ই পারবো মা! বলেই ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। গেট দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে, সে দেখ্‌লো—গাড়ীখানা ছুটছে সারকুলার রোড্ বেয়ে শ্যামবাজারের দিকে। সেও ছুটলো পিছনে পিছনে। লীলার ট্যাক্সির রং কালো। কালোগাড়ীর গতিভঙ্গী, আর, মাঝে মাঝে জান্‌লা-পথে মুখ-বাড়িয়ে লীলার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ লক্ষ্য ক'রে—সাদা গাড়ীর সন্দেহ হয়েছিল—নিশ্চয়ই কালোর উদ্দেশ্য—সাদাকে ধরা। কিন্তু কেন?

সুটকেস্ যাঁর, তিনি বোধ হয় এখনো ষ্টেসানে আছেন। কানাই ভুল দেখেছিল ও ভুল বুঝেছিল। সাদা গাড়ীর চড়নদার একজন ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক ও তার মেম্। তাঁরা ভারতে নূতন এসেছেন—কোনো ব্যব্‌সা-সূত্রে। ভারতবাসীদের সম্বন্ধে খুব ভাল-ধারণা নিয়ে আসেন নি। বিশেষত বাঙ্‌লার মেয়ে-পুরুষ মাত্রেই 'এনার্কিষ্ট' এবং সাদা-চাম্‌ড়ার উপর ভয়ানক বিদ্বিষ্ট—এ ধারণা তাঁদের মনে বদ্ধমূল ছিল।

বহুক্ষণ ধরাধরির পাল্লা চালিয়ে—মাণিকতলা বাজারের কাছে এসে দু'খানা গাড়ীই থেমে পড়লো।

সাহেব একটা রিভল্‌বার বাগিয়ে ধ'রে—কালো গাড়ীর বাঙালী-ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন—হোয়াই ডু ইউ ফলো মি?

দরজা খুলে বাইরে এসে, সুটকেস্‌টা সাহেবের সাম্‌নে ধ'রে লীলা বল্‌লো—প্লিজ্ টেক্ ইট্…

—হোয়াই? সাহেবের বোধ হয় ধারণা হয়েছিল—সেই ছোট-

সুটকেস্‌টার ভিতর নিশ্চয়ই 'টাইম্‌-বম্ব' আছে। তাই, রিভলবারটা লীলার দিকেও উঁচু ক'রে ধরেছিলেন তিনি···

লীলা বল্‌লো—ইউ লেক্‌ টু ইট—অ্যাট্‌ শিয়ালদা-ষ্টেশান ··

—নো—সারটেন্‌লি নট্‌···ষ্টার্ট! সাদাগাড়ীর নেপালী-ড্রাইভার গাড়ী ছুটিয়ে দিল।

লীলা অপ্রস্তুত ভাবে নিজের গাড়ীতে উঠে বস্‌লো। তার গন্তব্য বালীগঞ্জের দিকে। অকারণে উল্‌টো দিকে এতটা পথ ছুটতে হয়েছে। কানাইয়ের উপর লীলার বিরক্তির সীমা ছিল না। বিস্থার্থী ভবনের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলিকে সে অত্যন্ত ভালবাস্‌তো। বিশেষত যারা যত বেশী দুষ্টু, লীলার ভালবাসা তাদের প্রতি তত বেশী ছিল। অত্যন্ত দুঃখিতভাবে লীলা বল্‌লো—কানাই তুমি চুরিও করলে, মিছে-কথাও বল্‌লে?

কানাই কেঁদে ফেল্‌লো। লীলার পা-ছুঁয়ে বল্‌লো—না, না, আমি চুরিও করিনি—মিছে কথাও বলিনি। সুটকেস্‌টা ওই মেয়ের পায়ের কাছে ছিল। ওরা না-নিয়ে চ'লে গেল দেখে—আমি নিয়ে এসেছি···

কানাইকে সঙ্গে নিয়ে, লীলা যখন বালীগঞ্জের বাড়িতে এসে পৌঁছালো—তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা। বাড়ীতে লীলার দূর-সম্পর্কের কোনো আত্মীয় স্বামী-স্ত্রী ভাড়াটে ছিলেন। তাঁদের কাছে খোঁজ নিয়ে লীলা জান্‌লো—তরুণকে দোতলা ছেড়ে দিয়ে, একতলায় নেবেছেন তাঁরা। দু'এক দিনের ভিতর অন্য বাড়িতে উঠে যাবেন।

কানাইকে তাদের কাছে রেখে, লীলা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখ্‌লো—তরুণ চোখবুজে

বিছানায় পড়ে আছে—যেন প্রাণহীন! রক্তের অভাবে মুখের রং একেবারে কাগজের মত সাদা!

একজন ডাক্তার অরুণের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে তরুণের শরীরে 'ইন্‌জেক্‌ট্' করছিলেন। আর একজন শিওরে ব'সে তার 'পাল্‌স্' দেখ্‌ছিলেন।

তরুণের স্বাস্থ্যের অবস্থা যে এত ভয়ানক—তা' লীলা কল্পনা করেনি। মাত্র কয়েকদিন উপবাসী থাকবার ফলে, সে যে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে—এ সংবাদে লীলা খুব খুসী হ'য়েই কলকাতায় আস্‌ছিল। স্বাস্থ্যটা যদি একটু খারাপ হয়েই থাকে—দু'চার দিনের সেবা-যত্নে লীলা তা' শুধ্‌রে নিতে পারবে। কিন্তু এ কী ভয়ানক অবস্থা! লীলার বুকটা টিপ্ টিপ্ করতে লাগ্‌লো—পা দু'টো কাঁপ্‌ছিল। দরজাটা ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

একটি নার্স তরুণের পথ্য তৈরি করছিল। সে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলো—আপনিই কি মিসেস্ ব্যানার্জ্জি?

—হ্যাঁ……

—ভিতরে আসুন……এই মাত্তর আমরা টেলিগ্রাম পেয়েছি, আপনি আস্‌ছেন……

লীলা রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে রায়মশাই 'তার' করেছেন, পৌঁছো সংবাদটাও জান্‌তে চেয়েছেন তারে। রক্ত-দেওয়া হ'য়ে গেলে, অরুণ বল্‌লো—তরুণ! লীলা এসেছে……

তরুণ এতক্ষণ চোখ বুজে ছিল। চোখ্‌টা খুলে একবার লীলার দিকে চেয়ে, আবার চোখ বুজ্‌লো। অরুণ কিন্তু এ পর্য্যন্ত একবারও

লীলার দিকে চায়নি—বা একটা কথাও বলেনি তার সঙ্গে। লীলা যে এসেছে—তা' সে বুঝ্‌তে পেরেছিল নার্সের কথা শুনে।

—তা'হলে আমিও এখন আসি তরুণ! ডাক্তার-বন্ধুদের সঙ্গে অরুণও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে এসে নার্স জিজ্ঞাসা করলো—আজ রাত্রেও কি আমাকে থাকতে হবে অরুণবাবু?

একটু হেসে অরুণ বললো—আমাকে আর কেন? সে-কথাটা জিজ্ঞেস্ করুন—মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে……বলেই সে দুম্ দুম্ করে সিঁড়ি বেয়ে নেবে গেল।

লীলা চুপ করে বসেছিল তরুণের পায়ের কাছে। নার্স এসে কথাটা তাকেও জিজ্ঞাসা করলো। লীলা বললো—আমি তো পেসেন্টের বিষয়ে কিছুই জানিনা, আপনি না-থাকলে চলবে কি করে?

নার্স একটু মিষ্টি হেসে বললো—আপনি যেন বড্ড ভীত হ'য়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে? তরুণবাবুর তো বিশেষ কোনো অসুখ নয়। খানিকটা রক্ত দিতে হবে—আর নিয়মিত পথ্য-চালিয়ে দুর্ব্বলতাটা দূর করতে হবে। আমার মনে হয় তা' আপনিই পারবেন……

তরুণ বললো—হ্যাঁ—পারবেন বৈকি! আপনি এখন আসুন—নমস্কার……

—নমস্কার! নার্স চ'লে গেল।

একটু শঙ্কিতভাবে লীলা বললো—নার্সকে বিদায় দিলে?

চোখ বুজেই তরুণ বললো—পার নাইট্ ওঁর দাবী কত জানো? টোয়েনটি! ওঁদের হাসিও যত মিষ্টি—দাবীও তত কড়া।

—কিন্তু ডাক্তার। পথ্যের কি ব্যবস্থা দিয়েছেন—তা'তো আমি জানিনা...

—এই কাগজে সবই লেখা আছে—পড়ে দেখো......বালিশের তলা থেকে একখানা কাগজ বের ক'রে, লীলার হাতে দিল তরুণ। লীলা কাগজখানা দেখ্‌ছিল। হঠাৎ সে পাশ-দিয়ে লক্ষ্য করলো —তরুণ হাস্‌ছে......

—হাস্‌ছো কেন? লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

—অরুণ তোমার সঙ্গে একটা কথাও বল্‌লো না?

—আমিও তো বলিনি......

—হ্যাঁ, তা'ও লক্ষ্য করেছি......তরুণ অপলক চোখে চেয়ে রইলো লীলার মুখের দিকে। সত্যিই, লীলা কী অপূর্ব্ব সুন্দরী! চোখের পাতার ধার দিয়ে সুবিন্যস্ত কেশগুলি, আর তুলি-দিয়ে-আঁকা ভুরু দুটি—যেন ভ্রমর-কালো মণিদুটিকেই আবেশ-মধুর-চাহনি দিয়ে স্নেহসিক্ত করে তুলেছে!

—আমার মুখের দিকে ওভাবে চেয়ে আছ কেন? লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

তরুণ বল্‌লো—তোমার অসুখ তো বেশ সেরে গেছে দেখ্‌ছি...... গালদুটো যেন আগের চেয়েও বেশী রাঙা হয়ে উঠেছে।

—আমার যে অসুখ করেছিল, সে কথা তোমাকে কে বল্‌লে? অরুণ বাবু?

—না।

—তবে?

—যেই বলুক—একটা বছর যে হতভাগা তোমার সঙ্গ-সুখ লাভ

ক'রে ধন্য হলো—তা'কে হঠাৎ ওভাবে তিরস্কার ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া কি উচিত হ'য়েছিল?

—সঙ্গ-সুখ মানে? লীলার চোখ-মুখ অসম্ভব রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো। সে বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলো তরুণের মুখের দিকে···

—লোকে তো জান্‌তো তোমরা স্বামী-স্ত্রী? তুমি বা অরুণ, কেউ কি তার কোনো প্রতিবাদ করেছ? বোধ হয় করোনি?

—আমি করেছি—অরুণবাবু করেন নি,...

—যাক্ গে···তা'তে যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে—সেকথা আমি বল্‌ছি না। আমি বল্‌ছি—শেষ-কালে সেরূপ ভয়ানক ট্রাজেডি-অভিনয় না-করলেই বোধ হয় ভাল করতে। অরুণ আমার বন্ধু। আজও সে আমাকে শরীরের রক্ত দিয়ে বাঁচাচ্ছে···

—রক্ত, বোধ হয় তাঁর চেয়ে আমার শরীরে কিছু কম নেই! প্রয়োজন হ'লে—আমার শেষ রক্ত-বিন্দু পর্য্যন্ত আমি দেব! তিনি তা' দেবেন কি?

তরুণ একটু হেসে বল্‌লো—উপস্থিত টাকা দেবে কে? ওই ড্রয়ার থেকে তোমার পাশবইখানা বের ক'রে দেখেছি। আর আছে মোটে 'হান্‌ড্রেড্ এণ্ড্ টোয়েন্টি! একটা উইক্—ডাক্তার ও পথ্য চল্‌তে পারে। তারপর? বাবাকে চিঠি লিখেছিলাম। মা জবাব দিয়েছেন—'একটি পয়সাও দেবার উপায় নেই'। সাম্‌নের মাসে আমার বোনের নাকি বিয়ে। কিছু সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। তুমি আমাকে ভালবাসো। আমার সহস্র দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও আমার মত পতি-পরমগুরুকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চাও, তা'ও জানি। কিন্তু অরুণের সাহায্য ছাড়া তা' আজ কি ক'রে সম্ভব হবে লীলা?

লীলার চোখ দিয়ে যেন এক ঝলক্ আগুন ছুটে বেরিয়ে গেল। ঘাড়টা একটু বাঁকিয়ে শক্ত হ'য়ে ব'সে সে বল্লো—পথে পথে ভিক্ষে করবো—তবু অরুণবাবুর কাছে কোনো সাহায্য চাইবো না—একথা তুমি নিশ্চয় জেনো!

—চমৎকার! তরুণ হাস্‌তে লাগ্‌লো। টপ্‌টপ্ ক'রে লীলার চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল ঝ'রে পড়লো।

কানাই এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বল্লো—বড্ড খিদে পেয়েছে দিদিমণি!

—নীচেয় যাও—আমি আস্‌ছি···

—ও ছেলেটি আবার কে? তরুণ জিজ্ঞাসা করলো।

লীলা বল্লো—কাউকে কিছু না-জানিয়ে খুব গোপনে পালিয়ে এসেছিলাম। তবু ওই দুষ্টু ছেলেটার হাত-এড়াতে পারি নি। সঙ্গে না এসেই ছাড়লো না···

—হ্যাঁ, সে কথাও শুনেছি লীলা! তরুণ বল্‌তে লাগ্‌লো—বিদ্যার্থী-ভবনের ছেলেমেয়েরা কেন, ও দেশের মেয়ে-পুরুষ, বুড়োবুড়ী সবাই নাকি 'লীলা' বল্‌তে একেবারে অজ্ঞান! তোমাকে একটু দেখ্‌তে পেলেও তারা চোখ দুটোকে সার্থক মনে করেছে। শুধু রূপ নয়—লীলা! ইউ হ্যাভ্ গট্ সাম্ ম্যাগ্‌নেটিক্ চারম্‌স্!

—তবু তো তোমার কাছে হার মেনেছি?

—তা বটে···তরুণ খুব হাস্‌তে লাগ্‌লো।

বিস্মিতভাবে লীলা জিজ্ঞাসা করলো—সত্যি বলোতো, সেখানকার সব খবর তুমি কি ভাবে—কার কাছ থেকে জান্‌লে?

তরুণ হেসে বল্লো—গত একটি বছর তোমাদের সেখানে আমার একটি 'স্পাই' ছিল···

—কে সে ?

—জানতে চেয়ো না লীলা ! তার অনুরোধেই নামটা অপ্রকাশ রাখ্‌বো···

লীলা চিন্তিতভাবে নীচেয় নেবে গেল। ভাড়াটেদের চাকরকে দিয়ে খাবার আনিয়ে কানাইকে খেতে দিল। তারপর বাথ্‌রুমে ঢুকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিজের বেশভূষা পরিবর্ত্তন ক'রে ফেল্‌লো। এলোচুলে, ফিরোজা রংয়ের একখানা শাড়ী পরে, শিশির-ধোয়া ফুটন্ত গোলাপের মত স্নিগ্ধ ও সতেজ চেহারায় আবার সে তরুণের কাছে ফিরে এলো।

দরজা ডিঙিয়ে লীলা যেই ঘরে পা দিয়েছে—অমনি তরুণ ব'লে উঠলো—দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও···

—কেন ? বিস্মিত ভাবে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো লীলা।

তরুণ বল্‌লো—ওই 'স্কাই-লাইট্‌টা' তোমার মুখের উপর পড়েছে ! কী বিউটিফুল্‌ দেখাচ্ছে তোমাকে—বাঃ ! বাঃ ! বাঃ ! অ্যান্‌জেলিক্‌···

—যাও ! ভুরু দুটো কুঁচ্‌কে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে—লীলা ঘরে ঢুকে পড়লো। তারপর এককোণে একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে 'স্কোয়া' তৈরি করতে লাগ্‌লো। ধীরে ধীরে তা'র চোখ দুটো জলে ভরে উঠ্‌লো।

মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে চোখ-মুছ্‌তে দেখে তরুণ জিজ্ঞাসা করলো —তুমি কাঁদছো কেন লীলা ?

—বল্‌বো ? দুঃখিত হবে না ?

—না বল্‌লেই দুঃখিত হবো···

—মনে হয় আমার রূপকে অতি নির্ম্মমভাবে পরিহাস করো তুমি ! সত্যি কি না বলো ?

—ম্লানমুখে একটু হেসে তরুণ বল্লো—ইয়েস্, আই প্লিড্ গিল্টি! তোমার মুখের দিকে চাইলেই আমার কি মনে হয় শুনবে লীলা? অরুণ তোমাকে এ জীবনে ভুলবে না, বা ভুলতে পারবে না। তুমি যদি একটু 'লেস্ বিউটিফুল্' হ'তে তা'হলে বোধ হয় সুখী হ'তে পারতে...

একটা ফিডিং কাপ তরুণের মুখের কাছে ধ'রে লীলা বলতে লাগলো —আমি কি সুখী হ'তে চেয়েছি? একটু সুস্থ হ'য়ে আবার যখুনি তুমি জেলে যেতে চাইবে—মালা-চন্দনে সাজিয়ে দেব তোমাকে। এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল্‌বো না। আমার একটি মাত্র অনুরোধ —অরুণবাবু-সম্বন্ধে কোনো কথা বলো না আমাকে...

একটা তোয়ালে দিয়ে তরুণের মুখটা মুছিয়ে, আর আঁচল দিয়ে নিজের চোখদুটো মুছে—লীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কানাইয়ের আনা সেই স্যুটকেস্‌টা নিয়ে লীলা পড়েছিল মহাদুর্ভাবনায় মধ্যে! আস্‌বার সময় পথে ভেবেছিল—কালই খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন ছেপে দেবে। হঠাৎ মনে হ'লো— স্যুটকেস্‌টা একবার খুলে দেখ্‌তেই বা দোষ কি? ভিতরে কাগজপত্র যাই কেন থাকুক না—জিনিষটা যে কার তা' নিশ্চয়ই বোঝা যাবে? স্যুটকেস্ নিয়ে সে দোতলার আর-একটা ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলো।

অনেকগুলো চাবি দিয়ে চেষ্টা করতে করতে—হঠাৎ খুলে গেল স্যুটকেস্‌টা। ভিতরে দেখ্‌লো—একদিকে একতাড়া চিঠি, আর কতকগুলি প্রসাধন-সামগ্রী—পাউডার, স্নো, রুজ্, লিপ্‌ষ্টিক্, পেন্‌সিল, সাবান এসেন্স প্রভৃতি। অন্যদিকে খুব পাতলা-কাঠের উপর রঙিন ছবি-

আঁকা একটা ফ্যান্সী-বাক্‌সো। সেটা ভর্ত্তি শুধু—দশটাকা আর পাঁচ-টাকা-নোটে!

বহুক্ষণ গালে-হাত-রেখে চুপ্ করে ব'সে রইলো লীলা। তারপর নোটগুলি গুন্‌তে আরম্ভ করলো। মাত্র পাঁচটাকা কম—আড়াই হাজার টাকা!

কয়েকখানা চিঠি পড়ে লীলা বুঝ্‌লো—সুট্‌কেস্‌টি বাংলার কোনো বিখ্যাত ফিলম্-ষ্টারের। ছবির পর্দ্দায় সুন্দরী অভিনেত্রীর রূপ দেখে যে সব পুরুষ-পতঙ্গ পুড়ে মরবার জন্যে দরখাস্ত পেশ করেছেন—চিঠিগুলি তাঁদেরই লেখা।

কেউ লিখেছেন—'ছবিতে ভেসে ওঠে আপনার নিখুঁৎ-সৌন্দর্য্যের ছায়া-রূপ! ছায়া—প্রাণহীন। শুধু চোখের তৃপ্তি! কায়া কৈ? প্রাণ চায়—প্রাণের স্পন্দন। তাই এ জীবনে একবার মাত্র আপনার সান্নিধ্য প্রার্থনা করি...ইতি মুগ্ধ দর্শক—শ্রীঅমুক...

কোনো কোটিপতির ওয়ারেশ জানিয়েছেন—'আপনার মত সুন্দরীকে জীবন-সঙ্গিনী ক'রে ধন্য হ'তে চাই।' ইতি—কোটিপতি অমুকের পুত্র শ্রীঅমুক · লক্ষপতি...

কোনো সুকবি ও সুসাহিত্যিক করেছেন—অনবদ্য রূপের বর্ণনা ও বন্দনা। উচ্ছ্বসিত ভাষায়, অসংযত ভাবাভিব্যক্তি! ভাষার ভিতর দিয়ে—দুর্ব্বলের সবলতার অভিনয়—পড়তে পড়তে লীলা খুব হাস্‌তে লাগ্‌লো।

হঠাৎ লীলা চম্‌কে উঠ্‌লো! একি! একি! এ যে অরুণের লেখা! অরুণের হাতের লেখা ও দস্তখৎ চিনে ফেলেছে সে। কিন্তু কি লিখেছে অরুণ? চোখের উপর অক্ষরগুলো যেন কেঁপে উঠ্‌লো—

একটার সঙ্গে আর-একটা জড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ মাথাটা চেপে ধ'রে চোখবুঁজে ব'সে থাকলো সে। তারপর ধীরে ধীরে চিঠিখানা পড়তে লাগ্‌লো—

অরুণ লিখেছে—"পাপিষ্ঠা শোভা! রূপের অহঙ্কারে ও কুলোকের পরামর্শে সিনেমায় নেবেছ। নাম-পরিবর্ত্তনও করেছ। রূপ বেচে বহুটাকার মালিক হবে—বহুলোকের মনোরঞ্জন করবে—তাও স্বীকার করছি।"

"কিন্তু, লীলা তোমার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী। সে তো কোনো দিন পারবে না তোমার মত নির্লজ্জ-ভাবে ছবির পরদায় নাব্‌তে? তুমি লিখেছ-'লীলা এখন পরস্ত্রী। সে-আর কখ্‌নো তোমার হবে না।' না হ'লেও—লীলা—লীলা। আর তুমি—তুমি। লীলাকে আমি ভালবাসি আর তোমাকে করি ঘৃণা।"

"এখনো লীলা আমার চোখের তৃপ্তি! মনের আনন্দ! আর তুমি? না—থাক্—আর কিছু লিখ্‌বো না। তুমি আর কখ্‌নো কোনো চিঠি লিখোনা আমাকে। তোমাকে আমি আগেও ঘৃণা করতাম, এখনো ঘৃণা করি—আগের চেয়ে অনেক বেশী!" ইতি তোমার অরুণদা।

অরুণের চিঠিতে লীলা যা' দেখ্‌বে আশা করেছিল—তা দেখ্‌লো না। যা' দেখ্‌লো, তা'তে সুখী হ'তেও পারলো না। অরুণ যদি একটা সিনেমা-আর্টিষ্টের ভালবাসায় হাবুডুবু খেতো, এই চিঠিতে যদি অরুণ-চরিত্রের এমন একটা দিক্ উদ্‌ঘাটিত হতো, যা' তরুণেরও অজ্ঞাত —তাহলে নিশ্চয়ই লীলা পারতো চিঠিখানাকে নিজের 'জয়পত্র' হিসাবে ব্যবহার করতে। তরুণ এখনো অরুণেরই উকিল-বন্ধু! এ চিঠি তরুণের

হাতে পড়লে, লীলার মোকর্দ্দমা যে আরো দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না তার।

অরুণ লিখেছে—এখনো সে লীলাকে ভালবাসে। এখনো লীলা তার চোখের তৃপ্তি! মনের আনন্দ! কিন্তু কেন? কোন্ অধিকারে অরুণ এখনো লীলাকে ভালবাস্‌বে? এ কী অসহ্য চিঠি!

পরের দিন ভাড়াটেরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। কানাইকে নিয়ে লীলা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করলো—তার ছোট সংসারটি আবার গুছিয়ে নিতে। তরুণের সেবাশুশ্রূষার জন্যে নিযুক্ত করলো একজন নার্স।

তরুণ বিস্মিতভাবে বল্‌লো—আবার নার্স?

—একলা আমি পেরে উঠ্‌বো কেন? তোমার অযত্ন হবে যে…

—কিন্তু টাকা?

—সে-জন্যে কিচ্ছু ভেবনা তুমি…

ডাক্তার-বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে, বিকেলে অরুণ এলো—তরুণকে রক্ত দিতে। অস্ত্রপাতি শোধন ক'রে ডাক্তার তৈরি হয়েছেন—এমন সময় লীলা এসে একটা নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—আমার রক্ত নিতে কি কোনো আপত্তি আছে?

ডাক্তার বল্‌লেন—আপত্তির কি কারণ থাক্‌তে পারে? ইউ লুক্ সো হেল্‌দি! ইওর ব্লাড্ সিম্‌স্ টু বি ভেরি রিচ্! কি বলো অরুণ? মিসেস্ ব্যানার্জ্জির রক্তে তোমার চেয়েও বেশী 'রেড-কর্‌পাস্‌লস্' আছে ব'লে মনে হচ্ছে না কি?

লীলার দিকে না-চেয়েই মাথা নেড়ে অরুণ বল্‌লো—ইয়েস্… আন্-ডাউটেড্‌লি!

ডাক্তার সোৎসাহে বললেন—তা'হলে আসুন মিসেস্ ব্যানার্জ্জি! বসুন এখানে—উই আর রেডি···

লীলা বস্‌লো একটা চেয়ারে। সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে ডাক্তার অরুণকে বললেন—তুমি এসে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির হাতখানা একটু ধরবে? ইউ অরুণ! শুন্‌ছো...

অন্যমনস্কতার অভিনয় ক'রে অন্যদিকে চেয়ে ছিল অরুণ। লীলার চোখমুখ ঈষৎ লালাভ হ'য়ে উঠ্‌লো। সে বল্‌লো—আমার হাত আমি নিজেই ধরেছি—আপনি রক্ত নিন্···লীলার মুখের দিকে চেয়ে তরুণ একটু হাস্‌লো।

রক্ত-দেওয়া শেষ হ'য়ে গেলে—ব্যাগ্‌টা গুছিয়ে নিতে নিতে ডাক্তার বল্‌লেন—আর বোধ হয় আমাকে আস্‌তে হবে না তরুণবাবু! একদিনেই আপনার আশ্চর্য্য উন্নতি দেখ্‌ছি। এ বিউটিফুল ওয়াইফ্ হেল্পস্ এ পেসেণ্ট বেটার দ্যান্ এ ডজন্ অব্ ব্লাডি-ডক্‌টরস্! গুড্ নাইট্—গুড্ নাইট্—লেডিজ্ এণ্ড্ জেণ্টেলমেন্······ডাক্তার চলে গেলেন।

পকেট থেকে দশটাকার কুড়িখানা নোট্ বের ক'রে অরুণ দিল তরুণের হাতে। নোটগুলো লীলার দিকে এগিয়ে ধ'রে তরুণ বল্‌লো—এই নাও লীলা! অরুণকে আমি দুশো টাকা আন্‌তে বলেছিলাম···

লীলা বল্‌লো—ফিরিয়ে দাও, আর দরকার হবে না। এ ক'দিন অরুণবাবু তোমাকে কত দিয়েছেন—বলো—তা'ও দিয়ে দিচ্ছি ওঁকে···

—বটে? বিস্মিতভাবে তরুণ বল্‌তে লাগ্‌লো—তুমি কি অরুণের সঙ্গে আমার দেনা-পাওনা চুকিয়ে ফেল্‌তে বল্‌ছো? কিন্তু, তুমি তো জানো না লীলা! অরুণের ব্যাগে টাকা না-থাক্‌লে—অরুণ আমার

ব্যাগ্—থেকে নিয়েছে। আমার ব্যাগে না-থাকলে—আমি নিয়েছি অরুণের ব্যাগ্ থেকে। আমরা কোনো রসিদপত্র আদান-প্রদান করিনি বা জমা-খরচও রাখিনি। এই ভাবে হিসাব-নিকাশের জের না-টেনেই, চলে এসেছি আজকের তারিখ পর্য্যন্ত। আমাদের পাষ্ট্-একাউন্ট অডিট্ না-করে—উপস্থিত এই দুশো টাকা তুমি নেবে কিনা, তাই বলো?

একটু ঝাঁঝালো স্বরে লীলা বল্লো—শুধু এই টাকা নেবো-না বললেই—আমার বক্তব্য তো শেষ হবে না? পাষ্ট্-একাউন্ট অডিট্ করতে না-দাও, করবো না। কিন্তু প্রেজেন্ট-একাউন্ট্-সম্বন্ধে তোমাকে একটু সাবধান হ'তে হবে…

—তার মানে? বিস্মিতভাবে তরুণ চেয়ে রইলো লীলার মুখের দিকে…

একটু হেসে লীলা বল্লো—বর্ত্তমান বিজিনেসে তোমার একজন 'পার্টনার' আমি। লাভ-লোকসানের দায়িত্ব শুধু তোমার নয়—আমারও!

অরুণ ব'সেছিল—মাথাটা একটু নীচু করে। তার দিকে মুখ-ফিরিয়ে তরুণ বল্লো—শুন্লি অরুণ! লীলা কি বলে? তা'হলে কি আমাদের আগেকার বিজিনেস্ এখানেই ক্লোজড্? কী মুস্কিল! কিন্তু লীলা! অতি বাল্যকাল থেকে আমাদের এই পার্টনারশিপ্ চ'লে আস্ছে। আর্ ইউ—নট্ এ 'কমন পার্টনার' টু বোথ্ অব্ আস্—আনডার দি সারকাম্স্ট্যান্সেস্?

চোখমুখ একটু রাঙিয়ে তুলে লীলা বল্লো—আমি যে-দিন মাঝখানে

এসে দাঁড়িয়েছি—সেই দিনই 'ডিজল্‌বড্‌' হ'য়ে গেছে—তোমাদের সে-পার্টনারশিপ্‌!

স্বামী-স্ত্রীর এ রসিকতা অরুণের ভাল লাগ্‌ছিল না। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লো—আমার হাতে টাকা ছিল না তরুণ! এ টাকা আমি এনেছি হাওলাত ক'রে। সত্যিই যদি দরকার না-থাকে, দিয়ে দে—নিয়ে যাই···

—আচ্ছা নিয়ে যা। লীলা যখন বল্‌ছে দরকার নেই, তখন নিশ্চয়ই দরকার নেই। হ্যাঁ, ভাল কথা—আমার সে প্রুফ্‌ পাচ্ছি কবে?

—কাল। বলেই অরুণ টাকা নিয়ে চলে গেল।

—কিসের প্রুফ্‌? লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

—জেলে ব'সে 'তরুণের স্বপ্ন' নামে একখানা উপন্যাস লিখেছি। অরুণ তা' ছাপ্‌বার ভার নিয়েছে···

—আমাকে একবার দেখালে না?

—ছেপে বেরিয়ে এলে, তুমি তো দেখ্‌বে—আয়নায় মুখ! আমার 'তরুণের স্বপ্নের' নায়িকা তুমি—আর নায়ক অরুণ!

লীলা চম্‌কে উঠ্‌লো! 'নায়ক অরুণ' মানে?

তরুণ হাস্‌তে লাগ্‌লো। নায়িকা হলেই যে নায়ককে প্রাণাধিক ভালবাস্‌তে হবে—একথা তোমাকে কে বল্‌লে? নায়ক ও নায়িকা ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বী! দেখা-হ'লেই ফিউরিয়াস্‌! আস্তিন গুটিয়ে বক্‌সিং চালাতে উদ্যত! এমন উপন্যাস কি পড়ো নি কখনো?

একটু অভিমানের সুরে লীলা বল্‌লো—প্রেসে দেবার আগে বইখানা আমাকে একবার দেখালে বোধহয় খুব বেশী ক্ষতি হ'তো না। তোমার লেখা-পড়তে আমি কত ভালবাসি···

তরুণ বল্‌লো—শেষের দিকটা তো এখনো লেখাই হয়নি! একটু সুস্থ হয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে লিখ্‌বো ভাব্‌ছি···

—ধন্যবাদ! ব'লে লীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নার্স এসে তরুণকে ফলের রস খাওয়াতে ব'স্‌লো···

পাঁচ দিন পরে রাত-দশটার সময় এসে রায়মশাই কড়া নাড়্‌লেন। লীলা দরজা খুলে দিল। ফ্যান্‌টা খুলে রায়মশাই বাইরের ঘরে বস্‌লেন। তরুণ ভাল আছে শুনে, খুব খুসী হলেন।

লীলা জিজ্ঞাসা করলো—মাধুরী কই?

—তাকে আনিনি···

—কেন?

—ব্রজেশ্বর এখনো সুস্থ হয়নি...

—কলি দি কেমন আছে?

—হাঁসপাতালে রেখে এলাম তাকে···

—কেন, কেন? কি হয়েছে তার? উৎকণ্ঠিতভাবে লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

একটা হাই তুলে রায়মশাই বল্‌লেন—এখনো আফিং খাওয়া হয়নি। আগে এক গ্লাস জল এনে দাও দিদিমণি! একটু সুস্থ হ'য়ে সব কথাই খুলে বল্‌ছি···

লীলা ছুটে গিয়ে জল আন্‌লো। আফিং খেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রায়মশাই বল্‌তে লাগ্‌লেন—একটা বড় ভয়ানক অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি দিদিমণি! এখনো অনুতাপে বুক জ্বলে যাচ্ছে—কেন এমন দুর্ব্বুদ্ধি হ'লো আমার। মেয়েটা এখন বাঁচ্‌বে কি না-বাঁচবে, ভগবান জানেন···

দারুণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে লীলা বল্‌লো—কি হয়েছে বলুন না ?

কাঁধের গামছাটা দিয়ে চোখমুখ মুছে রায়মশাই বলতে লাগ্‌লেন—ব্রজেশ্বরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল ব'লে কলিকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। দু'তিন দিন আশ্রমের চারিদিকে ঘুরে বেড়ালো সে। কত ডাকাডাকি করলাম—কিছুতেই ফিরে এলো না। শেষে হঠাৎ একদিন নমোশূদ্রদের একটা ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

—ছেলেটার নাম বোধ হয় ক্যাব্‌লা ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক্যাব্‌লা ! তুমি তা' জান্‌লে কি ক'রে ?

—কলিদির অনেক কথাই আমি জানি। বলুন—তারপর ?

—নমোরা ক্ষেপে উঠ্‌লো। লাঠি-ঠ্যাঙা নিয়ে বেরুলো ছেলেটার খোঁজে ! নমোশূদ্র-পাড়া থেকে প্রায় সাত-আট-মাইল দূরে গিয়ে দেখ্‌লো—মাঠের ভিতর এক বটগাছ তলায় ক্যাব্‌লাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে ঘুমুচ্ছে সে !

—তারপর—তারপর ?

—ক্যাব্‌লাকে কেড়ে নিয়ে, অতি নির্ম্মমভাবে কলিকে মারতে আরম্ভ করলো তারা। কেউ বলে—ও ডাইনী। কেউ বলে—ও রাক্ষসী ! কে-নাকি কবে দেখেছে—ছোট্টো একটা বাচ্চা-ছেলেকে হাড়মাস-সমেত চিবিয়ে-চিবিয়ে খেতে !

—কী সর্ব্বনাশ ! তারপর কি হ'লো ?

—কি আর হবে ? রায়মশাই চোখদু'টো মুছে বল্‌তে লাগ্‌লেন—মারের চোটে, কলির পাঁজ্‌ড়ার দুটো হাড়—দুখানা হাত—আর একটা পা ভেঙে গেছে—মাথা ফেটে অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে। খবর পেয়ে আমি ছুটে গেলাম সেখানে। পাল্‌কী ক'রে তা'কে ষ্টেশানে

নিয়ে এসে, একটা কম্পার্টমেন্ট্ রিজার্ভ করলাম। তারপর কল্‌কাতায় পৌঁছে, মেডিক্যাল-কলেজে ভর্ত্তি করে দিয়েছি। আমি আর কি কর্‌তে পারি বলো?

লীলার দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগ্‌লো। রুদ্ধ আবেগে ব'লে উঠ্‌লো—ঠাকুরদা! কাল থেকে আর সূর্য্য উঠ্‌বে না—এ পাপের পৃথিবী অন্ধকারেই ডুবে থাক্‌বে!

...কেঁদনা লীলা! আরো একটা মজার খবর বলি—শোনো—চোখ মুছে রায়মশাই বল্‌তে লাগলেন—মিঃ ম্যানিক নামে এই কল্‌কাতার একজন কোটিপতি-খৃষ্টান কলিকে চিন্‌তেন। সে-কথাটি আমি শুনেছিলাম—ব্রজেশ্বরের কাছে। হাঁসপাতালে কলিকে রেখেই আমি দেখা কর্‌তে গেলাম তাঁর সঙ্গে। কলির দুরবস্থার কথা শুনে, পাঁচবছরের শিশুর মত হঠাৎ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লেন তিনি। তারপর, গ্যারেজ থেকে গাড়ী বের ক'রে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলেন—মেডিক্যাল-কলেজের দিকে। ফোনে ফোনে ডাকাডাকি ক'রে, কল্‌কাতার সমস্ত বড় বড় ডাক্তারকে হাজির করলেন সেখানে। পথে আমাকে বলেছিলেন—লাখটাকা ব্যয় করেও যদি কলির জীবনটা পাওয়া যায়—সে চেষ্টা করবেন তিনি।

—কে তিনি? বিস্মিতভাবে রায়মশাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো লীলা।

রায়মশাই বল্‌লেন—ব্রজেশ্বরের কাছে শুনেছি—ওই ক্যাব্‌লার মত তাঁকে নিয়েও নাকি কলি একদিন পালিয়েছিল। মিঃ ম্যাণিক-সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে, তা' তোমাকে পরে বল্‌বো। আরো—একটা আশ্চর্য্য কথা শোনো লীলা! কলির একটুও জ্ঞান-লোপ হয় নি।

যদিও অত্যন্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, ভাঙা-হাতপা নাড়্‌তে-চাড়্‌তে পারছে না, তবুও বলছে— তার শরীরে কোনো ব্যথা নেই—কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা নেই! শ্যামচাঁদ নাকি তার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন···

লীলা বললো—একথা সে বলতে পারে—আমি বিশ্বাস করি। তার বুকটা শুধু ভালবাসায় ভরা।

রায়মশাই বললেন—আমার সন্দেহ হচ্ছে—কলি মানুষ কি না? কী আশ্চর্য্য! মিঃ ম্যাণিক যখন তার শয্যাপাশে নতজানু হয়ে বসলেন, তখন সে মিঃ ম্যাণিকের মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলো। তারপর গুণগুণ করে গাইতে লাগলো—

তুমি, রাজা হ'য়ে বসেছ মথুরা-ধামে—
কুব্‌জা-দাসী রাণী হ'য়ে বসেছে শ্যাম-বামে!
বলি, সে-সব কথা কি মনে পড়ে না?

আমি তো সে গান শুনে অবাক্! ঝরঝর ক'রে মিঃ ম্যাণিকের দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগ্‌লো···

আমি বললাম—কলি! তোমার যদি কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা থাকে, বলো—তোমার তৃপ্তির জন্যে মিঃ ম্যাণিক্ বহুটাকা ব্যয় করতে প্রস্তুত। তুমি যদি না-বাঁচো—তোমার স্মৃতিরক্ষার জন্যে···

কলি রেগে উঠ্‌লো—কেন আমি বাঁচবো না? তোমার মাথায় একটাও কালো চুল নেই, তবু তুমি বেঁচে থাক্‌বে, আর আমি মরে যাবো? বাঃ কী মজার কথা! তোমার ছেরাদ্দ না-খেয়ে আমি কিছুতেই মরবো না···গলাটা শুকিয়ে গেছে একটু জল···

একটি নার্স জল দিল। কলি আবার বলতে লাগলো—উনি খৃষ্টেন

হয়েছেন—অনেক টাকার মালিক হয়েছেন তা' আমি জানি। ওঁর কুব্‌জী-মেয়েকেও একদিন দেখে এসেছি খুব গোপনে। আমার তৃপ্তির জন্যে যদি উনি কোনো টাকা ব্যয় করতে চান্—তাহ'লে আজই যেন হাজার হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন সেই নমোশূদ্র-পাড়ায়। যারা আমাকে মেরেছে—তাদের কারো যেন কোন অভাব না-থাকে। কোনো দিন তারা যেন কোনো কষ্ট না পায়···কলির চোখ দুটো সজল হ'য়ে উঠ্‌লো!

প্রতিবাদ জানিয়ে আমি বল্‌লাম—সে কি কথা কলি? তারা যে ভয়ানক অন্যায়কারী! আমরা তো মনে করেছি—পুলিশের সাহায্যে তাদের সবাইকে আদালতে হাজির করবো···

কলি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—কেন? কী অপরাধ তাদের? তোমরা যত বামুন-কায়েত—ছুঁসনে ছুঁসনে ক'রে, কেন তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছ বলো তো? আমার শ্যামচাঁদের আদালতে তোমাদেরি তো হবে ফাঁসি! বল্‌তে লজ্জা করছে না যে—তাদের খুব কঠোর শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করবে?

একটা ঢোক্ গিলে, শুকিয়ে-ওঠা জিভটাকে একটু সরস ক'রে নিয়ে কলি বল্‌তে লাগ্‌লো—আহাহা! বেচারাদের কত কষ্ট! ঘরের চালে খড় নেই—বর্ষার জলে ভেজে। অভাবের তাড়নায় থালা-ঘটি-বাটি সব বেচে খেয়েছে। এখন ভাত খায়, পাতা কেটে। আর জল খায়—মাটির ভাঁড়ে। শীতের দিনেও একখানা ছেঁড়া-গামছা গায়ে জড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে···

মিঃ ম্যাণিকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে থেকে কলি আবার বল্‌তে লাগ্‌লো—তুমি কোটিপতি! তাই তোমার পায়ে

জামা, গায়ে জামা, জামার উপর জামা, তার উপর জামা! বাহার বাড়াবার জন্যে—গলায় একটা রং-বে-রংয়ের ধড়াও বেঁধেছ! গাড়ীতে গাড়ীতে ঘোরো, রোদ-বিষ্টির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তবু মাথায় পরেছ টুপী! লজ্জা করছেনা তোমার? টাকার মালিক হয়েছ ব'লে—বাহার! বাহার! বাহার! বল্‌তে বল্‌তে কলি আবার গান গাইতে লাগ্‌লো—

বলি, ও মথুরার রাজা!
তোমার, সে-সব কথা কি মনে পড়েনা?
এক ঘটি জল মুড়ির মোয়া,
আঁচল পেতে মাঠে শোয়া—
ভেবে, আজ কি চোখে জল ঝরে না?
আমার বুকে শীতের দিনে—
কাঁপতে গায়ের কাপড় বিনে!
জানি, তেম্‌নি আদর কেউ করে না।

কলির চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগ্‌লো। রুমাল দিয়ে চোখ দু'টো চেপে ধ'রে—মিঃ ম্যানিক বাইরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাদের নমোশূদ্র পাড়ায় কত ঘর চাষী বাস করে?

আমি বল্‌লাম—পঁচিশ-ত্রিশ ঘর…

মিঃ ম্যানিক বল্‌লেন—আপনাকে আমি ত্রিশহাজার টাকার একখানা চেক্ দেবো। এ কাজের ভার আপনাকেই নিতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে নমোদের কারো যেন কোনো অভাব না থাকে। তারপর দুটো পুকুর, একটা দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটা পাঠশালা

তৈরী করতে—মোট কত টাকা লাগবে—একটা এষ্টিমেট্ পাঠাবেন আমাকে...

—আচ্ছা, আজ তা' হ'লে আসি—ব'লেই আমি চ'লে এসেছি···

—কাল আবার যাবেন তো ?

—নিশ্চয়ই···

—আমিও সঙ্গে যাবো। কলিদিকে একবার দেখে আস্‌বো···

সেই বাইরের ঘরের খাটের একপাশে ঘুমিয়ে ছিল কানাই। সামান্য একটু দুধ-মিষ্টি খেয়ে—রায়মশাইও সেখানে ঘুমিয়ে রইলেন, কানাইকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে।

ভোরের দিকে ঘুম-ভেঙে কানাই দেখ্‌লো—তার চোখের সাম্‌নে ধব্‌ধবে-সাদা-চুলে-ছাওয়া একখানা—অসম্ভব চওড়া বুক! মাথাটা উচু ক'রে মুখের দিকে চেয়ে—কানাইয়ের মুখ শুকিয়ে গেল। কী সর্ব্বনাশ! এ যে বুড়ো-দাদু! বুড়ো দাদুটা আবার এখানে এলো কি করে? একি বিদ্যার্থী-ভবন? না কলকাতায় লীলাদির বাড়ি? কানাইয়ের মাথার ভিতর সব গুলিয়ে যাচ্ছিল।

কানাই ভাব্‌ছিল—উঠে পালিয়ে যাই! কিন্তু কি ক'রে পালাবে? বুড়োদাদুর একখানা হাত ছিল তার গায়ের উপর দিয়ে চাপানো। হাতখানা সরাতে গেলেই তো বুড়োর ঘুম ভেঙে যাবে! কানাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লো।

ঘুম ভেঙে রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—কাঁদছিস্ কেন কানাই?

কানাই কোনো কথা বল্‌লো না।

—আমাকে কিছু না-জানিয়ে কলকাতায় পালিয়ে এলি কেন? বল্···বল্ কেন পালিয়ে এলি? কথা বলছিস্ না যে?

—দিদিমণি ওখান থেকে চলে আস্‌ছেন শুনে—আমার মনটা অস্থির হ'য়ে উঠেছিল—কাঁদতে কাঁদতে কানাই বল্‌লো।

—হুঁ—কিন্তু ঘড়ি তিন্‌টে কি করেছিস্?

বেগতিক দেখে কানাই একটু আইনজ্ঞ সাজ্‌তে চেষ্টা করলো—ঘড়ি-তিনটে যে আমিই নিয়েছি তার প্রমাণ কি? কেউ কি সাক্ষী আছে? কেউ কি দেখেছে—আমাকে নিতে? আমি যখন চুরি করি—তখন তো সেখানে কেউ ছিল না? যদি কেউ বলে—আমাকে চুরি করতে দেখেছে—তা'হলে নিশ্চয়ই সে মিছে-কথা বল্‌ছে···

হাস্‌তে হাস্‌তে লীলা এসে বল্‌লো—হাতমুখ ধুয়ে জপ্‌টা সেরে নিন্ ঠাকুরদা! চায়ের জল চাপিয়েছি। এই নিন্ আপনার ঘড়ি। সাতটা প্রায় বাজে··

খুব গম্ভীরভাবে রায়মশাই বল্‌লেন—আচ্ছা দিদিমণি! কলকাতায় এনে কানাইকে কি ল'-কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছ? এমন চমৎকার 'আরগুমেণ্ট্' করতে শিখ্‌লো কোথায়? কানাই একজন মস্ত ব্যারিষ্টার হবে। নিজের কেস্ নিজেই জবাই করতে পারবে। বিরুদ্ধপক্ষের কোন উকিল দরকার হবে না।

—কানাইকে এইবারটি ক্ষমা করুন—অনুনয়ের সুরে লীলা বল্‌লো।

—সারারাত বুকে জড়িয়ে ধ'রে শুয়েছিলাম—আর কি ভাবে ক্ষমা করবো? কিন্তু···আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে দিদিমণি!

—কি?

—হয়তো আবার কবে শুন্‌বো—তুমিও আমার তরুণ-ভায়ার হাতটা কামড়ে দিয়ে, কানাইকে নিয়ে উধাও হয়েছ! কলির জন্যে মিঃ ম্যাণিক লাখটাকা ব্যয় করছেন। তোমার জন্যে অরুণ কিছু ব্যয়

করবে বটে! খুব বেশী করলেও পাঁচশো কি ছ'শো! তার বেশী তো পেরে উঠ্‌বে না?

—যান্‌, আপনি বড্ড খোঁচা দিয়ে কথা বলেন···

—ছেলেদের বেতমারা যায়, কানমলা যায়, হাত পা বেঁধে সর্ব্বাঙ্গে বিছুটি-লাগানো যায়—কিন্তু মেয়েদের বেলায় ওই-একটু কথার খোঁচা ছাড়া—কড়া-শাস্তির আর কি ব্যবস্থা আছে, বলো?

রায়মশাই প্রাত-কৃত্যের তাগিদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কানাই ছুটে এসে লীলার পা'দুখানা জড়িয়ে ধরলো। কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লো—দিদিমণি! সুটকেসের কথাটা যেন বুড়োদাদু জান্‌তে না পারে···

—না, না, সে কথা কাউকে বল্‌বো না আমি। তুই নিজেই যেন ব'লে ফেলিস্‌নে···খুব সাবধান! লীলা বল্‌লো।

—আমি? মরে গেলেও বল্‌বো না। তেমন ছেলে আমি নই—হ্যাঁ···আমার নাম কানাই!

কানাই জানেনা যে সুট্‌কেসের জোরেই লীলা তার জিদ্‌ বজায় রাখ্‌ছে। অরুণের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করছে। ফিলম্‌-ষ্টারের এই দেনা—সে একদিন সুদে-আসলে শোধ করবে। তেমন সুদিন ভগবান তাকে নিশ্চয়ই দেবেন। এই ভরসাতে নিজেকে সে সাধু মনে করলেও অতি ঘৃণিত একটা চোর মাঝে মাঝে তার মনের ভিতর উঁকি দিচ্ছিল।

(৯)

বিল্ববাবু একজন সুসাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত। যদিও আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনো সাহিত্য-সৃষ্টি করেননি তিনি, তবু তার সম্ভাবনার কথাই নিজে প্রচার করে থাকেন। খুব শীগগীরই তাঁর-লেখা এমন একখানা উপন্যাস নাকি বাজারে বেরুবে—যা' বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যে আন্‌বে যুগান্তর। শরৎচন্দ্রও হ'য়ে যাবেন ব্যাক্-ভেট্!

বেশভূষার পারিপাট্য নিয়ে, তিনি যে-কোনো সাহিত্যিক-বৈঠকের মাঝখানে গিয়ে বস্‌তেন—'মধ্যমণির' মত।

কিছুদিন পরে সবাই যখন জিজ্ঞাসু হ'য়ে উঠ্‌লো—'বিল্ববাবুর সে-উপন্যাসখানা কতদূর?' তখন তিনি প্রেসের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সম্বন্ধে বক্তৃতা সুরু করলেন—প্রেস-ম্যান ও কম্পোজিটরদের গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন। কোন্ প্রেসে তাঁর বই ছাপা হচ্ছে—সে কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলেও বল্‌তেন না।

একদিন এইরূপ এক সাহিত্যিক-বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন একজন প্রেসের মালিক। বিল্ববাবুর প্রেস-নিন্দা শুনে, হঠাৎ তাঁর মেজাজ্ খারাপ হয়ে গেল। টেবিল-চাপ্‌ড়ে চিৎকার ক'রে বল্‌লেন তিনি—নিয়ে আসুন্ মশাই! আপনার উপন্যাস। যত বড় উপন্যাসই হোক্—মাত্তর এক উইকের ভিতর ছেপে দেবো আমি। আর একদিনও শুনেছি—প্রেসকে আপনি গালাগালি দিচ্ছেন। আমার মনে হচ্ছে—আপনি কোনো উপন্যাস লেখেননি—উপন্যাস লিখ্‌তে আপনি জানেন না। আপনি একজন বোগাস্-সাহিত্যিক!

বিল্ববাবু জানতেন না—এ বনে বাঘ আছে! তবুও উপস্থিত নাক-কান বাঁচাবার চেষ্টায় উষ্ণ-প্রেসমালিকের সঙ্গে একটা আপোষ-রফা ক'রে ফেল্‌লেন। কালই বইখানা তাঁর প্রেসে দিয়ে আস্‌বার প্রতিশ্রুতি দিলেন—আর, তার সঙ্গে আগাম পাঁচশো টাকার একখানা চেক্…

পরদিন থেকেই বিল্ববাবু খবরের কাগজের 'ওয়ান্‌টেড্' খুঁজতে আরম্ভ করলেন। মাস-খানেকের ভিতর আর কোনো সাহিত্যিক-আসরে হাজির না হ'য়ে—একদিন গিয়ে হাজির হলেন, কলকাতার বাইরে—বিদ্যার্থী-ভবনে।

বছরখানেক সেখানে ছিলেন ভালো। বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম্মও করছিলেন। হঠাৎ আবার দৈব-বিড়ম্বনা আরম্ভ হ'লো—কয়েকটি মহিলার শুভাগমনে।

স্ত্রীলোক দেখ্‌লেই যে সব পুরুষ-পুঙ্গবদের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে, কলকাতায় তাঁরা বিশেষভাবে ধরা পড়েননা, তার অনেক কারণ আছে। কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে এইসব ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ মাত্রেই দাগী-আসামী রূপে গণ্য হ'য়ে থাকেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিল্ববাবু ভয়ানক দাগী হয়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু, অত্যন্ত হুঁসিয়ার রায়মশাই তাঁকে বিদায় দিলেন—আসামী হবার আগেই।

প্রায় দু'বছর আগে সুকবি তরুণের সঙ্গে বিল্ববাবুর পরিচয় হয়েছিল—এক মাসিক পত্রিকা-আপীসে। সে-দিন জেলগেটে যারা তরুণকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিল—তাদের মধ্যে বিল্ববাবুও ছিলেন একজন। অতি অল্পদিন আগে বিদ্যার্থীভবন থেকে আস্‌ছেন শুনে, তরুণ তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছিল—অবশ্য অবশ্য একবার দেখা করবার জন্তে।

আজ পর্য্যন্ত বিশ্ববাবু অনেকবার দেখা করেছেন তরুণের সাথে। শিক্ষিত হলেও তরুণ তাঁকে মোটেই পছন্দ করেনি। দু'একদিনের আলাপ-ব্যবহারেই সে বুঝে নিয়েছিল—লোকটি হাম্‌বাগ্‌! তিনি না-জানেন এমন কোনো বিষয় নেই—না-বোঝেন এমন কোনো সমস্যা নেই। তাঁর প্রত্যেকটি আলাপ-আলোচনার লক্ষ্য—নিজের মূল্য-বৃদ্ধি-করা ও অপরের মূল্য-হ্রাস-করা। সবাই যাকে সুন্দর ও সুশ্রী বল্‌বে—তিনি তাকে প্রমাণ করবেন—অত্যন্ত কুরূপ ও কুৎসিৎ। উদ্দেশ্য—নিজের মত-বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য প্রচার করা।

আজ বিকেলে বিশ্ববাবু আবার এসেছেন তরুণের সঙ্গে দেখা করতে। লীলা ও রায়মশাই যে এখানে হাজির আছেন, তা' তিনি জান্‌তেন না। জান্‌লে আস্‌তেন কিনা—সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল।

বর্ত্তমান দেশের অবস্থা ও রাজনীতি-সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হতেই হঠাৎ বিশ্ববাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, মহাত্মা গান্ধীকে আপনি কি মনে করেন, তরুণবাবু?

তরুণ একটি কথায় জবাব দিল—অতিমানব!

—কিন্তু আমার মনে হয়—তাঁর গোপন-উদ্দেশ্য—এই 'ভারতবর্ষে ব্রিটীশ-ইম্‌পিরিয়ালিজিম্‌ কায়েম-করা'! তাঁর চেষ্টাতেই আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্ত হ'তে পারছি না। অহিংসা-প্রচার ক'রেই তিনি বিদ্রোহী-ভারতকে শান্ত ও সমাহিত রাখ্‌ছেন···

মহাত্মা-সম্বন্ধে কোনো ভারতবাসী যে এরূপ একটা ধারণা পোষণ করতে পারে—তা' শুনে তরুণের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। একটু বিরক্ত ভাবে তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—আপনি এখন কোত্থেকে আস্‌ছেন বিশ্ববাবু?

—ভারতী-ফিলম্-কোম্পানীর আপীস্ থেকে। তা'রা আমার একটা 'ষ্টোরি' নিয়েছে কিনা? শীগ্‌গীরই স্যুটিং আরম্ভ করবে……

—পথে কোনো 'এক্‌সাইস্-সপে' ঢুকেছিলেন কি?

—কেন বলুন তো?

—'মহাত্মার চেষ্টাতেই আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হ'তে পারছি-না'—এরূপ মন্তব্য কোনো 'বস্তু-বিশেষের ইনফ্লুয়েন্সে' ছাড়া কারো মুখ থেকে বেরুতে পারে না।

বিল্ববাবু একটু উত্তেজিতভাবে বল্‌লেন—ইতিহাসকে সাক্ষী মেনে বল্‌ছি আমি—রক্ত-প্লাবনে দেশের মাটিকে বিধৌত না-করলে, স্বাধীনতার বীজ বপন কখনই সম্ভব হতে পারে না। যে পাশ্চাত্য-জাতির সদম্ভ পদ-নিষ্পেষণে—মরণোন্মুখ আমরা—আজ মুক্তিকামী হ'য়ে ছট্‌ফট্ করছি—তারাও একদিন আর্ত্তনাদ ক'রে কেঁদেছিল—'ব্লিডিং ক্রম্ রোমান্-রড্!

তরুণ বল্‌লো—শুনুন বিল্ববাবু! মুক্তির একমাত্র পন্থা—'ব্লাড্-বাথ' বা 'রক্তস্নান'—এ অতি অসভ্য বর্ব্বর-যুগের কথা। মহাত্মা গান্ধী আজ শুধু ভারতের নয়—সমগ্র জগতের 'মুক্তি-মন্ত্র' ঘোষণা করেছেন—অহিংস-অসহযোগের ভিতর দিয়ে। মানব-সভ্যতার মিলন-মঞ্চ থেকে, আজ আর কেউ দূরে নেই। দেওয়া-নেওয়ার আত্মীয়তার ক্ষেত্রে আজ সবাইকে এসে মিল্‌তে হবে—পারস্পরিক সহনশীলতা ও নৈকট্য-বুদ্ধির আকর্ষণে। এ যুগে বিশ্বের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হ'লে—আত্মম্ভরিতা ও পরশ্রীকাতরতাকে ঝেঁটিয়ে দূর করতে হবে সভ্যতার সীমানা থেকে। একথা আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারছেন না যে—শুধু দলগত প্রাধান্য বা সম্প্রদায়গত স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায়—

ইম্‌পিরিয়ালিজিম্‌ বা ক্যাপিটালিজিম্‌—অতি প্রাচীনকাল হ'তে জনসাধারণকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে, তাদের অন্ন-বস্ত্রের ন্যায্য অধিকার থেকে। পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা সৃষ্টি ক'রে রেখেছে—তাদের স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব-বিকাশের গতি-পথের উপর। জনসাধারণই একদিন রাষ্ট্রকে গড়ে তুলেছিল—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে দিয়েছিল সার্ব্বভৌম-শাসনাধিকার, লক্ষ লক্ষ নরমুণ্ডের উপর সিংহাসন রচনা ক'রে। জনসাধারণের পক্ষ থেকে আজ আবার সেই রাষ্ট্রীয়-প্রতিভূত্বকে যদি অস্বীকার করতে হয়, তা'হলে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অহিংস-অসহযোগই একমাত্র অব্যর্থ-সন্ধান। সত্যাশ্রয়ীর হাতে অহিংসাই একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র! হিংসার পথে অগ্রসর হ'লে—মিথ্যাশ্রয়ীর প্রাধান্যই অক্ষুন্ন থাকবে—পশুবলের কাছেই মাথা নোয়াতে হবে সকলকে……

বিশ্ববাবু হেসে উঠ্‌লেন—কী যে বলেন আপনি! পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ যেখানে বাস করে—সেই ভারতবর্ষকে এতদিন শাসনাধীনে রাখা, মুষ্টিমেয় বণিক-সম্প্রদায়ের পক্ষে কখনই সম্ভব হ'তো না—যদি গান্ধীজী ও তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবগণ পরোক্ষে সাহায্য না-করতেন। অহিংসার 'বৈষ্ণব-দীনতা'ই রেখেছে, ভারতবাসীকে বিকলাঙ্গ করে—হীনবীর্য্য ক'রে—আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ক'রে……

রায়মশাই বহুক্ষণ ধরে ঢু'কে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন একপাশে। তরুণ তাঁকে দেখেছিল—বিশ্ববাবু দেখেন নি। হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে বিশ্ববাবু চম্‌কে উঠ্‌লেন। রায়মশাই বল্‌তে লাগ্‌লেন—দেখুন বিশ্ববাবু! যা' জানেন না, বা বোঝেন না—সে সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করবেন না। জিজ্ঞাসা করি, বৈষ্ণব-দীনতা কথাটার মানে

কি—বলুন তো? একটু থেমে রায়মশাই বল্‌তে লাগ্‌লেন—ভগবান-বিষ্ণুর অবতার—মহামানব-শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে কোনো দীনতা বা দুর্ব্বলতার পরিচয় আছে কি? পুতনাবধ, কালীয়দমন, গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারণ, কংশ-নিধন প্রভৃতি পৌরুষের পরিচয়গুলি কি কোনো রেখাপাত করেনা আপনাদের মনে? আপনারা কি শুধুই জেনে রেখেছেন—তাঁর ননী-চুরি, বসন-চুরি আর রাস-লীলা? বিশ্ববাবু মাথা নীচু করলেন। রায়মশাই বল্‌তে লাগলেন…

কুরুক্ষেত্রের-মহাযুদ্ধে কম্পমান সব্যসাচীর হাত থেকে যখন গাণ্ডীব খ'সে পড়েছিল—তখন কে তাকে বজ্র-নির্ঘোষে ব'লেছিল—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!' কে তাকে উত্তেজিত করেছিল—'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্যবরান্ নিবোধতঃ।' কে তাকে আশার বাণী শুনিয়েছিল—'অহং তাম্ সর্ব্ব পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িস্যামি মা শুচ!'

যিনি এই দেহ-রথের সারথ্য করছেন আর প্রতি-নিয়তই দেহীকে বল্‌ছেন—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে—মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্ম-ফলহেতুর্ভূঃ! দেহী যদি তাঁর সেই অন্তর্নিবিষ্ট সারথীরূপ একবার উপলব্ধি করতে পারে, সমস্ত কর্ম্মফল তাঁকে নিবেদন ক'রে কর-জোড়ে বল্‌তে পারে—'ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা-নিযুক্তোস্মি তথা করোমি!' ত'াহলে তার অন্তরে কি কোন দুর্ব্বলতার স্থান থাকা সম্ভব? মানুষ দুর্ব্বল হয় তখন—যখন সে শ্রীভগবানের সারথ্যকে অস্বীকার ক'রে আত্ম-কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার নিয়ে দেহসর্ব্বস্ব হ'য়ে ওঠে! মদ্যপান করিয়ে একজন যোদ্ধার মধ্যে কৃত্রিম সবলতা সৃষ্টি করা যায়—তাকে দিয়ে সাময়িক-ভাবে যুদ্ধজয়ও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তা থেকে জগতের কোনো স্থায়ী-কল্যাণ আশা করা যায় কি?

বিশ্ববাবু সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-অসহযোগ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

রায়মশাই বল্‌লেন—মহাত্মা গান্ধীকে আপনারা কেউ বোঝেন না। গান্ধীজী ভগবদ্‌ভক্ত ও সত্যাশ্রয়ী। তাঁর অহিংসা দুর্ব্বলের আত্মপ্রতারণা নয়। সবলের আত্মসম্বিৎ! সত্যাশ্রয়ীর গুরুদায়িত্ব ও কঠোর কর্ত্তব্য পালনের মধ্যেই অহিংসার অপরাজেয় শক্তি ও সামর্থের অভিব্যক্তি! হিংসা পশুধর্ম্ম, আর অহিংসা সাধনসাপেক্ষ মানব-ধর্ম্ম। আপনার সাপে-কাটা আঙুলটিকে যদি আমি তৎক্ষণাৎ কেটে ফেলি, অতি-সুধার একখানি অস্ত্র দিয়ে—তাহলে আমার উদ্দেশ্য তো আপনার প্রাণরক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়? অতএব, একজন অহিংস-সত্যাশ্রয়ীর হাতে অতি সুধার অস্ত্রও থাক্‌তে পারে—আর, প্রয়োজন মত তা' দিয়ে, সে কারো রক্তপাতও ঘটাতে পারে। মনোবৃত্তি বা উদ্দেশ্য বিচার না ক'রে, শুধু কার্য্য দেখে, হিংসা ও অহিংসাকে বুঝ্‌বার কোনো উপায় নেই। অমৃতের সন্ধানী অহিংস-সত্যাশ্রয়ীকে ভীরু বা কাপুরুষ মনে করা—আপনার মত স্বার্থান্বেষীর পক্ষে শুধু অজ্ঞতা নয়—অতি গুরু-অপরাধ! দু'পাতা ইংরেজি পড়ে—আর বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'একখানা চাপ্‌ড়াশ্‌ পেয়ে—আপনারা মনে করেন—মানবজীবনের সব রহস্যের দরজাই বুঝি খুলে গেছে আপনাদের চোখের সাম্‌নে……রায়মশাই ভয়ানক উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলেন।

বিব্রতভাবে বিশ্ববাবু বল্‌তে চেষ্টা করলেন—আজ্ঞে……আমি…… আমি……

চিৎকার ক'রে ধমক্ দিয়ে রায়মশাই বল্‌লেন—থামুন মশাই! আপনি কি তা, আমি জানি। এই সহর কলকাতা একটি রঙ্গমঞ্চ!

এখানকার মানুষগুলো চব্বিশঘণ্টাই অভিনয় করছে—বহুরূপী সেজে। কে-যে-কি তা' খুব সহজে বুঝ্‌বার কোনো উপায় নেই। পল্লী-অঞ্চলে গিয়ে দাঁড়ালেই আপনাদের মত বহুরূপীর রূপ-সজ্জা খুলে যায়। মুখের মুখোস্‌ও খ'সে পড়ে। সত্যিকার মানুষটিও ধরা পড়ে। বিদ্যার্থী-ভবনে যখন ছিলেন—তখন আমি চিনে ফেলেছি আপনাকে। আজ হঠাৎ দেশ-দরদী সেজে, কেন যে এসেছেন তরুণের কাছে—তা' ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে। কাল দেখেছি—খুব বড় একজন পুলীশ-অফিসারের মোটরের পাশে দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বল্‌ছেন আপনি। সত্যি বলুন তো—আপনার মতলব কি? তরুণকে কি আবার জেলে নিয়ে আট্‌কাতে চান্?

বিশ্ববাবুর মুখখানা কালো হ'য়ে উঠেছিল। তবু খানিকটা চেষ্টাকৃত শুক্‌নো হাসি মুখে জড়িয়ে নিয়ে, একটা ঢোক্ গিলে, শুক্‌নো জিভ্‌টাকে একটু সরস ক'রে বল্‌লেন তিনি—হেঁ···হেঁ···কি যে···কি যে বলেন আপনি······

এমন সময় লীলা ঢুক্‌লো ঘরে।

প্রথমদিন রায়মশাইয়ের সঙ্গে গিয়ে কলিকে লীলা দেখে এসেছিল। তারপর আজ সাতদিন, রোজ-বিকেলেই একবার ম্যাডিক্যাল কলেজে যাচ্ছে। নানারকম ফলও ঘরে-তৈরি-খাবার নিয়ে কলিকে দিয়ে আস্‌ছে।

লীলাকে ঘরে ঢুক্‌তে দেখেই, বিশ্ববাবু তরুণের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—আজ তা'হলে আমি আসি, তরুণবাবু! নমস্কার······

—শুনুন বিশ্ববাবু! দাদু যা' বল্‌লেন তা' যদি সত্যি হয়—তা'হলে আমার একটা কথা শুনে যান্—তরুণ বল্‌তে লাগ্‌লো। আর একটু

সুস্থ হয়েই আমি আবার সেই সরকারী-লঙ্গরখানায় গিয়ে হাজির হবো। আপনাদের কারো আমন্ত্রণের অপেক্ষায় থাকবো না। আমার চোখে এই পরাধীন ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড জেল! কোনো—জেল-কয়েদী তো বিবাহিত-জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের অধিকারী নয়? এ যুগের প্রত্যেক নরনারীকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে—দেশের আহ্বানে—কোটি কোটি জেল-কয়েদীর এই মুক্তি-সংগ্রামে।

বিল্ববাবু মাথাটা নীচু ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি আবার জেলে গিয়ে পড়ে থাকবার মতলব করছো তরুণ?

—নিশ্চয়ই......খুব দৃঢ়তার সঙ্গে তরুণ বললো।

রায়মশাই নির্ব্বাক ভাবে তরুণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

তরুণ একটু বিদ্রূপের সুরে বলতে লাগলো—দাদু কি মনে করেছেন —আমার বাকি জীবনটা কেটে যাবে, আপনার ওই সুন্দরী নাতনীকে নিয়ে অতি বিশুদ্ধ রঙ্গরসে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করে?

—আমাকে ততখানি মূর্খই বা কেন ঠাওরাচ্ছ ভাই? বিয়ের আগেই সে কথাটা আমি লীলাকে বলেছি কি না, জিজ্ঞাসা করো......

—হ্যাঁ, লীলা বলেছে। আপনি ওকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, অরুণকে বিয়ে করতে। আপনার মত একজন দূরদর্শী গুরুজনের পরামর্শ অগ্রাহ্য ক'রে লীলা খুব অন্যায় করেছে......

তরুণের এ মন্তব্য শুনে, ক্ষোভে ও দুঃখে লীলার শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে আসছিল। মাথার ভিতর আগুন জ্বলছিল। সে-আগুনে চোখের দু'ফোঁটা জল যেন বাষ্প হ'য়ে বাতাসে মিশে গেল। লীলা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো তরুণের মুখের দিকে চেয়ে। কিছুই বললো না।

একটু বিষণ্ণভাবে হেসে রায়মশাই বললেন—মনে বড্ড দুঃখ রয়ে গেল দাদু ! জেল খেটে খেটে আত্মহত্যা ক'রে, তুমি যে দেশের কি উপকার করবে—তা' ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না। উচ্চশিক্ষিত তুমি, চিন্তা-শীল তুমি, আমার তেজস্বিনী মেয়ের তেজস্বী ছেলে তুমি—সবই স্বীকার করছি। কিন্তু স্বীকার করতে পারছিনে তোমার মতবাদের সুস্থতা।

তরুণ একটু হাস্‌লো। রায়মশাই বলতে লাগলেন—যদি বলো, আদর্শ-হিসাবে তোমার এই আত্মত্যাগ দেশের যুব-সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু তারা ক'জন ? দেশের শতকরা নব্বইজন লোক 'অআকথ' শিখ্‌বার সুযোগ পায় না। সংবাদপত্র পড়ে দেশের অভাব অভিযোগের সাথে পরিচিত হয় না। হাড়-ভাঙা খাটুনীর বিনিময়ে যারা শুধু একমুঠো ভাত আর একখানা গামছা পেলেই পরিতুষ্ট—দেশের স্বাধীনতা বা পরাধীনতা মানে তারা কি কিছু বোঝে ? কতিপয় শিক্ষিত যুবকের কচি-মাথা মাটিতে লুটিয়ে দিলেই কি দেশের মাটি স্বাধীন হ'য়ে উঠ্‌বে ? তরুণ তখনও হাস্‌ছিল···

একটু উত্তেজিতভাবে রায়মশাই বলতে লাগ্‌লেন—কোটি কোটি মূর্খ জনসাধারণ যতদিন না তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে, তোমাদের সাথে সমস্বার্থ-বিশিষ্ট হ'য়ে অযাচিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে—ততদিন সফল হ'তেই পারে না, তোমাদের দেশোদ্ধারের স্বপ্ন !

আমার মনে হয়—একটু থেমে আবার বলতে লাগ্‌লেন তিনি—তোমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হওয়া উচিত—দেশের নিরক্ষরতা দূর করা ও সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মনে দেশাত্ম-বোধের বীজ বপন করা। দেশের মুখে ভাষা দাও, বুকে আশা দাও, আর বাহুতে দাও বজ্রকঠোর

শক্তি! বলং বলং—বাহুবলম্। হিংসা আর অহিংসা নিয়ে মত-বাদের লড়াই চালাতে চাও, চালাও, তা'তে কোনো ক্ষতি নেই। আসল কথা হচ্ছে—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। বা, গৃহ-বিবাদে অবসন্ন হ'য়ে পড়ো না। শেষ-পর্য্যন্ত—"লক্ষ্মী—খোঁজে শুধু বলীর বাহু, চাহেনা ধর্ম্মের পানে।" কবিগুরুর এ বাণী ভুলে গেলে চল্‌বে না। জেলে অনশনে দেহত্যাগ করে, একটা রেকর্ড রাখ্‌তে পারো। মানুষ কতদিন অনাহারে বেঁচে থাকে—তার একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় হ'তে পারো। কিন্তু, দেশের মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে তার কি কোনো সম্বন্ধ আছে? তোমাদের মূল্যবান জীবনগুলি কি সেরূপ খেয়ালে বা হুজুকে অপব্যয়িত হওয়া উচিত? আমি আশা করেছিলাম—তুমি আর লীলা আজ দেশের এই গঠনমূলক কাজে আত্ম-নিয়োগ করবে। বিবাহিত তরুণ-তরুণীদের সামনে, দেশ-প্রেমের নিখুঁৎ আদর্শ হ'য়ে দাঁড়াবে—সার্থক হবে তোমাদের এই শুভ-মিলন……

হো হো ক'রে হেসে উঠে তরুণ বল্‌লো—অর্থাৎ আপনার মত ও পথ অনুসরণ ক'রে, আমরা স্বাধীনতা লাভ করবো, আর একশো বছর পরে! এইতো বল্‌তে চান্ আপনি? কিন্তু তা'কি হ'তে পারে দাদু! রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেশবাসীর হাতে না-এলে, দেশের নিরক্ষরতা কখনই দূর করা যাবে না। দেশবাসীর নৈতিক-উন্নতিও সাধিত হবে না। আমার মতবাদের সুস্থতা সম্বন্ধে—আপনি যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—তার উত্তরে আমাকে বল্‌তে হচ্ছে—আমার মত যে কি, তা' আপনি ঠিক জানেন না। দেশের স্বাধীনতা-সম্বন্ধে আমি কি বুঝি—আপনাদের সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ কোথায়—সে কথা আজ আপনাকে আর লীলাকে খুলেই বল্‌ছি শুনুন্……

তরুণ উঠে গিয়ে একটা স্যুটকেস্ খুলে—টেনে বের করলো তার 'তরুণের স্বপ্নে'র খস্‌ড়া-পাণ্ডুলিপি। পাতাগুলো উল্‌টে পাল্‌টে একখানা পাতা বের ক'রে পড়তে লাগ্‌লো—"মৃত্যুভয় হীন আত্মিক শক্তির উদ্বোধন—শুধু এই ভারতের মুক্তির পন্থা নয়—বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠারও একমাত্র উপায়। আত্মম্ভরিতায় ও পশু-বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, উন্মত্ত মানুষ চিরদিনই আত্মঘাতী হচ্ছে—মারামারি ও কাড়াকাড়ির প্রবৃত্তিকে সর্ব্বদাই জনসমাজে জাগিয়ে রাখ্‌ছে।

শ্রম-শিল্পের বাজারে আজ যুগান্তর উপস্থিত করেছে—পাশ্চাত্য যান্ত্রিক-সভ্যতা। পশ্চিমদেশে মানুষের চেয়েও মেসিনের মূল্য আজ ঢের বেশী। মেসিন্ যতই বড় ও মজবুত হ'য়ে উঠ্‌ছে—মানুষ ততই ছোট হ'য়ে ভেঙে পড়ছে, তার রুচি-প্রবৃত্তির দীনতায় ও হীনতায়। ভারতীয় সভ্যতা কেন মাথা-নোয়াবে সেই যন্ত্র-দানবের কাছে? মানুষের প্রয়োজন-মেটাতে কুটির-শিল্পই কি যথেষ্ট নয়? ভারতের অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান করবে 'দেশের মাটি' আর 'চরকা'। আর, পশুশক্তির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করবে—মহাত্মা গান্ধী-পরিকল্পিত অহিংস-প্রতিরোধ!

কল-কারখানার প্রয়োজন—ধনী ও বিলাসীর নিত্য নূতন চাহিদা-পূরণের জন্যে। যে সব শ্রমিকেরা 'তাড়ি' টেনে, ভূতের মত খাট্‌ছে—ডে-সিফ্‌ট্ ও নাইট-সিফ্‌ট্ ক'রে দেহের রক্ত জল করছে—তাদের প্রয়োজনে কোন্ বিলাসিতার দ্রব্যসম্ভার তৈরি হ'য়ে থাকে? মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে আজ যদি তারা দেশের মাটি ও চরকাকে চিনে নিতে পারে—কল-কারখানার মাদকতা সম্পূর্ণ ত্যাগ ক'রে, ছোট ছোট প্রয়োজনীয় কুটির-শিল্পে আত্মনিয়োগ করতে পারে—তা'হলে ধনিক ও

শ্রমিকের মধ্যে ধন-বৈষম্যের আর-কোনো প্রশ্নই তো উঠ্‌তে পারে না? পশ্চিমের অভিনব আবিষ্কার—কম্যুনিজিম্, সোসালিজিম্, বা লেবার-মুভ্‌মেণ্টের উদ্দেশ্য, ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে একটা আপোষ-রফা করা বৈ আর কি? কিন্তু আত্মিক-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ অহিংস-অসহযোগী করতে পারে ধন-বৈষম্যের মূলোৎপাটন।

প্রাচ্যে অহিংসা-মন্ত্রের উদ্‌গাতা প্রথম—ভগবান-বুদ্ধ, দ্বিতীয়—মহাত্মা গান্ধী। বৌদ্ধ-জাপান অহিংস-বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে—পাশ্চাত্য যান্ত্রিক-সভ্যতাকে আঁকড়ে ধরলো, দুর্দ্দমনীয় পররাজ্য-লিপ্সা নিয়ে প্রবর্ত্তিত করলো—তাদের রাজকীয় শিণ্টো-ধর্ম্ম। ঝাঁপিয়ে পড়লো দুর্ব্বল প্রতি-বেশী চীনের উপর। ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের মত যন্ত্র-দানবের হাতেই জাপানের ধ্বংস আজ সুনিশ্চিত। ভারতবর্ষ আবার সেই জাপানী-ভুলটা কেন করবে? দিকে দিকে কলকারখানা স্থাপন ক'রে, ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালি ও ইকনমিক্যালি উন্নত হ'য়ে—ভারতীয় মুক্তির যে পরিকল্পনা আজ পাশ্চাত্য-শিক্ষিতেরা গঠন করছেন—তার ভিতরেই কি থেকে যাচ্ছে না, ভারতের ধ্বংসের বীজ?"

পাণ্ডুলিপি বন্ধ ক'রে তরুণ বল্‌তে লাগ্‌লো—আপনার স্বাবলম্বী-বিদ্যার্থী-ভবন কি পাশ্চাত্য-আদর্শে পরিকল্পিত—মানুষের কাছে মেসিনের মহিমা-কীর্ত্তনের জন্যেই স্থাপিত হয় নি? মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-অসহযোগ সম্বন্ধে, আপনি মাঝে মাঝে যে অপব্যাখ্যার অবতারণা করেন, তা মেনে নিতে মোটেই রাজী নই আমি। হিংসা ও অহিংসার মাঝে কোনো সীমা-রেখা নেই—অহিংস-অসযোগ মহাত্মার বহিরাবরণ, হিংসাই তাঁর অন্তর্বস্তু! এ সব কথা ব'লে একজন জগৎ-বরেণ্য মহাপুরুষকে ছোটো বা খাটো করবেন না। মহাত্মা-

গান্ধীর আবির্ভাব শুধু ভারতের মুক্তির জন্যে নয়—হিংসা-জর্জরিত পৃথিবীতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্যে—একথা আমি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে রায়মশাই বল্‌লেন—নীলমণি বল্‌তো—তুমি স্বপ্ন-বিলাসী! আমি দেখ্‌ছি—শুধু স্বপ্ন-বিলাসী নও, আত্মাভিমান ও পরমতাসহিষ্ণুতাও তোমার আছে খুব। কিন্তু, লীলার উপায় কি? আত্মিক-শক্তির মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্যে তুমি যদি জেল-কয়েদী সেজেই জীবন-পাত করো—হতভাগিনী কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে?

লীলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, তরুণ বল্‌লো—আমার মৃত্যুর পর লীলাকে আবার বিয়ে দেবেন—অরুণের সঙ্গে·········

লীলা চম্‌কে উঠ্‌লো। তার পা-থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন একটা তড়িৎ-প্রবাহ ছুটে গেল! টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে। পড়ে যাবার ভয়ে টেবিলটাকেই জোর ক'রে চেপে ধর্‌লো। তরুণের কথার কোনো প্রতিবাদ করলো না, বা মাথাটা উঁচু ক'রে তরুণের দিকে একবার চাইতেও পার্‌লো না।

কোনো জবাব না দিয়ে—হঠাৎ রায়মশাই অত্যন্ত বিরক্তভাবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

তরুণ সস্নেহে ডাক্‌লো—লীলা!

—বলো·········

—দুঃখিত হয়েছ?

—না।

বহুক্ষণ তা'রা চুপ্‌ ক'রে থাক্‌লো। কথার তহবিল ফুরিয়ে গিয়ে

হঠাৎ যেন দুজনাই একেবারে দেউলে হ'য়ে পড়লো। প্রশ্ন নাই, উত্তর নাই, কোনো দিক্ থেকে কোনো শব্দ নাই। শুধু ওই দেওয়ালের ঘড়-ঘড়িটা যেন সমান-তালে হাতুড়ী পিট্‌ছিলো তাদের বুকের উপর —হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বহাল রাখ্‌বার জন্যে।

হঠাৎ তরুণ বল্‌লো—আমার মৃত্যুর পর তোমার জীবনের একটা মস্ত ভুল যদি শুধ্‌রে নিতে পার—মন্দ কি ?

চোখ দুটো মুছে খুব স্পষ্টভাবে তরুণের মুখের দিকে চেয়ে লীলা বল্‌লো—তোমাকে সুখী করবার জন্যে……আগেই যদি পারি ? তোমার কোনো আপত্তি নেই তো ?

তরুণ একটু হেসে বল্‌লো—তা' কি ক'রে পারবে ? হিন্দু-আইনে তো 'ডাইভোর্স' নেই ! স্বামী বেঁচে থাকৃতে……

বাধা দিয়ে লীলা বল্‌লো—তুমি সরকারী-আইন অমান্য ক'রে জেল খাটবে, আর আমি সামাজিক-আইন অমান্য ক'রে পতিতা হবো। তা'তে তোমার কোনো আপত্তি আছে কি না, জানতে চাই……

তরুণ চুপ ক'রে চেয়ে রইলো লীলার মুখের দিকে। কী সুন্দর সে মুখখানি ! কত পবিত্র তার দৃষ্টি ! সে কি পারে পতিতা হ'তে ?

অত্যন্ত অধীরভাবে লীলা বল্‌লো—বলো, বলো, আমার জিজ্ঞাসার জবাব দাও……

—তুমি যদি পারো, আমার কোনো আপত্তি নেই লীলা ! খুব সহজভাবে বল্‌লো তরুণ।

অপলক চোখে তরুণের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে, লীলার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো—ঝর্ ঝর্ করে একরাশ মুক্তার মত অশ্রু-বিন্দু ! হঠাৎ সে আঁচল দিয়ে চোখ দু'টো চেপে ধ'রে—ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যাবার সময় ঝাপ্‌সা-চোখে দেখে গেলো, তরুণের চোখ দুটোও জলে ভ'রে উঠেছে।

অস্থির ভাবে কিছু সময় ঘরের মধ্যে পায়চারী করলো তরুণ। তারপর একটা জান্‌লা খুলে রাস্তার দিকে চেয়ে থাক্‌লো। কত লোক যাতায়াত করছে। বিভিন্ন গন্তব্য—স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য—নানারূপ যানবাহন—সাইকেল, ঘোড়ার গাড়ী, মোটরকার! পোষাক-পরিচ্ছদের কত বৈচিত্র—চেহারার কত বৈষম্য! স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা, ধনী-দরিদ্র, স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যহীন! ওদের মনে কি পরাধীনতার মর্মবেদনা জাগে? দিনান্তে ওরা কি একবারও মনে করে—'স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার'? একদিন, একসঙ্গে, ওরা সবাই যদি অহিংস অসহযোগী হ'য়ে ওঠে—প্রত্যেকটি অন্যায় আইন অমান্য করতে সাহসী হয়—তা'হলে জন-মত-বিরোধী শাসন-কর্তৃত্বের অবসান হ'তে ক'দিন লাগে?

টেবিলের কাছে এসে, তরুণ স্মেলিং সল্‌ট শুঁকতে লাগ্‌লো। তারপর বিছানার উপর গা এলিয়ে দিয়ে, বহুক্ষণ চোখবুজে প'ড়ে থাক্‌লো—ঘুমের ভান ক'রে।

একমুঠো কাগজ হাতে নিয়ে, অরুণ এসে ঢুক্‌লো ঘরে।

—কি রে, ঘুমুচ্ছিস্ নাকি?

তরুণ চেয়ে দেখ্‌লো—অরুণ তার "তরুণের স্বপ্নে"র প্রুফ্ নিয়ে এসেছে।

—আচ্ছা তরুণ! তোর শরীর ভাল হবে কি ক'রে বল্‌তো? অরুণ বল্‌তে লাগ্‌লো। বিকেল-বেলায়—এমন চমৎকার বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে—আর তুই প'ড়ে আছিস্, বন্ধ ঘরে, বিছানায়, চোখ বুজে

বাজার বেরুতে যদি ইচ্ছে না-হয়—ছাতে উঠেও তো একটু হাওয়া খেতে পারিস্ ?

—যা, যা, বাজে বকিস্ নে। দরজাটা বন্ধ ক'রে, আমার কাছে এসে ব'স্—খুব গোপন—জরুরী কথা আছে। তরুণ বল্‌লো।

—লীলা কোথায় ?

—রাঁধছে......

—দরজা বন্ধ দেখ্‌লে, সে আবার খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌বে না তো আমার উপর ?

—বোধ হয় এ ঘরে আর আস্‌বেই না সে......

দরজাটা বন্ধ করতে করতে বিস্মিতভাবে অরুণ জিজ্ঞাসা করলো—কেন ? কি হয়েছে ?

—চূড়ান্ত বোঝাপড়া হয়ে গেছে আজ লীলার সঙ্গে। লীলারই সামনে দাদুকে বলে দিইছি—আমার মৃত্যুর পর, তোর সঙ্গে যেন আবার লীলার বিয়ে দেন......

অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে অরুণ বল্‌লো—দেখ্ তরুণ! তুই বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস্। 'টিবি' হ'লেই যে কেউ নিশ্চয় মারা যাবে, একথা কোনো ডাক্তার বল্‌বে না। অথবা, গলা দিয়ে একটু রক্ত উঠ্‌লেই যে টিবি সন্দেহ করতে হবে—তারও কোনো মানে নেই......

—কিন্তু একস্-রে—রিপোর্ট !

—তাও মিথ্যে হ'তে পারে। জেল-হাঁসপাতালের ডাক্তার তো তোকে অনেক ক্যাল্‌সিয়াম্ খাইয়েছে ? টিবি-ক্যাভিটি আর ক্যাল্‌সিফিকেশান্-স্পট্—ফটোতে কেউ ডিস্‌টিংগুইস্ করতে পারে না। মারাত্মক টিবির লক্ষণ কি জানিস্ ? রোগী মনে করে—তার অসুখ খুব

কঠিন নয়, নিশ্চয়ই সেরে যাবে। খুব শীগ্‌গীরই সে সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু, তোর অবস্থা তো দেখছি—ঠিক তার উল্‌টো! সত্যি টিবি হ'লেও তুই মরবি না তরুণ!

—তা'বলে লীলাকে তো মারতে পারবো না অরুণ! উচ্ছ্বসিত-ভাবে তরুণ বলতে লাগ্‌লো—কালরাত্রেও সে আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিল। অসহ্য যন্ত্রণার অভিনয় করে, সরে এসেছি আমি! চোখভরা জল নিয়ে লীলার সেই সুন্দর মুখখানি যখন আমার বুকের কাছে এগিয়ে আসে—অরুণ! টিবি হলেও, আমি তো মানুষ? না না, আমি পারবো না লীলাকে ধ্বংস করতে। তোর চেয়েও, আমি আজ লীলাকে বেশী ভালবাসি……

তরুণের চোখ দুটো ছল্‌ছল্ করছিল। চোখমুছে সে আবার বলতে লাগ্‌লো—দাদুকে বলে দিয়েছি—আবার আমি আইন-অমান্য করবো—জেল খাটবো—নিজের মতবাদের জিদ্ বজায় রাখতে কাউকে জানতে দেব না যে—মাত্তর একবার জেলে গিয়েই, এতটুকু বাতাস-টেনে বেঁচে-থাকবার এই মূল্যবান যন্ত্রটিকে পচিয়ে এসেছি—অতি প্রিয়জনের কাছেও অস্পৃশ্য হ'য়ে পড়েছি—দেশপ্রীতির পুরস্কার পেয়েছি!

—তা'তো বুঝ্‌লাম। কিন্তু বেচারা লীলা কি করবে? অরুণ জিজ্ঞাসা করলো।

অত্যন্ত ব্যাকুলতার সঙ্গে তরুণ বললো—তুই তাকে এলাহাবাদে নিয়ে যা। তোর কাছে সে খুব সুখে থাকবে। বিদ্যার্থী-ভবনে স্বামী স্ত্রী ভাবে তোরা যে কত সুখে ছিলি—সে খবর আমি রাখি। ডাক্তারের সাহায্যকারিণী সেজে, সারারাত রোগীর সেবা ক'রে—লীলাও খুব

আনন্দ পেয়েছে! জোছনা-রাতে তোর হাত ধ'রে, পল্লী-মাঠে ঘুরে বেড়াতেও সে কোনো সঙ্কোচ বা লজ্জা বোধ করে নি? তোদের ভিতর সেই সদ্‌ভাবটা আবার যাতে গ'ড়ে ওঠে—সে ব্যবস্থা আমি করবো······

একটু হেসে অরুণ জিজ্ঞাসা করলো—তুই কি ক'রে করবি?

—আমার অমানুষের মত ব্যবহার—লীলা কদিন সহ্য করবে? দেখা হলেই এমন সব কথা আমি তাকে বলবো—যা' শুনলে আমার মুখের দিকে চাইতেও সে ঘৃণা বোধ করবে······

বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা পড়লো। অরুণ উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। একটা ট্রের উপর দু'কাপ্ চা আর দু'প্লেট্ খাবার সাজিয়ে নিয়ে, কানাই ঢুকলো ঘরে।

অরুণ জিজ্ঞাসা করলো—তোমার লীলাদি কোথায় কানাই?

—বাথ্‌রুমে ঢুকেছেন। আমাকে ব'লে গেছেন—খাবারটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে। একটা ছোট টেবিলের উপর ট্রেটা রেখে—কানাই বেরিয়ে গেল।

খাবার খেতে খেতে অরুণ বললো—দেখ্ তরুণ! লীলাকে আমি ভয় করি। বড্ড ভয় করি। তার ম্যাগ্‌নেটিক্ চোখদুটি দিয়ে সে যাকে কাছে টানে, সে দূরে থাকতে পারে না। যাকে দূরে সরিয়ে রাখে—সে কাছে আসতেও সাহসী হয় না। সুন্দরী মেয়ে অনেক দেখেছি তরুণ! কিন্তু লীলার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অতি অসাধারণ।

এমন সময় লীলা ঘরে ঢুকলো। তার রূপসজ্জা দেখে তরুণ ও অরুণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকলো। তাদের চোখ যেন বলতে চাচ্ছিল: ও কি কোনো ষ্টুডিওতে যাচ্ছে—রাজ-রাজেশ্বরীর চরিত্র-অভিনয়

করতে? বিয়ের বাসরেও তো সে এমন চমৎকারভাবে সেজেগুজে রূপ জাহির করে নি?

লীলা কখনো পাউডার মাখে না, আজ মেখেছে। রুজ্ বা লিপ্-ষ্টিক্ ব্যবহার করে না, আজ করেছে। দু'হাতে দু'গাছা সরু চুড়ি ছাড়া অন্য কোনো গহনা পরে না, আজ পরেছে—গলায় হার, কানে দুল, দু'হাতে দশগাছা চুড়ি, ব্রেসলেট্, আরম্‌লেট, এম্‌নি কত কি! বুকের রক্তের মতই রাঙা বেনারসীখানা যেন তার সর্বাঙ্গে আগুনের শিখার মত জড়িয়ে উঠে—দপ্ দপ্ করে জ্বল্‌ছিলো!

ঘরে ঢুকেই অরুণের মুখের দিকে চেয়ে, লীলা একটু চটুল হাসি হাস্‌লো। তারপর অনুনয়ের সুরে বল্‌লো—চলুন না অরুণবাবু! যে-কোনো একটা ছবি দেখে আসি? দিনরাত ঘরের ভিতর আট্‌কা থেকে বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছি······

অরুণের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। লীলা বলে কি? যার নাম শুন্‌লে সে কানে আঙুল গোঁজে, যাকে দেখ্‌লে সে চোখ দু'টো বোজে—হঠাৎ আজ এ কী মোহিনী-বেশে তারই সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে বল্‌ছে—'চলুন অরুণবাবু! যে-কোনো সিনেমায় গিয়ে······?' নিজের কান দু'টোকে অরুণ বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে যা শুনেছে—সত্যিই কি লীলা তা' বলেছে?

রোগ-ক্লিষ্ট তরুণের চোখের পাশের কালিমা হঠাৎ যেন তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো। তবুও সে লীলার প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি জানিয়ে অরুণকে বল্‌লো—যা'না অরুণ! লীলাকে সঙ্গে নিয়ে একটা ছবি দেখে আয়। সত্যিই তো লীলার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আজ দু'মাসের উপর দিনরাত একটা শয্যাশায়ী রোগীর সেবাযত্ন করছে সে······

—উঠুন, উঠুন—তরুণবাবু! আর দেরি করবেন না। অনুজার সুরে লীলা বললো।

তরুণও লীলার সুরে সুর-মিলিয়ে ব'লে উঠলো—হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দেরি করিস্‌নে অরুণ! ছটা প্রায় বাজে। ডাঃ বসাকের বেবি-অষ্টিন্‌খানা তো সঙ্গেই আছে? আর দেরি না-করলে, রাইট-টাইমে পৌঁছোতে পারবি—মেট্রোতে খুব ভাল ছবি আছে······

ফিক্ ক'রে একটু হেসে লীলা বললো—তরুণবাবু কি ভাবছেন বলুন তো?

—ভাবছি······তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়া—খুব লোভের হলেও, লাভের নয়। তোমাকে পাশে বসিয়ে গাড়ী-ড্রাইভ করতে—রং-সাইডেও রান্ করতে পারি। একটা এক্‌সিডেণ্টও ঘটাতে পারি। তারপর অডিটোরিয়ামে ঢুকেও, হয়তো পড়তে পারি ভয়ানক বিপদে! দর্শকরা ছবির পরদা থেকে চোখ ফিরিয়ে, তোমার দিকেই চেয়ে থাকবেন। আমাকেই মনে করবেন—তোমার ভাগ্যবান স্বামী! মাথা তোমার নিশ্চয়ই গরম হয়ে উঠবে—হঠাৎ টেম্‌পারেচারও বাড়বে। আমার অবস্থা হ'য়ে পড়বে ভয়ানক কাহিল!

—বাজে বকবেন না। ধমক দিয়ে লীলা বললো—যাবেন তো চলুন—আমি আর দেরি করতে পারছিনে·····

—চলো, যা' থাকে বরাতে! দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়ি······অরুণ উঠে দাঁড়ালো। তরুণের দিকে চেয়ে বললো—প্রুফগুলো দেখে প্রেসে পাঠিয়ে দিস্। সামনের উইকেই বইখানা বেরিয়ে যাবে······

লীলার দিকে অরুণ ঘুরে দাঁড়াতেই, সে অতি মৃদু ও মধুর কটাক্ষ হেনে বললো—আপনি গাড়ীতে গিয়ে বসুন—আমি এখুনি আস্‌ছি······

অরুণ বাইরে বেরিয়ে, দুমদুম্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে, নেমে গেল।

তরুণের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে লীলা বল্‌লো—যাবার সময় আর একবার জিজ্ঞাসা করছি—তোমার কোন আপত্তি নেই তো ?

—না।

—চোখদুটো ছলছল্ করছে কেন ?

—আনন্দে……

—সত্যি বল্‌ছো ? তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে ?

—হ্যাঁ, খুব……

—তুমি কি মানুষ ?

—নিশ্চয়ই……

—কোনো মানুষ কি পারে……তার স্ত্রীকে……

—অহিংস সত্যাশ্রয়ী যে, সে পারে।

লীলা অপলক চোখে তরুণের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে থাকলো। গাড়ীতে বসে অরুণ তখন ঘনঘন হর্ণ দিচ্ছিল।

—অসহ্য ! অসহ্য ! হঠাৎ লীলা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌লো। ইচ্ছে করছে—খানিকটা পেট্রল ঢেলে গাড়ীটাকে পুড়িয়ে দি'…

অব্যবস্থিত চিত্তের মত অত্যন্ত অস্থির ভাবে—ঘরের দরজা-জানলা গুলো সবই লীলা বন্ধ করে ফেল্‌লো। তারপর ফ্যানটা চালিয়ে দিল—আলোটাও জ্বালিয়ে দিল ?

বিস্মিতভাবে তরুন জিজ্ঞাসা করলো—অরুণের সঙ্গে যাবে না তুমি ?

উত্তেজিতভাবে লীলা বল্‌লো—কেন যাবো ? তিনি আমার কে ? কত বড় সত্যাশ্রয়ী তুমি ! তোমায় যে টিবি হয়েছে—গলা দিয়ে রক্ত

উঠেছে—সে কথাটা বন্ধুকে জানিয়েছ, আমাকে জানাওনি? আমি বুঝি তোমার কেউ নই?

লীলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লো। তারপর চোখ মুছে তরুণের খুব নিকট এসে বল্‌লো—ওই জান্‌লার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। আমাকে তুমি কি ভাবো বলো তো?

—তোমাকে যে আমি কত ভালবাসি—তা' তুমি জানো না লীলা! মুগ্ধভাবে তরুণ বল্‌লো।

—ভালবাসো? ভালবাস্‌তে কি তুমি জানো? ভালবাসা তোমাকে আজ আমি শিখিয়ে দেব...হঠাৎ লীলা তরুণের অবসাদভরা মুখখানি নিজের বুকের ভিতর চেপে ধরলো।

বিচলিতভাবে তরুণ বল্‌লো—না, না, ছেলেমানুষী ক'রো না লীলা! ছেড়ে দাও...আমাকে ছেড়ে দাও...

—এমন ক'রে আজ কেন সেজেছি জানো? তোমার টিবি আমার বুকে নিয়ে—তোমাকে আজ করবো—রোগমুক্ত!

—আঃ লীলা...

—চুপ্‌! চেঁচিও না বল্‌ছি...

বেচারা অরুণ তখনো গাড়ীতে ব'সে হর্ণ দিচ্ছিল।

(১০)

'তরুণের স্বপ্নে'র শেষ-অধ্যায় এখনো প্রেসে যায়নি। বারো ফর্মা ছাপা হ'য়ে গেছে। বাকি কপির জন্তে প্রেসওয়ালারা তাগিদ্ দিচ্ছে।

অরুণ এখন আর আসে না, যখন-তখন তরুণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে। গাড়ীতে ব'সে বহুক্ষণ হর্ণ দিয়ে দিয়ে, শেষে উপরে এসে যখন দেখ্লো—ঘরের দরজা-জান্‌লা সব বন্ধ! তখন সে শুধু লজ্জিতই হয়নি, বন্ধুপত্নীর এই দুর্বোধ্য ব্যবহারে একটু দুঃখিতও হয়েছিল। কি প্রয়োজন ছিল—অপ্সরী সেজে এরূপ অভিনয় দেখাবার?

তরুণ ক্ষমা-প্রার্থনা ক'রে চিঠি লিখেছে। লোক-মারফৎ অনেকবার খবর পাঠিয়েছে—তবুও অরুণ আস্‌ছে না।

'তরুণের স্বপ্নে'র শেষ-অধ্যায় লেখা হয়েছে—দু'রকম দু'টো। একটা লিখেছে ঔপন্যাসিক তরুণ নিজে। আর-একটা লিখেছে লীলা—ছাপানো বারো ফর্মা গল্পটা প'ড়ে নিয়ে। লীলা জিদ্ ধরেছে—তার লেখা দিয়েই বইখানা শেষ করতে হবে। তরুণ পড়েছে মহা ফ্যাসাদে!

প্রচ্ছন্ননামে লীলাই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। 'লিলি'-নামে—লীলা ভালবাসে—'অমর'-নামে, অরুণকে। কিন্তু লিলির বিয়ে হ'লো—'সমর' নামে তরুণের সঙ্গে। অরুণকে লীলা মনে মনে ভালবাসে—গল্পের এ ইঙ্গিত লীলার অসহ্য!

তরুণ গল্পটা শেষ করেছে—নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে অদৃষ্ট-তুষ্ট তরুণের মৃত্যুতে, আর প্রেমিক অরুণের সঙ্গে বিধবা-লীলার মিলনে।

ভালবাসার হ'লো জয়! কিন্তু লীলা লিখেছে—তরুণের এ ভাষ্য একে-বারেই নাকচ্ ক'রে—তরুণকে বাঁচিয়ে রেখে। তরুণ ও লীলার ভাল-বাসা গ'ড়ে-ওঠার অন্তরায় ধূমকেতু-অরুণকে সে দিয়েছে অপমানিত ক'রে তাড়িয়ে। লীলার মুন্সীয়ানার শেষ-পর্য্যন্ত লীলা ও তরুণের মিলনটাই হয়েছে সুন্দর ও সার্থক!

লীলা তরুণকে স্পষ্ট ব'লে দিয়েছে—'তরুণের মৃত্যু হ'লো' এরূপ অশুভ ইঙ্গিত যদি 'তরুণের স্বপ্নের' শেষাংশে থাকে, তা'হলে সে একটা ম্যাচের কাঠি ঠুকে ফর্ম্মাগুলোকে জ্বালিয়ে দেবে, পুড়িয়ে দেবে।

গত পরশু একটা আপোষ-রফার প্রস্তাবে লীলা ও তরুণ দু'জনাই রাজী হয়েছে। দু'টি সর্ত্তে—তরুণ আবার শেষ-অধ্যায়টা রিরাইট্ করবেন। প্রথম সর্ত্ত—তরুণ মরবে না। দ্বিতীয় সর্ত্ত—অরুণকে অপ-মানিত করাও হবে না। সে নিজেই সরে পড়বে, ভদ্রভাবে, অবস্থা বুঝে। কিন্তু অরুণের সঙ্গে আলোচনা না ক'রে—তরুণ তার আদি-লেখাটা মোটেই পরিবর্ত্তন করতে রাজী নয়, এ কথাও লীলাকে সে ব'লে দিয়েছে।

—অরুণবাবু কি আমার বৈধব্য পছন্দ করেছেন? লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

—কোনো আপত্তি যখন করেনি, তখন তা'ছাড়া আর কি মনে করবো?

আজ বিকেলে সেজেগুজে এসে লীলা বল্লো—অরুণবাবু যখন আস্ছেন না, তখন আমিই যাই তাঁকে ধ'রে আন্তে?

উৎফুল্লভাবে তরুণ বল্লো—তুমি যাবে?

—কেন যাবো না? তোমাকে সুখী করবার জন্যে—আমি কি না-

করতে পারি ? বিশেষ কথা হচ্ছে—অরুণবাবু না-এলে তো বইখানা বেরুবে না ?

—কিন্তু তুমি গেলেও অরুণ কি আসবে ? যে অপমান তুমি তাকে করেছ……

—রেখে দাও তোমাদের মান-অপমান-রোধের কথা ! সেদিন যদি এই হাতে, পায়ের স্লিপার খুলে এক ঘা বসিয়ে দিতাম তাঁর পিঠে—তবুও তিনি নিশ্চয় আসতেন—একথা খুব জোর করেই বলছি আমি। আজ আবার আমিই গিয়ে, যদি এই হাতে তাঁর হাতখানা ধরি, নিশ্চয়ই আসবেন তিনি……

—ওকথা বলো না লীলা ! আমার বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে… তরুণের মুখখানা হঠাৎ একেবারে ম্লান হয়ে গেল। চোখ দুটো ভ'রে উঠলো জলে।

অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে তরুণের সেই ম্লান মুখখানি নিজের বুকের ভিতর চেপে ধরে লীলা বললো—লক্ষীটি আমার ! তোমাকে তো আমি কিছুই বলিনি ? বলিছি সেই ছোটলোক অরুণবাবুকে……

—অরুণ ছোটলোক নয় লীলা ! আমি জানি—আমার চেয়ে ঢের বড়লোক সে। অত্যন্ত বিচলিতভাবে তরুণ বলতে লাগলো—তুমি যে ভয়ানক কথা বলেছ—তার মানে তুমি নিজেই বোঝোনি। অরুণকে আমি তোমার চেয়ে বেশী জানি ও চিনি। মাথা হেঁট্ ক'রে কোনো অপমান সহ্য করবার মত ছেলে সে মোটেই নয়। স্লিপার মেরে তাড়িয়ে দিলে আমি তো এ জীবনে আর তোমার মুখ দেখতাম না লীলা ? অরুণ বুদ্ধি দেখে—তা'হলে কি বুঝবো ? বুঝবো—আজও সে তোমাকে ভালবাসে ! আমার চেয়েও অনেক বেশী ভালবাসে !

—আমি যদি বলি—সে তাঁর ভালবাসা নয়। অতি হীন রূপজ-মোহ। যেহেতু আমি সুন্দরী……

—কতটুকু সুন্দরী তুমি? তোমার চেয়ে ঢের-বেশী সুন্দরী একটী ফিলম্-ষ্টার, অরুণের পায়ে মাথা খুঁড়ছেন। আর অরুণ তাকে লাথি মেরে প্রত্যাখান করছে……

লীলা তা' জানে। লীলার কাছেই তো আছে অরুণের সে বাহাদুরী-দেখানো প্রত্যাখ্যানের চিঠি! বিস্মিতভাবে লীলা জিজ্ঞাসা করলো—তুমি তা' জানলে কি করে?

একটু হেসে তরুণ বললো—অরুণ যে আমার কত অন্তরঙ্গ বন্ধু তা'কি তুমি জানোনা লীলা? আমাদের জীবনে এমন কোনো রহস্য নেই—যা' আমরা পরস্পরের কাছে গোপন রেখেছি। সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী ফিলম্-ষ্টার, চোখের জলে ভিজিয়ে, যত চিঠি লিখেছেন অরুণের কাছে—তা' সবই অরুণ দেখিয়েছে আমাকে। অরুণের মত রূপগুণ ও স্বাস্থ্য, যে কোনো যুবকের কাম্য হ'লেও, ব্যক্তিগতভাবে আমি শ্রদ্ধা করি তার সংযমের বাহাদুরীকে। ইট্ ইজ্ ওন্‌লি রেস্‌ট্রেন্‌ট্—ছ্যাট্ ডিস্‌টিংগুইসেজ্ এ ম্যান্ ফ্রম্ এ বিস্‌ট্! তুমি হাত ধ'রলে—সত্যিই যদি সে আবার এখানে আসে—তা'হলে আমি কি বুঝবো জানো? আজও সে তোমাকে এত ভালবাসে যে—তোমার সব অত্যাচার সহ্য ক'রে—সে আনন্দ পায়। তোমার সব অন্যায় ক্ষমা ক'রে—সে সুখী হয়।

তরুণের উচ্ছ্বাস শুনে হঠাৎ লীলা কেঁদে ফেললো। কেঁদে কেঁদে ব'লতে লাগলো—কিন্তু কেন? কেন তিনি আমাকে আজও ভাল-বাসবেন? দুষ্টগ্রহের মত আমার জীবনের সব সুখ ও শান্তি নাশ ক'রে যাবে

কেন নষ্ট করবেন ? আমার চোখে অতি হীন, অতি নীচ ... তিনি……

—তোমার চোখে আমি কি লীলা ? তরুণ জিজ্ঞাসা করলো। তোমার রূপ-গুণে আকৃষ্ট হয়েই কি তোমাকে আমি বিয়ে করিনি ? সে কথা আমার বন্ধু না-জানলেও, তুমি তো জানো ? তোমার লেখা চিঠিখানা অরুণকে দেখিয়েছিলাম কেন ? তোমাদের ব্যবধানকে আরো বাড়িয়ে তুলতে—তোমাদের বোঝার ভুলকে আরো কেনিয়ে তুলতে ? অরুণকে আমি চিনতাম—অরুণের মনের খবরও জানতাম। অরুণ সম্বন্ধে তোমার ভুল শোধরাবার কোন্ সামান্য চেষ্টা করেছি আমি ? তোমাদের মিলন সম্ভব ক'রে তুলতে, কতটুকু আগ্রহ দেখিয়েছি আমি ? কোথায় ছিল আমার বন্ধু-প্রীতি ? কোথায় ছিল আমার সংযমের দাবী ? অরুণ তোমাকে এখনো ভালবাসে—একথা শুনলে অনুতাপে আমার বুকটা জ্বলে ওঠে ! তোমার মুখের দিকে চাইতেও লজ্জা বোধ হয়……

—আচ্ছা, তা'হলে একবার অরুণবাবুর কাছে আমি যাই ? খুব শান্তভাবে লীলা বললো।

—কেন ?

—তিনি না-এলে, 'তরুণের স্বপ্নে'র শেষ-অধ্যায় তো প্রেসে যাবে না ?

—আমার লেখাটাই কাল সকালে প্রেসে পাঠিয়ে দেব লীলা। তুমি আর কোনো আপত্তি ক'রো না……

—না, না, তোমার পায় পড়ি। চিরদিন আমার বুকে একটা ব্যথার কাঁটা ক'রে রেখো না, তোমার ও উপন্যাসখানাকে। আমি তো রাজী ... —অরুণবাবুর বিচার মানতে ? তবে কেন তুমি……

—অরুণ হয়তো তোমার লেখাটাই পছন্দ করবে। তুমি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছ, এটা রেকর্ড ক'রে রাখতে কোনো আপত্তি করবে না সে। কিন্তু আমি জানি—আমার মত বন্ধুদ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতকের শাস্তি মৃত্যু! আমার মৃত্যু হলেই সম্ভব হবে, তোমার সঙ্গে অরুণের মিলন। 'তরুণের স্বপ্নের' এ স্বাভাবিক পরিণতিটা কেন ক্ষুণ্ণ করবে লীলা? তাতে কি উপন্যাসখানার সাহিত্যিক-মূল্য হ্রাস হবে না? উপন্যাস তো বাস্তব-জীবনের আলেখ্য? সে হিসাবে জীবননাট্যের স্বাভাবিক ধারা উপন্যাসেও অব্যাহত থাকা উচিত……

অত্যন্ত দুঃখিতভাবে লীলা বললো—নিজের আত্মীয়-স্বজনের বুকে ব্যথা না দিলে বুঝি ঔপন্যাসিক হওয়া যায় না?

এমন সময় কানাই এসে খবর দিল—অরুণবাবু এসেছেন…

—এসেছেন? আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো লীলা। সে যখন অগাধ জলে ডুবে যাচ্ছিল, তখন যেন হাতড়ে পেলো একখণ্ড বাহাদুরী-কাঠ! ব্যস্তভাবে কানাইকে জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় তিনি?

—বাইরের ঘরে বসে আছেন……

—আমি তাঁকে উপরে ডেকে আনি…লীলা ছুটে গেল।

তরুণ একটু হাসলো। তার ধারণা অরুণের প্রতি লীলার বিরাগ ও বিরক্তি অতি কৃত্রিম। অন্তরে অনুরাগের ফল্গু বহমান না থাকলে, বিস্তারী-ভবনে গত একটা বছর লীলা কি ক'রে পারলো অরুণকে সে ভাবে সহ্য করতে? বিশেষ কথা হচ্ছে—রূপে, গুণে ও স্বাস্থ্যে—অরুণ যে তরুণের চেয়েও ঢের বেশী আকাঙ্ক্ষার পাত্র—একথা তরুণ কখনই ভুলতে পারছে না। অরুণকে প্রত্যাখ্যান ক'রে তরুণকে বিয়ে করা—

লীলার জীবনে হয়েছে, একটা প্রকাণ্ড ভুল ! লীলার পক্ষে তরুণ যেন একটা দুরন্ত অভিশাপ !

গালে হাত রেখে, অরুণ চুপ্ ক'রে ব'সে ছিল বাইরের ঘরে। লীলা ঘরে ঢুকতেই, সে একটু সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। মনে তার সন্দেহ ছিল—লীলা বোধহয় পছন্দ করবে না—তরুণের কাছে সে আবার এসেছে। চাকরীর মা-বাপ-আপীস-মাষ্টার ঘরে ঢুক্‌লে—গরীব কেরাণী যেরূপ বিব্রতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখায়, অরুণও ঠিক সেই ভাবে উঠে দাঁড়ালো। অরুণের এ দুর্ব্বলতার সুযোগ লীলা বরাবরই নিয়ে আস্‌ছে, কিন্তু আজ হঠাৎ তার এ কী পরিবর্ত্তন ! লীলা গলবস্ত্রে অরুণের পায়ে—একটা প্রণাম করলো। অরুণ অবাক্।

—এ আবার তোমার কোন অভিনয় লীলা ? বিস্মিতভাবে অরুণ জিজ্ঞাসা করলো।

লীলার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল।

শঙ্কিত অরুণ জিজ্ঞাসা করলো—কাঁদ্‌ছো কেন লীলা ? তরুণ ভাল আছে তো ?

—হ্যাঁ, চোখমুছে লীলা বল্‌তে লাগ্‌লো—আমার উপর আপনার কোন দরদ নেই, থাকৃতেও পারে না—তা' জানি। কিন্তু আপনার বন্ধুকে এভাবে মেরে ফেলছেন কেন—বলুন্ তো ?

—মেরে ফেল্‌ছি, মানে ?

—তাঁর টিবির কারণ তো আপনি······

—আমি ?······লীলা বলে কি ? অরুণের বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

—হ্যাঁ, আপনি। লীলা বল্‌তে লাগলো—কেন আপনি বিদ্যার্থী-ভবনে গিয়েছিলেন ? কেন সেখানকার সবাইকে তখন জানিয়ে দেন নি

যে আমরা স্বামীস্ত্রী নই? আজও কেন একটা বিয়ে করছেন না? বলুন তো—আপনার মতলব কি?

—মতলব?……অরুণ হাসতে লাগ্‌লো—কোনো জবাব দিল না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরুণের মুখের দিকে চেয়ে—লীলা জিজ্ঞাসা করলো—আপনার বন্ধুর লেখা 'তরুণের স্বপ্নে'র শেষ-অধ্যায় কি পড়েছেন?

—হ্যাঁ পড়েছি……

—আপনি তো জানেন—উপন্যাসখানির বিষয়-বস্তু হচ্ছে আমার জীবন? আমিই হচ্ছি তার কেন্দ্রীয় চরিত্র?

—হ্যাঁ, যে তোমাকে চেনে, দু'পাতা পড়লেই সে তা' বুঝবে…সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই…

—তা'হলে বন্ধুর লেখা শেষ-অধ্যায়ের প্রতিবাদ করেন নি কেন?

—কিসের প্রতিবাদ করবো আমি? তরুণ করেছে—সাহিত্য-সৃষ্টি। আমার প্রেসক্রুপ্‌শান্ নিয়ে তো কোনো রোগীর চিকিৎসা করেন নি সে? সাহিত্যের উপরে কি ডাক্তারের কোনো অপারেশান্ চলে?

—তাহলে বিধবা বন্ধু-পত্নীকে বিয়ে করার সুখের স্বপ্নটা আপনিও খুব তারিফ করেছেন বলুন্?

—তার মানে?

—তার মানে সাহিত্যিক করেছেন—সাহিত্য-সৃষ্টি! আর ডাক্তার করছেন টিবি-সৃষ্টি! আপনারা দুটি বন্ধুই আছেন সৃষ্টির আনন্দ নিয়ে। কিন্তু এই সৃষ্টি-নাশা হতভাগিনীর উপায় কি বল্‌তে পারেন? টপ্ টপ্ করে লীলার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো……

—আমি করছি টিবি-সৃষ্টি! দারুণ বিস্ময়ে অরুণ চেয়ে রইলো লীলার মুখের দিকে।

—নিশ্চয়ই—খুব জোরের সঙ্গে বললো লীলা। এখনও তাঁর টিবি হয় নি। কিন্তু আপনার চেষ্টা ও যত্ন থাকলে খুব শীগ্‌গীরই হবে। বন্ধুর বৌ লীলা আপনাকে আজও শ্রদ্ধা করছে—আপনার পায়ে মাথা নোয়াচ্ছে।' কিন্তু বিধবা-লীলা আপনাকে ঘৃণা না-করে পারবে না। আপনার ছায়া-মাড়ালেও গঙ্গা নাইতে যাবে······

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না লীলা! তুমি কি বলতে চাও······

—আমি বল্‌তে চাই—আজও কেন আপনি আশা করছেন—আপনার বন্ধুর মৃত্যু—আমার বৈধব্য—আর···না, না, সেকথা আমি ভাব্‌তেও পারি না অরুণবাবু! ছি, ছি, ছি, কেন আপনি 'তরুণের স্বপ্নে'র শেষ-অধ্যায় সমর্থন করলেন? চলুন তো একবারটি উপরে —শেষ-অধ্যায় আমিও একটা লিখেছি···আপনাকে পড়ে শোনাবো··· চলুন্, চলুন্···

অরুণকে সঙ্গে নিয়ে লীলা উপরে গেল।

অরুণ ভাব্‌ছিল—লীলার চোখে আগুন ছাড়া একফোঁটা জল তো সে কখনো দেখে নি! গলবস্ত্রে লীলা আজ তাকে একটা প্রণামও করেছে। লীলার এতখানি দীনতার কারণ কি? সত্যিই কি সে মনে করে—অরুণই একদিন হবে তরুণের মৃত্যুর কারণ? কী ভয়ানক কথা!

যখন-তখন লীলা অরুণকে অপমান করে—অপদস্থ করে। তবু অরুণ লীলাকে ভালবাসে। লীলার এ অভিযোগ তো মিথ্যা নয়? তরুণও কি মনে করে—অরুণ করছে লীলার বৈধব্য কামনা?' অরুণের বুকটা কেঁপে উঠলো! সত্যিই যদি সেই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে—'তরুণের স্বপ্নের' শেষ-অধ্যায়টা তরুণ লিখে থাকে, তাহলে আজ অরুণ তার তীব্র প্রতিবাদ করবে। তরুণকে সে আজ খুব স্পষ্ট ভাবেই

শুনিয়ে দেবে—লীলা-সম্বন্ধে সেরূপ কোনো দুর্ব্বলতাই নেই তার মনে। লীলাকে সে অত্যন্ত ঘৃণা করে। বন্ধুপত্নী না-হলে—এজীবনে হয়তো লীলার মুখ আর দেখ্‌তো না সে! লীলার প্রতি এই নির্ম্মমতার অভিনয় দেখাবার জন্যে—অরুণ আজ তার অন্তরকেও অস্বীকার করবে……

অরুণকে দেখেই তরুণ জিজ্ঞাসা করলো—এতদিন আসিস্ নি কেন রে?

—কেন আস্‌বো? উত্তেজিত ভাবে অরুণ বল্‌তে লাগ্‌লো—আমাকে কি মনে করিস্—গলায় বক্‌লেস্-বাঁধা তোদের একটা পোষা কুকুর? আত্মসম্মানের কোনো দাবীই কি নেই আমার?

—ছিঃ অরুণ! যা মুখে আস্‌ছে—তাই বলছিস্ যে……

—কেন বল্‌বো না? সত্যি, লীলা আমাকে কি মনে করে—বল্‌তো? বিদ্যার্থী-ভবন থেকে একদিন সে আমাকে কি ভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল—তাকি তুই শুনিস্ নি? তারপর সেদিন রূপ-যৌবনের অহঙ্কার নিয়ে, অপূর্ব্ব সেজেগুজে এসে, অকারণে আমাকে আবার অপমান করবার কি দরকার হয়েছিল—বল্‌তে পারিস্?

—সে জন্যে আমি তো ক্ষমা-প্রার্থনা করেছি তোর কাছে…দুঃখিত ভাবে তরুণ বল্‌লো।

—না না, আর দরকার নেই তরুণ! ঢের হয়েছে। আজ একটা খুব সোজা কথা, অতি সরলভাবে বলে যাচ্ছি তোকে—'লীলাকে আমি ঘৃণা করি—অত্যন্ত ঘৃণা করি।' মাঝে মাঝে এসে তোর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে রাজী ছিলাম—যদি লীলা এসে আমার সাম্‌নে না দাঁড়াতো। যদি লীলার মুখ—আমাকে আর দেখ্‌তে না হতো……

লীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তরুণ একটু হেসে বল্‌লো—লীলার উপর বড্ড চটে গেছিস্ যে……

—কেন চটবো না? আমি কি একটা মানুষ নই? যাক্ সে কথা। এখন, যে জন্যে এসেছি—বল্‌ছি শোন্…শোভাকে মনে আছে তো? সেই ফিলম্ ষ্টার মিস্…সো-এণ্ড্-সো! সে নিজেই একটা ছবি তুল্‌বে। গল্প-হিসেবে তোর 'তরুণের স্বপ্ন' খুব ভাল লেগেছে তার। আড়াই-হাজার পর্য্যন্ত—দিতে রাজী আছে। 'ফিলম্-রাইট্' বেচ্‌বি?

—আমার 'তরুণের স্বপ্ন' সে কোথায় দেখ্‌লো?

—আমিই একদিন 'ফাইল-কপিটা' পড়তে—দিয়েছিলাম তাকে। সে বল্‌ছে—অতি অপূর্ব্ব সিনেমা-ষ্টোরি। তাই তো সে 'ফিলম্-রাইট্' কিনতে চায়……

—গল্পের শেষ-দিকটা বোধ হয় মুখে বলেছিস্?

—হ্যাঁ, তবে তুই যা লিখেছিস্—তা' বলিনি…বলেছি আমার নিজের একটা 'ভারশান্'! সেই ভাবেই তোকে রিরাইট্ করতে হবে…

—সে আবার কি? একটা বালিশে হেলান্ দিয়ে, বিছানায় উপর কাৎ হ'য়ে ছিল তরুণ। হঠাৎ উঠে ব'সে বল্‌লো—তোর ভারশান্ কি বল্‌তো শুনি?

অরুণ বল্‌তে লাগ্‌লো—সমরের টিবি হয়েছে। বহুদিন ভুগ্‌ছে সে। ডাঃ অমর এসে রোজ দু'বেলা বন্ধু—সমরকে দেখে যাচ্ছে। লিলিও করছে অক্লান্ত সেবা ও শুশ্রূষা। এ পর্য্যন্ত তুই যা, লিখেছিস্—তাই ঠিক আছে। তারপর তুই লিখ্‌ছিস্—মৃত্যুকালে সমর তার বন্ধু অমরের হাতে লিলির হাতখানা চেপে ধ'রে বল্‌লো—'ভাই অমর! লিলিকে তুই বিয়ে করিস্'……শেষ পর্য্যন্ত লিলি ও অমরের মিলন! এইখানেই তো হ'লো তোর গল্পের যবনিকা?

—হ্যাঁ···

—আমার ভারশান্ হচ্ছে—সমর মরবে না। লিলির মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌বে—কেন তার রূপ-যৌবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে? কেন সে বহুদিন ধ'রে সেবা ও শুশ্রূষা করবে একটা কঙ্কালসার টিবি-রোগীকে? হঠাৎ একদিন সে তার এই দুর্ব্বলতা প্রকাশ করলো—ডাঃ অমরের কাছে। সলজ্জভাবে প্রস্তাব করলো—'ওঁকে কোনো হাঁস্‌পাতালে রেখে—চলুন অমরবাবু! আমরা পালিয়ে যাই কোনো দূর বিদেশে'··· ···ডাঃ অমর সে কথা শুনে চম্‌কে উঠ্‌লো। ঘৃণায় লিলির মুখের দিকে আর চাইতে পারলো না। সমরকে নিয়ে অমর চ'লে গেল—ওয়াল্‌টেয়ারে।

এক বছর পরে। সমর ফিরে এলো, রোগ সেরে ও নূতন স্বাস্থ্য নিয়ে···লিলি তখন ভয়ানক অনুতপ্ত। কিন্তু অমর কথ্‌খনো বল্‌লো না সমরের কাছে—লিলির সেই কুৎসিৎ প্রস্তাবের কথা···তাই তাদের মিলন আবার সম্ভব হলো···লিলি ও সমর সুখী হলো···লিলির মুখের দিকে চেয়ে অমর খুব হাস্‌তে লাগ্‌লো···লজ্জায় মাথা-নীচু ক'রে রইলো লিলি ···আমার ভাষ্য এইখানেই শেষ বা, ইতি।

—লিলি-চরিত্রটা যে বড্ড বিশ্রী হ'য়ে গেল অরুণ; লীলা কি এতে রাজী হবে? খুব চিন্তিতভাবে তরুণ বল্‌লো।

লীলা বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিল। হঠাৎ ভিতরে ঢুকে ব'লে উঠ্‌লো—কেন রাজী হবো না? সমরের মৃত্যুর পর ডাঃ অমরের সঙ্গে বিধবা লিলির সেই কদর্য্য মিলনের চেয়ে—অরুণবাবুর এ ভারশান্ ঢের ভালো। সাময়িক একটা ভুলকরা বা কর্ত্তব্য-চ্যুত হওয়া—স্ত্রী বা পুরুষ কারো পক্ষেই অসম্ভব নয়। শেষ-পর্য্যন্ত অরুণবাবু যে লিলির মর্য্যাদা বাঁচিয়েছেন

—বিধবা-লিলিকে ডাঃ অমরের অঙ্ক-লক্ষ্মী করেননি—সে জন্তে আমি তাঁকে অসংখ্য ধন্তবাদ জানাচ্ছি……

সোৎসাহে তরুণ বল্‌লো—তবে আর আমার আপত্তি কি? এইভাবেই শেষ-অধ্যায়টি আমি রিরাইট্ ক'রে ফেলি? কি বলিস্ অরুণ?

হাস্‌তে হাস্‌তে অরুণ বল্‌লো—আসল কথা কি জানিস্ তরুণ। ডাঃ অমরের চরিত্র অভিনয় করবো আমি। আমার সত্যিকার রূপ যাই-হোক না কেন—ছবির পরদায় একটু মহৎ ও মহানুভব সাজ্‌তে চাই··· দর্শকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে চাই……

বিস্মিতভাবে তরুণ বল্‌লো—বলিস্ কিরে? তুই ছবিতে নাব্‌বি?

—হ্যাঁ, জীবনটা বড্ডই শুকিয়ে উঠেছে তরুণ! তা'কে একটু সরস ক'রে তুল্‌বো···লিলি কে—শুন্‌বি?

—কে?

—শোভা নিজে। উইথ্ হুম্—আ'ই অ্যাম্ অল্‌রেডি—এন্‌-গেজ্‌ড্……

লীলা ও তরুণ দু'জনেই যেন একটু চম্‌কে উঠ্‌লো!

উৎফুল্লভাবে তরুণ বল্‌লো—সত্যি বল্‌ছিস্?

—মিথ্যে কেন বল্‌বো? কাল শোভা নিজেই আস্‌বে তোর এখানে, বই-কন্‌ট্রাক্ট্ করতে। তার কাছেই সব জান্‌তে পাবি……

তরুণ উঠে গিয়ে অরুণকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর তার হাতখানা ধ'রে ঝেঁকে বল্‌লো—আই উইস্ ইউ সাক্‌সেস্—মাই ডিয়ার বয়!

—আচ্ছা, তা'হ'লে আজ আমি আসি···গুড্ নাইট্!

অরুণ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

লীলা আগেই সিঁড়ি বেয়ে নীচেয় নেবে গিয়েছিল। সদর দরজার

ধারে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল সে। তাকে দেখেই অরুণ একটু হেসে বল্‌লো—আশা করি, তুমি খুব খুসী হয়েছ লীলা! তরুণ এখন নিশ্চয়ই সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বে—তোমরা দু'জনেই সুখী হবে……

—সত্যিই কি আপনি ছবিতে নাব্‌বেন! শোভাকে বিয়ে করবেন?

—তুমি কি পাগল হয়েছ?

—তবে যে বল্‌লেন……

—তোমার অনুরোধে—তরুণের ট্রিট্‌মেন্টের ব্যবস্থা করলাম। 'তোমাকে আমি ঘৃণা করি—আর ভালবাসি শোভাকে!' তোমার 'ডায়াগ্‌নোসিস্' অনুসারে—তরুণের জন্যে খুব ভাল 'সিলেক্‌শান্ অব্ মেডিসিন্' আর কি হ'তে পারে লীলা?

—কিন্তু এসব যখন মিথ্যে প্রমাণ হবে?

—কিছুই মিথ্যে প্রমাণ হবে না, অন্তত তরুণের কাছে। সে ব্যবস্থা আমিই করবো। তুমি কিচ্ছু ভেবনা। এখুনি একবার যাচ্ছি শোভার কাছে। শেষ-পর্য্যন্ত হয়তো আমি ছবিতে নাব্‌বো না। তা'তে কি আসে যায়? তরুণের কাছে তা' ইম্‌মেটিরিয়াল্………শোভা অভিনেত্রী। আমার অনুরোধে—বন্ধুপত্নী সেজে, তরুণের সঙ্গে সে যে অভিনয় করবে—তা'তে কোনো ত্রুটি থাকবে না। আজ আসি তা'হলে……

—একটু দাঁড়ান……চোখভরা জল নিয়ে, গলবস্ত্রে, আবার সে অরুণকে একটা প্রণাম করলো।

সস্নেহে লীলার মাথায় হাত রেখে অরুণ বল্‌লো—আমি তো পশু নই লীলা! তোমাদেরি মত একজন মানুষ। আমার দিক্ থেকে

কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই তোমার—কারণ, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি······

মিলিটারী ঢংয়ে বুকটা একটু ফুলিয়ে, হাতের মাসেল-দুটো মুচ্‌ড়ে —অরুণ লাফিয়ে গিয়ে উঠে বস্‌লো তার মোটর-সাইকেলে। তারপর নক্ষত্র-বেগে ছুট্‌লো বড় রাস্তা দিয়ে। অপলক চোখে লীলা চেয়ে থাক্‌লো সে দিকে। তার চোখ থেকে বড় বড় দু'ফোঁটা কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঝ'রে পড়লো···

আজ সাত দিন রায়মশাইয়ের কোনো খোঁজ নেই। লীলা একটু ভাবিত হ'য়ে পড়েছে। কথা ছিল—কলিকে হাঁসপাতাল থেকে নিয়ে, তিনি এসে উঠ্‌বেন লীলাদের বাড়িতে। তারপর যাবেন বিদ্যার্থী-ভবনে। নানা অসুবিধার জন্যে আজ ক'দিন লীলা নিজে হাঁসপাতালেও যেতে পারে না; বা কলির কোনো খোঁজ-খবরও রাখে না।

আজ সকাল-বেলায় তরুণ যখন চা-বিস্কুট খাচ্ছিল—তখন কানাই এসে একখানা চিঠি দিল তার হাতে। চিঠি পড়ে তরুণ ডাক্‌লো—লীলা!

লীলা এসে সাম্‌নে দাঁড়াল। তরুণ বল্‌তে লাগ্‌লো—দাদু চিঠি লিখেছেন—তোমার কলিদিকে নিয়ে তিনি বিদ্যার্থী-ভবনেই চলে গেছেন। সময় অভাবে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যেতে পারেন নি। সেখানকার নমোশূদ্রপাড়ায় নাকি হচ্ছে, এক বিরাট উৎসবের আয়োজন! সাম্‌নের পূর্ণিমা-তিথিতে। আমাকে আর তোমাকে যাবার জন্যে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন······

লীলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলো—যাবে?

তরুণ বল্‌লো—পূর্ণিমার তো এখনো দশদিন বাকি? দেখা যাক্‌—শরীরটা এ ক'দিন কেমন থাকে।

বিকেলের দিকে শোভার গাড়ী এসে থাম্‌লো—লীলাদের দরজায়। লীলা ছুটে গেল শোভাকে অভ্যর্থনা করতে। সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও তারা দু'জনাই দু'জনার সম্বন্ধে অনেক-কিছু জানে।

শোভা যে আজ আস্‌বে—লীলা ও তরুণ তা' জান্‌তো। খুব উৎসাহের সঙ্গে, লীলা নানারকম খাবার তৈরি করেছে—চায়ের সরঞ্জামও গুছিয়ে রেখেছে, আর তরুণকে ব'লে রেখেছে—বইয়ের দাম-দস্তুর সম্বন্ধে সে যেন কোনো কথা না-বলে। শোভার সঙ্গে লীলাই করবে সে আলাপ-আলোচনা। তরুণের তাতে কোনো আপত্তি নেই। সত্যি-কার সাহিত্যিকের পক্ষে দেনা-পাওনার দর-কষাকষি, শুধু যে অপ্রিয় ও অসুবিধাজনক তা' নয়—সে বিষয়ে তার অক্ষমতাও থাকে খুব। লীলা যেন তরুণকে একটা কঠিন দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে!

শোভা ছিল কোনো বিশিষ্ট ভদ্র-ঘরের মেয়ে। তার দাদা ছিলেন অরুণের সহপাঠী। সেই সূত্রে তরুণ ও অরুণ, দুজনাই শোভাকে চিন্‌তো। আত্মীয়-স্বজনের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার উদ্দেশ্যে—সুন্দরী শোভা যখন কলেজ থেকে পালিয়ে গিয়ে সিনেমায় যোগদান করলো—তখন তার আত্মীয়-স্বজনের মতো অরুণও খুব দুঃখিত হ'য়েছিল।

আজ শোভা ফিল্‌ম-ষ্টার! তার ছায়ারূপ বহু দর্শকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার নিখুঁৎ অভিনয়ের সুখ্যাতি। এ বিষয়ে শোভার প্রতিষ্ঠা ও বিখ্যাতি যতই বেড়ে উঠুক—রক্ষণশীল আত্মীয়-স্বজন তাকে আপন-জন ব'লে পরিচয় দিতে আজও রাজী নন্।

ঘরে ঢুকেই শোভা অতি বিনীত ভাবে তরুণকে একটা নমস্কার জানালো। তরুণও প্রতিনমস্কার জানিয়ে—একখানা চেয়ার দেখিয়ে ব'ললো—বসুন……

তারপর, তরুণের গল্প-সম্বন্ধে অনেক কথা হ'লো দুজনের মধ্যে। উপন্যাসকে ছবির পরদায় সাজিয়ে দেখাবার কৌশল ও সিনেমা-চরিত্রের বৈশিষ্ট বিচার করে শোভা যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিল—তা' থেকে তরুণ বুঝ্‌লো—সে শুধু চরিত্রাভিনয়েই কৃতিত্ব দেখায় নি—একজন ডিরেক্টার হিসাবেও একদিন বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারবে।

শেষে 'তরুণের স্বপ্নে'র 'সিনেমা-রাইটে'র মূল্য-সম্বন্ধে যখন কথা উঠ্‌লো, তখন তরুণ হঠাৎ হাত-জোড় ক'রে উঠে দাঁড়ালো। দরজায়-দাঁড়ানো লীলাকে দেখিয়ে বল্‌লো—সে-সম্বন্ধে শুধু বইয়ের নয়—এই বই-লেখকেরও মালিক হচ্ছেন উনি। আমি মানে—হার ম্যাজেষ্টিস্ মোষ্ট্ ওবিডিয়েন্ট্ সারভেন্ট্—ওন্‌লি! ওঁর সঙ্গেই কথাবার্ত্তা বলুন আপনি—আমি একটু ঘুরে আসি……

তরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটা চাকর এসে খাবারের টেবিলটা সাজিয়ে দিয়ে, তার উপর দু'গ্লাস জল রাখ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে ঢুক্‌লো কানাই, একটা ট্রেতে-সাজানো নানাবিধ খাবার নিয়ে।

অতি চমৎকার একটি সিনেমা—পোজ্ দেখিয়ে শোভা ব'ল্‌লো—করেছেন কি মিসেস্ ব্যনার্জ্জি! এক কাপ্ চায়ের সঙ্গে—এত খাবার কি কোনো মানুষ খেতে পারে?

লীলা একটু হেসে বল্‌লো—আপনাকে তো ঠিক আমাদের মত মানুষ মনে করিনি—আপনি হচ্ছেন ছায়াছবি! আপনার ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে

কি—তা' কি ক'রে জানবো বলুন? তাই একটু বাড়তি আয়োজন করে ফেলেছি···ভেবেছিলাম···আপনার গল্প-লেখকও বোধ হয়, এ বিষয়ে আপনাকে একটু সাহায্য করবেন। তিনি যখন রণেভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলেন—তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে, আমিই না হয় বস্‌ছি আপনার সঙ্গে। তাতে কোনো আপত্তি নেই তো?

—আপত্তি? বলেন কি? সে সৌভাগ্য থেকে তো অনেক দিন বঞ্চিত আছি! ছলছল চোখে শোভা তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো—আপনি বোধ হয় জানেন না—সিনেমায় জয়েন করার অপরাধে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমি অপাংক্তেয়! ছেলেদের সঙ্গে ব'সে, খাওয়া-দাওয়ার উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ আমাদের ভাগ্যে ঢের জোটে। এক জন ফিল্‌ম্ ষ্টারকে 'ওব্‌লাইজ' করবার হাঙ্‌গামো—ছেলেদের ভিতর খুব দেখ্‌তে পাই। কিন্তু কোথায় পাই আপনাদের মত মেয়েকে? এ লাইনে এলে—আপনাদের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগটা একেবারেই হারিয়ে ফেল্‌তে হয়। এই দুঃখটাই আমার মনে আজ সব চেয়ে বেশী। এখানে আজ খাবার-খাওয়ার চেয়েও, আপনার সঙ্গে এক-টেবিলে বস্‌বার—আনন্দটাই হবে আমার পক্ষে বেশী উপভোগ্য। একখান রুমাল বের করে শোভা তার সজল চোখদুটো মুছলো।

বাড়ির ভিতরের দিক্‌কার সব দরজা-জান্‌লাগুলো লীলা একে একে বন্ধ করতে লাগ্‌লো। তারপর ফ্যান্‌টাকে একটু জোরে চালিয়ে দিয়ে, বাইরের দিক্‌কার সব জান্‌লাগুলো সম্পূর্ণ খুলে দিল। শোভা বুঝলো না—লীলার উদ্দেশ্য কি?

—ও-দিককার দরজা-জান্‌লাগুলো ওভাবে বন্ধ করলেন কেন? শোভা জিজ্ঞাসা করলো।

একটু গম্ভীর ভাবে লীলা বল্‌লো—আপনাকে আজ আমি এমন কতকগুলি কথা বল্‌বো, যা' শুধু আপনি ছাড়া আর কেউ শুন্‌বে না, বা জান্‌বে না।

—এমন কি কথা! বিস্মিত ভাবে শোভা চেয়ে রইলো লীলার মুখের দিকে······

একটু হেসে লীলা বল্‌লো—আপনি বোধ হয় একটু ভয় পাচ্ছেন? কিন্তু, সে কথার ভিতর আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। মনে মনে আমিই ভয়ে শিউরে উঠ্‌ছি। ভাব্‌ছি—আপনি আমাকে কি মনে করবেন? হয়তো—কত ঘৃণার চোখেই দেখ্‌বেন আমাকে···

—আপনাকে ঘৃণার চোখে দেখবো? আমি? কী সর্ব্বনাশ! হঠাৎ কি আপনার মাথা-খারাপ হয়ে গেল—মিসেস্ ব্যানার্জ্জি?

একটু হেসে লীলা বল্‌লো—সম্পূর্ণ সুস্থ মাথায় আপনাকে বল্‌ছি আমি। কথাটা শুনলেই বুঝবেন যে—আমার পক্ষে সে, কী ভয়ানক কথা! আসুন তবে, খেতে খেতে বলি—নইলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে···

দুজনাই উঠে গিয়ে খাবাবের টেবিলে বস্‌লো। এক চুমুক চা খেয়ে নিয়ে—লীলা জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা, আগে বলুন তো —'তরুণের স্বপ্নের' ফিলম্ রাইটের জন্যে আপনি 'অথর'কে কত দিতে চান্?

—আমার প্রোপোজাল্ তো অরুণবাবুর সঙ্গে পাঠিয়েছিলাম! বাংলা আর হিন্দি দুটো ভারশান্—মোট আড়াই হাজার টাকা!

হাস্‌তে হাস্‌তে লীলা বল্‌লো—এখন আমি যদি বলি—ইন্-অ্যাড্‌ভান্স—আড়াই হাজার টাকা—আপনি আমাকে অল্‌রেডি দিয়েছেন, আর আমিও তা' এ্যাক্‌সেপ্‌ট্ করেছি—তাহলে বোধহয় খুব বিস্মিত হবেন। তাই নয় কি?

—কি বলছেন আপনি ?

—না না আমি আর কিছু বলছি না। এই নিন্ আড়াই হাজার টাকার—ষ্ট্যাম্প্ট্ রিসিট্—সাইন্ড্ বাই মি! এখন এইখানা দেখিয়ে আপনার 'অধরের' সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে ফেলুন···

রিসিট্খানা হাতে নিয়ে, ভাল করে দেখে শোভা বল্লো—নিশ্চয়ই আপনার মাথার কন্ডিশান্ খুব ভালো নেই মিসেস্ ব্যানার্জ্জি! কবে আপনাকে আমি আড়াই হাজার টাকা দিলাম? এ রিসিটের মানে কি?

—কয়েক মাস আগে, শিয়ালদা-ষ্টেশনে, একটা ছোটো স্যুটকেস হারিয়েছিলেন? লীলা জিজ্ঞাসা করলো।

শোভা চম্‌কে উঠ্লো। তার হাত থেকে চায়ের কাপ্টা মেঝের পড়ে ভেঙে গেল। দারুণ বিস্ময়ে লীলার মুখের দিকে চেয়ে রইলো সে! এ কী অসম্ভব কথা!

উচ্ছ্বাসিত আবেগে শোভার হাতখানা চেপে ধরে লীলা বলে উঠ্লো—উইল্ ইউ কাইন্ড্লি সেভ্ মাই অনার? যদিও আপনার সে স্যুটকেস্টা আমি চুরি করে ঘরে আনিনি—একটা ঘটনাসূত্রে এসে পৌঁচেছিল আমার কাছে—তবু কেন আপনার জিনিষ টাইম্‌লি ফিরিয়ে দিইনি—এ কৈফিৎটা নিশ্চয়ই চাইতে পারেন, আমাকে একটা চোরও মনে করতে পারেন···

—ছি, ছি, ও কথাটা আর বল্‌বেন না মিসেস্ ব্যানার্জ্জি! চুরিই যদি আপনার উদ্দেশ্য হতো, তা'হলে আজই বা কেন বল্‌বেন? আমি তো, ভুলেই গেছি—সে স্যুটকেসের কথা······

সজল চোখে লীলা সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো শোভার কাছে। জেল-কয়েদী তরুণের মরণাপন্ন অবস্থার কথা, নিজের নিরুপায় অর্থাভাবের

কথা। তারপর সুটকেসের ভিতর আড়াই হাজার টাকা দেখে—সে মনে করেছিল—ভগবানের দান! সাহিত্যিকের জীবন-রক্ষার জন্যে অভিনেত্রীর সাহায্য! লীলা এ ঋণের টাকা একদিন নিশ্চয়ই পরিশোধ করতে পারবে। ভগবান তাকে সে সুযোগও দিয়েছেন আজ……

বাধা দিয়ে শোভা জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা, তরুণবাবু কি সুটকেসের বিষয় কিছু জানেন?

—না। লীলা বলতে লাগ্‌লো—তিনি জানেন—আমার বাবার দেওয়া অনেক টাকা আছে, তাই দিয়েই সংসার চালাচ্ছি আমি। পরের অজ্ঞাতে, পরের টাকা ভাঙ্‌ছি জান্‌লে—এ ব্যাপারকে অতি ঘৃণিত চুরি ছাড়া আর কিছুই মনে করতেন না তিনি……

—দেখুন একটা কথা আমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পারছি নে…

—কি বলুন্ তো?

—সুটকেস্‌টা আমাকে ফিরিয়া দিয়ে টাকাগুলো তো চেয়ে নিতেও পারতেন আপনি? তা' কেন করলেন না? সত্যি বলতে—পরের টাকা চুরি করেছেন ভেবে, আপনার 'বাইটিং অব্ কন্‌সেন্‌স্' তো কিছু কম হয়নি এতদিন?

লীলার চোখ দিয়ে, জল গড়াতে লাগ্‌লো। অনেক্ষণ সে একটা জান্‌লা-পথে বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লো। সে দেখ্‌ছিল—রাস্তায় শ্রান্তিহীন, বিরামহীন, উত্তেজনা-মুখর জনস্রোত! ওরা সবাই কি ছুটোছুটি করছে অর্থ-ব্রহ্মের সন্ধানে? অর্থই কি মানব-জীবনের একমাত্র উপাস্য? অর্থশালীর গৌরব ও গর্ব্ব, অর্থহীনের অখ্যাতি ও লজ্জা, আজ তার চোখের উপর উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ছে!

ধনী শোভার সামনে ব'সে, ধন-বৈষম্যের লজ্জায় ও সঙ্কোচে দরিদ্র লীলার উঁচু-মাথাটা যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে—চোখদুটো মুছে লীলা বল্‌লো—ভেবেছিলাম আপনার ও নির্মম-প্রশ্নটার হাত এড়িয়ে যেতে পারবো। কিন্তু আপনি ওভার-ইন্‌টেলিজেন্ট্! আমাকে ষোল-আনা যাচাই না ক'রে রেহাই দেবেন না—তাও বুঝ্‌তে পারছি······

—না, না, আমাকে ভুল বুঝ্‌বেন না। অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে হাত-জোড় ক'রে শোভা ব'লে উঠ্‌লো—ও আড়াই হাজার টাকা আমার কাছে আজ একেবারেই ইম্‌মেটিরিয়াল্! প্রতিমাসে বহু টাকা আয় করছি—কিন্তু ব্যয়ের বিশেষ-কোনো 'ভাইস্' তো নেই আমার? ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বড্ড বেশী বেড়ে যাচ্ছে। তাইতো চেষ্টা করছি—সম্পূর্ণ নিজের টাকায় একটা ছবি তৈরি ক'রে, কিছু টাকা 'ডিস্‌পোজ্—অফ্' করতে। রিটার্ণ পাবার কোনো আশাই করি না। আড়াই হাজার কেন? তরুণবাবুর জন্যে পাঁচহাজারও আপনার বাড়িতে ব'য়ে দিয়ে যেতাম—যদি আমার সুট্‌কেস্‌টা ফিরিয়ে দিতেন। তার মধ্যে আমার জীবন-রহস্যের এমন কতকগুলো দলিল ছিল······

বাধা দিয়ে, লীলা বল্‌লো—কতকগুলো নয়—বলুন মাত্তর একখানা দলিল! বাকি-সব তো নেহাৎ বাজে। মাত্র একখানার ভিতরেই আপনার সঠিক মনের খবরটি পাওয়া যায়—আর, তার জন্যে আমিও চুরির চার্জে পড়্‌তে বাধ্য হয়েছি। আপনি যাঁকে ভালবাসেন, আমি তাঁকে করতাম অত্যন্ত ঘৃণা। তাঁর সাহায্য নিতে চাইনি ব'লেই—আপনার টাকা আমাকে ভাঙ্‌তে হ'য়েছিল। পাছে তিনি জান্‌তে পারেন—সেই ভয়ে ঘটনাটাও গোপন রাখ্‌তে হয়েছিল আপনার কাছে।

অপূর্ব একটি সিনেমা-পোজে লীলার দিকে চেয়ে—পেন্টকরা ঠোঁট-দু'খানিতে একটু দুষ্টু হাসি মাখিয়ে, শোভা জিজ্ঞাসা করলো—আজও কি, তাঁকে ঘৃণা করেন আপনি?

—না। ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। লীলা বল্লো। একথা স্বীকার করতে আজ আর আমার কোনো বাধা নেই যে—তার মত একজন উদার ও মহৎ লোককে, আমি অতি হীন ও নীচ মনে করতাম। সবে কাল আমার সে ভুলটা সম্পূর্ণ ভেঙেছে……

—তাই নাকি? শোভা খুব হাস্‌তে লাগ্‌লো। তারপর বল্লো—আচ্ছা, তাহলে আমার সুটকেসটা এখন এনে দিন্। এ রিসিটখানা রেখে দিন্ আজ। পরশু এসে, চেক্ দিয়ে নিয়ে যাবো……

—আবার চেক্ দেবেন কেন? আমি তো আজই সুট্‌কেসের সঙ্গে, এই রিসিট্‌খানা দিয়ে ঋণমুক্ত হ'তে চাই……

ছায়া-ছবির মত—সদর্প-অভিনয়ের ভঙ্গীতে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, শোভা বল্‌তে লাগ্‌লো—ঋণমুক্ত হ'তে আপনাকে আমি কখ্‌খনো দেবনা। আজীবন থাক্‌বেন আপনি—আমার কাছে ঋণী! কেন আমার জিনিষ আত্মসাৎ করেছিলেন? আপনি ফিরিয়ে দিলেও তো, আজ আর আমি পাচ্ছি না তাঁকে? আপনি কি জানেন—আপনার উপর রাগ ক'রেই আমি সিনেমায় জয়েন করেছি?

—আমার উপর রাগ করে? লীলা বিস্মিত ভাবে শোভার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

—হ্যাঁ। আপনার সেই ঘৃণার পাত্রটির চোখে—আমার চেয়েও, আপনি নাকি বেশী সুন্দরী! সে কথা আমি কোনোদিন স্বীকার করিনি। আপনার ফটোখানা পাশে রেখে—আরশায় নিজের মুখখানি

বহুবার দেখেছি। আমার চোখে, আমাকেই দেখেছি—আপনার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী! অরুণবাবুর বিচারের বিরুদ্ধে মনটা আমার ভয়ানক বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল। তাইতো আমি দেশবাসীর কাছে বিচারপ্রার্থী হ'য়ে ছিলাম—ছবির পরদায় নেবে! অভিনয় করতে করতে, দর্শকদের কাছে চিৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়—আমার চেয়ে বেশী সুন্দরী, তাঁরা আর কোথায়ও দেখেছেন কিনা? রূপের এত অহঙ্কার নিয়েও— আপনার দিক থেকে, তাঁর দৃষ্টি আজও ফিরাতে পারিনি। আমার এ দুঃখ রাখ্‌বার ঠাঁই আর কোথায় আছে বলুন তো?

—অরুণবাবুর সঙ্গে আপনার বিয়েটা তো আজও হ'তে পারে? লীলা বল্‌লো।

শোভার চোখদুটো সজল হ'য়ে উঠ্‌লো। চোখমুছে সে বল্‌লো—অসম্ভব। সিনেমায় নেবেছি ব'লে—তাঁর চোখে আজ আমি অত্যন্ত ঘৃণায় পাত্রী। শুনুন্ মিসেস্ ব্যানার্জ্জি! সামান্য আড়াই হাজার টাকার কথা কেন বল্‌ছেন? আপনি আমার যা' নিয়েছেন—তা' এজীবনে আর ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। চির-ঋণী আপনাকে থাকতেই হবে......

গভীর সহানুভূতিতে লীলার মন ভ'রে উঠেছিল। বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপরাধ স্বীকার ক'রে নিয়ে—ধম্‌কানি-খাওয়া অন্যায়কারীর মত ধীরে ধীরে সে পাশের ঘরে উঠে গেল। তারপর আল্‌মারী খুলে সুট্‌কেসটা এনে, টেবিলের উপর রাখ্‌লো শোভার সাম্‌নে।

নিখুঁৎ অভিনেত্রীর মত—হঠাৎ শোভা একেবারেই বদ্‌লে ফেল্‌লো তার কথার সুর আর মুখের ভঙ্গী। অতি প্রসন্নমুখে হাস্‌তে হাস্‌তে

বল্‌লো—অনেক বেয়াদপি করলাম—কিছু মনে করবেন না। আচ্ছা তা'হ'লে আসি—নমস্কার······

সুটকেস্‌টা হাতে নিয়ে শোভা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। লীলাও গেল তার পিছনে পিছনে।

একতলায় লীলার পড়ার ঘরে চুপটি ক'রে ব'সে ছিল তরুণ। শোভাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো—কথাবার্ত্তা সব ঠিক্ হ'লো আপনাদের ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। পরশু এসে চেক্ দিয়ে—কন্‌ট্রাক্ট্‌ করে যাবো···

একটু সঙ্কোচের সঙ্গে তরুণ বল্‌লো—একটা কথা জিজ্ঞেস্ করতে চাই—যদি কিছু মনে না করেন······

—কি বলুন ?

—বোধ হয় জানেন—অরুণ আমার বন্ধু ?

—নিশ্চয়ই জানি···

—আপনাদের বিয়ের তারিখটা কবে ঠিক হ'লো ? বল্‌তে যদি বাধা না থাকে···

একটু লজ্জিতভাবে হেসে শোভা বল্‌লো—তারিখ ঠিক হ'লে আপনিই তো জান্‌বেন সকলের আগে। আর—নেমন্তন্নের চিঠিও তো পাবেন দু'খানা···

—দু'খানা কেন ?

—এদিকে 'অথর'—ওদিকে 'ফ্রেণ্ড্‌'! যাকে বলে—বরের মাসী, ক'নের পিশি···ব'লেই শোভা খুব হাস্‌তে লাগ্‌লো।

তরুণও হাস্‌ছিল। কিন্তু লীলা অতি গম্ভীরভাবে চেয়েছিল, শোভার মুখের দিকে। একটা নমস্কার জানিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে শোভা গিয়ে

উঠে বসলো তার গাড়ীতে। তার গাড়ী আর শাড়ী দুটোই ছিল চকোলেট্ রংয়ের। ড্রাইভার ষ্টার্ট দিল।·····

চুপ ক'রে দরজায় দাঁড়িয়ে, লীলা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো সেই চলন্ত গাড়ীর দিকে। ধীরে ধীরে সে যখন অদৃশ্য হ'য়ে গেল, তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অতি অস্ফুট স্বরে লীলা ব'লে উঠ্‌লো—'অভিনেত্রীই বটে!'

(১১)

নমোশূদ্র-পল্লীতে আজ তিনদিন উৎসব চল্‌ছে। আরো বারোদিন চল্‌বে। উপলক্ষ্য—শ্যামসুন্দর-মন্দিরের স্তম্ভ-রোপণ বা ভিত্তিস্থাপন।

মেলা মিলেছে। নাগর-দোলা এসেছে। কত খাবারের দোকান, খেল্‌নার দোকান—ঘুড়ি, ফানুষ ও ভেঁপুর দোকান এসে মেলায় মাঠে ঠাঁই নিয়েছে। সারাদিন চল্‌ছে—অষ্টপ্রহরী নামকীর্ত্তন। দলের পর দল আস্‌ছে। কোথায়ও বা জারিগান—কোথায়ও বা তরজার লড়াই! দু'টো কবির দলও এসে হাজির হয়েছে। সন্ধ্যার পর চল্‌বে তাদের 'বেড়্—উতোর'। শেষ রাত্রে 'মোটা'ও গাইতে পারে।

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে কেষ্টযাত্রার আসর-গাওয়া সুরু হয়েছে। কেষ্ঠাকুর সাজ্‌বে নমোদের ত্রিনাথ। দিন থাকতে ফোঁটা-তিলক কেটেছে সে। তারপর ধড়া-চূড়া প'রে সাজ-ঘরেই চুপ্‌টি ক'রে ব'সে আছে। শ্রীরাধা সাজ্‌বে বামুনদের রসময়—ত্রিনাথের চেয়ে প্রায় দশবছরের বড়। সবে মাত্র পরামাণিক এসে শ্রীরাধার গোঁফ-দাঁড়ি চাঁচ্‌তে সুরু করেছেন। ভোঁতা ক্ষুরের কড়্‌কড়্-খড়্‌খড়্-শব্দ বেশ স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে!

মিঃ ও মিসেস্ ম্যাণিক্ আজ ভোরে এসে পৌঁচেছেন। রায়মশাই তাঁদের অভ্যর্থনার বিশেষ বন্দোবস্ত করেছেন। মাত্র দু'দিন তাঁরা থাক্‌বেন—এখানে।

মিসেস্ ম্যাণিক আইরীশ লেডি। ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অত্যন্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন তিনি। দুশো-বছর বৈদেশিক শাসন ও

শোষণের ফলে—ভারতের বিশ্ব-বিশ্রুত দারিদ্র্য-সম্বন্ধে তিনি একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখ্‌ছেন। তাই অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এসেছেন—বাংলার এই অন্তঃস্থলে একটি নিভৃত চাষী-পল্লীর অবস্থা দেখ্‌তে। যেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আলো এখনো প্রবেশ করেনি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও যাদের পেটে দানা নেই—পরিধানে বস্ত্র নেই—রোগ-ভোগে ঔষধ নেই—তারা কতখানি গাল ভ'রে হাস্‌তে পারে, একটা উৎসবের আয়োজনকে কতখানি সার্থক ক'রে তুল্‌তে পারে—মিসেস্ ম্যাণিক আজ তা' স্বচক্ষে দেখ্‌বেন।

এই বিদেশী বিদুষীর বিস্ময়ের সীমা ছিল না—যখন তিনি শুন্‌লেন ও দেখ্‌লেন—হিন্দুর মন্দির-প্রতিষ্ঠা-উৎসবে সহানুভূতি-সম্পন্ন অগণিত মুসলমান-প্রতিবেশী—বালক-বৃদ্ধ-যুবা—দলে দলে এসে, হিন্দুর গা-ঘেঁসে, সমস্ত আনন্দানুষ্ঠানে সানন্দে যোগদান করছে! কিন্তু কৈ—হিন্দু বা মুসলমান কারো গায়েই তো একটা ফোঁস্‌কা পড়্‌ছে না? কেউ কারো মাথা ভেঙে ধর্মান্ধতার পরিচয় দিচ্ছে না? হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কণ্ঠের সেই আনন্দ-কোলাহলে কান পেতে মিসেস্ ম্যাণিক অবাক্ হ'য়ে ভাব্‌ছিলেন—ভারতের নাগরিক জীবনে আজ যে 'কম্যুনাল্-টেন্‌শানে'র বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হচ্ছে—তা'কি তবে অবিসংবাদিত ভাবেই 'বৃটিশ-মেক্'! সাতশো বছরের মুসলমান-রাজত্বের পরেও বাংলার সুদূর পল্লীতে হিন্দুরা করছে সত্যপীরের পূজা ও দরগায় মানৎ! আর মুসলমানরা করছে—হিন্দুর যে-কোনো ধর্মানুষ্ঠানে আন্তরিক সহযোগিতা। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেই কি পরস্পরের এ সহনশীলতা ক্রমে অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে না?

কালিকে যে সব নয়োরা মেরেছিল—তাদের ঘরদরজা নূতনভাবে

তৈরি হয়েছে। নগত টাকা দিয়ে, আজ তারা সুদ-খোর মাহাজনদের দেনার দায় থেকে মুক্তি পেয়েছে। সবদিক থেকেই আজ তারা—পরম সুখে সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ করছে। কিন্তু একটা ব্যথার স্মৃতি আজও তাদের বুকের ভিতর কাঁটার মত বিঁধে আছে—ক্যাব্‌লা তো বেঁচে নেই! কলিকে যেদিন তারা নির্ম্মম প্রহার করেছিল—তার দু'দিন পরেই—হঠাৎ মাত্র একদিনের জ্বরে কেবলকৃষ্ণ দেহরক্ষা করেছিল। ক্যাব্‌লার মা এসে আজ কলির পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রে কাঁদছে আর বল্‌ছে—তুমি সবাইকে করলে ক্ষমা—আর আমাকে দিলে শাস্তি? কিন্তু, আমার অপরাধ কি মা?

সে কথা শুনে কলি একটু হেসে বল্‌লো—কেন কাঁদছো বাছা? তোমার কেবলকৃষ্ণকে বাঁচিয়ে তুল্‌বার জন্তেই তো এই উৎসবের আয়োজন। শ্যামসুন্দর-মন্দিরে কার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে, তা, জানো?

একটা পুট্‌লির ভিতর থেকে কালো পাথরে খোদাই করা, অতি মধুর হাসিভরা-মুখ একটি বংশীবাদন মূর্ত্তি-বিগ্রহ বের ক'রে সে ক্যাব্‌লার মাকে দেখালো। তারপর বল্‌তে লাগ্‌লো—কাল শুভক্ষণে মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন হবে—পরশু থেকে আরম্ভ হবে কাজ। তারপর এক মাসের বেশী লাগবে না, এই কেবলকৃষ্ণ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতে। আমি কিশোরী সেজে কৃষ্ণ-কিশোরের আরাধনা করবো—আর তুমি সাজ্‌বে মা-যশোদা। তোমার কেবলকৃষ্ণকে তুমিই তো নাওয়াবে, পরাবে, খাওয়াবে! কেউ তা'তে কোনো—বাধা দেবে না। মানুষকে স্বামী পুত্র ভেবে, বুকে জড়িয়ে ধ'রে তো কোন লাভ নেই? সে তোমাকেও মারবে—নিজেও মরবে! তোমাকেও ঠকাবে—নিজেও ঠকবে! সে প'চে যায়, গ'লে যায়, দুর্গন্ধ হ'য়ে ওঠে! তার চেয়ে এই তো বেশ!

এর হাসি কখনো ম্লান হবে না—এর বাঁশী কখনো থেমে যাবে না। এর ভিতর কোনো মোহ নেই—মাদকতা নেই। এযে অতি মধুর অতি অনাবিল, আনন্দ-রসঘন-শ্যাম!

নমোদের অনেক মেয়ে-পুরুষ সেখানে দাঁড়িয়ে কলির কথাগুলি শুনছিল। ক্যাবলার মাকে কলি কি বলছে—তা' শুনবার জন্যে রায়মশাইও ছুটে এসেছিলেন। তাঁর চোখ দু'টি জলে ভ'রে উঠলো। ক্যাবলার মা কলির সব কথা বুঝলো না বটে—তবু সাময়িকভাবে পুত্রশোক ভুলে গেল—ক্যাবলার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কথা শুনে। সে শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইলো কলির আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে। সত্যিই কি সে আবার ক্যাবলাকে ফিরে পাবে?

কথা ছিল, লীলা ও তরুণ আজ এসে পৌঁছোবে। রায়মশাই বার বার ষ্টেশানে লোক পাঠাচ্ছেন, কিন্তু তাদের কোন খোঁজ নেই। ব্যাপার কি? একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তিনি।

এদিকে লীলা পড়েছে মহা ফ্যাসাদে। কিছুদিন ধ'রে শ্রীমান্ কানাই, বিনা-টিকিটে ট্রামে ও বাসে উঠে—'পিক্-পকেটিংয়ের ট্রেনিং' নিচ্ছিল। হাত প্রায় পেকে এসেছে—এমন সময় হঠাৎ সে ধরা পড়ে গেল। ট্রামের লোক বেজায় প্রহার করতে লাগলো তাকে। সহ্য করতে না পেরে কানাইচন্দ্র চলন্ত ট্রাম থেকেই লাফিয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। ফলে, হাঁটুভাঙা দ-সেজে, এম্বুলেন্সে চেপে—কোন এক হাসপাতালে গিয়ে পড়ে আছেন আজ।

বেচারাকে সেই অবস্থায় ফেলে, লীলা কি ক'রে কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে? তার তো মাও নেই, বাপও নেই! একমাত্র লীলাই তাকে বেঁধেছে একটু স্নেহের বাঁধনে। শুধু লীলার কাছেই পায় সে

কোনো দুষ্টুমির জন্তে মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে পরিপূর্ণ ক্ষমা। ট্রামের লোকগুলো কী নির্দয়! কানাইয়ের অবস্থা দেখে লীলার চোখ দুটি সজল হ'য়ে উঠেছিল।

শ্রীমান্ কানাই পৌরাণিক প্রহ্লাদ-মার্কা ছেলে। দু'তিন দিনের মধ্যেই তার গায়ের ব্যথা সেরে গেল। কিন্তু তার একখানা পা বাঁধা পড়লো—প্লাস্টারের শক্ত ও মজবুত ঠোঙার ভিতর। হাঁটুর একখানা হাড় নাকি টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙে গেছে।

কমলালেবু ও ডালিম-বেদানা নিয়ে, লীলা রোজই একবার আসে কানাইকে দেখ্‌তে। আজ কানাই তাঁর বাঁধা-পাখানা হাতে তুলে নিয়ে, এক-পায়ে সারা হাঁসপাতাল-বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লীলা বল্‌লো—তোমাকে তো এখনো প্রায় মাসখানেক এই হাঁসপাতালে থাকতে হবে কানাই!

—কেন?

—ডাক্তাররা বল্‌ছেন—হাড়গুলো সম্পূর্ণ না-জুড়্‌লে প্লাস্টার খোলা চল্‌বে না। আমি দিন কয়েকের জন্তে—কলকাতার বাইরে যাচ্ছি—সাবধানে থেকো…

—কোথায় যাচ্ছ?

—বিদ্যার্থী-ভবনে…

…আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

—ছিঃ অবুঝ হ'তে নেই। এভাবে বাঁধা-পা নিয়ে যাবেই বা কি ক'রে? কানাই কাঁদতে লাগ্‌লো। লীলা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো।

লীলা কলকাতা থেকে চলে যাবে ভেবেই কানাইয়ের মন অস্থির

হ'য়ে উঠেছে। দিনরাত তার একমাত্র চিন্তা—কি উপায়ে এই হাসপাতালের গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারে? হঠাৎ নজরে পড়্‌লো, এক কালাজ্বরের রোগী। লোকটার একখানা পা নেই। বগলে-বাধানো একটা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি লাঠির মাথায় দেহভার রেখে সে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে। কানাই মনে মনে মতলব আঁটলো, লোকটা যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন ওই লাঠি নিয়েই সে বেরিয়ে পড়বে। কানাইয়ের পক্ষে লাঠিটা একটু বেশী উঁচু হ'তে পারে। তা' হোক্। নীচের দিক থেকে খানিকটা কেটে বাদ দিলেই তো চল্‌বে। একবার যদি সে শিয়ালদা পৌঁছোতে পারে, তাহ'লে তাকে আর পায় কে? পথ-খরচ? তার জন্তে কোন ভাবনা নেই। কত বেকুব-লোক বুক-পকেটে মানিব্যাগ রেখে, টান্-টান্ হ'য়ে ঘুমিয়ে আছে প্ল্যাটফরমে। আজ পর্য্যন্ত কানাই একটি মাত্র সনাতন-নীতি অনুসরণ ক'রে চলে আস্‌ছে—তা' হচ্ছে—তরুণের লেখা একটি কবিতা…

আমার যা-কিছু প্রয়োজন, আমি যে-কোনো উপায়ে চাই—
তোমার কি হবে?—তুমি তা, ভাবিও—মোর অবকাশ নাই।

আজ বিকেলে লীলা ও তরুণ এসে বিদ্যার্থী-ভবনে পৌঁচেছে। কাল সকালে মিঃ ও মিসেস্ ম্যাণিক কলকাতায় ফিরে যাবেন।

এক বিরাট জনসভায় মিঃ ও মিসেস্ ম্যাণিককে বিদায়-অভিনন্দন দেওয়া হচ্ছিল। রায়মশাই ছুটে এসে লীলা ও তরুণকে অভ্যর্থনা করলেন। লীলাকে নিয়ে বসিয়ে দিলেন মিসেস্ ম্যাণিকের পাশে। তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লেন লীলাকে পেয়ে।

সভাপতি—স্থানীয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মাননীয় পীর-সাহেব। বক্তৃতা করছিলেন—বিদ্যার্থী-ভবনের প্রধান-শিক্ষকমশাই। দানবীর মিঃ

ম্যানিকের বদান্যতা-সম্বন্ধে তিনি মাত্র দুটি কথা বলবেন—ব'লে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন—কিন্তু প্রায় ঘণ্টাখানেক অনর্গল বক্তৃতা দেওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে—তার উৎসাহ বিন্দুমাত্র হ্রাস হয়নি। কখনো-বা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বাংলায়, কখনো-বা হাত-পা ছুঁড়ে ও দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ইংরেজিতে—পৃথিবীর ইতিহাসে যেখানে যত দানবীরের উল্লেখ আছে, তাঁদের একটা ফিরিস্তি দাখিল করতে আরম্ভ করেছেন।

মিঃ ম্যানিকের মুখের দিকে চেয়ে তরুণ চমকে উঠলো! ইনিই তো সেই জেল-কয়েদীদের রেশান-সাপ্লায়ার! ইনিই তো সেই কনট্রাক্টার-পুঙ্গব—যিনি মানুষকে গো-মহিষের খাদ্য খাইয়ে অর্থোপার্জন করেন! যার খাদ্য-সরবরাহের প্রতিবাদে তরুণ ও তার সঙ্গী-দশজন রাজনৈতিক-কয়েদী বাধ্য হ'য়েছিল অনশন-সত্যাগ্রহ করতে! তারই এই অভিনন্দন? তারই গলায় এত ফুলের মালা? সমাজে তার এই সম্মানের পূজা—তরুণের চোখে অসহ্য মনে হচ্ছিল।

মিঃ ম্যানিক বহু টাকা দান করেছেন—বিদ্যার্থী-ভবনে। তারপর আজ কলির অনুরোধে—নমোশূদ্র-পল্লীর সকল অভাব-অভিযোগ দূর করতে প্রস্তুত হ'য়েছেন। নিজে খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী হ'য়েও, হিন্দুর দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠার জন্যে করছেন—অকাতরে অর্থব্যয়। স্থানীয় জনসাধারণের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। বক্তারা সবাই বলছেন—দাতা শতং জীবতু! শ্রোতারাও মাঝে মাঝে সোল্লাসে চিৎকার ক'রে উঠছেন—'জয়—দানবীর মাণিক্য-সাহেবের জয়!'

হঠাৎ তরুণ উঠে দাঁড়ালো—সে একটু বক্তৃতা করবে। মাথায় গান্ধী-ক্যাপ্ ও খদ্দরপরা তরুণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। মিঃ ম্যানিক একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। লীলার কাছে পরিচয়

জেনে, মিসেস্ ম্যাথিক খুব আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠ্লেন—তরুণের বক্তৃতা শুন্তে। বাংলা-কথা বেশ বুঝ্তে পারেন তিনি—যদিও ভালো বল্তে পারেন না।

যথারীতি সভাপতি সাহেব ও সমবেত সভ্যগণকে সম্বোধন ক'রে তরুণ বল্তে লাগ্লো—আপনারা জানেন, হিঁদুরা গোবধ করেন না—কারণ, গরু তাঁদের পরম পূজনীয় দেবতা। কিন্তু—কোনো গোহত্যাকারী কসাই যদি গরুর চাম্ড়া দিয়ে এক জোড়া জুতো তৈরি করে—আর সেই জুতো-জোড়া দান করে, কোনো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে—গঙ্গাজলে ধুয়ে, আর সচন্দন-তুলসী-পত্রে মুড়ে! তা'হলে সেই ব্রাহ্মণও কি আশীর্ব্বাদ করবেন—'দাতা শতং জীবতু' ব'লে—সেই গো-ঘাতক কসাইকে?

যদি কোনো অতি নৃশংস, অমানুষ দানবীর তাঁর দানের গর্ব্ব নিয়ে আপনাদের সাম্নে এসে দাঁড়ান, আপনারা কি বিচার ক'রে দেখ্বেন না—কে সেই মহাপুরুষটি? তাঁর দানের মর্য্যাদাই বা কতটুকু—আর তাঁর দাতব্য নিরাপত্তে গ্রহণ-যোগ্য কিনা?

হাজার হাজার ক্ষুধিতের মুখের অন্ন কেড়ে এনে, যদি কোনো সহৃদয়-দাতা আপনাদের এই সভায় এসে পয়সায় বিতরণ করতে ইচ্ছা করেন—আপনারা কি তা' গ্রহণ করতে লালায়িত হবেন? যদি কোনো—আততায়ী দস্যু—ওই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে, সামান্য পাথেয়-সম্বল—পথচারীর বুকে ছুরি মেরে অর্থ-সংগ্রহ করে, আর সেই অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে একটি দেবমন্দির! দেবতা কি সেখানে আস্বেন—আপনাদের পূজা পাওয়ার লোভে?

'দানবীর মাণিক্য-সাহেবের' জয়ধ্বনিতে আজ এই জনসভা

মুখরিত হচ্ছে। আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই—আপনারা কি জানেন—কে এই মিঃ ম্যাণিক? তাঁর দাতব্য অর্থ-সম্পদ কি পৈতৃক—না, স্বোপার্জ্জিত? স্বোপার্জ্জিত হ'লে, কোন্ সাধু-পন্থায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত—দু'হাতে যথেচ্ছ-বিতরণেও, অফুরন্ত—অর্থোপার্জ্জন করেছেন তিনি?

সমবেত সভ্যগণ চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন। চারিদিকে বিশৃঙ্খল-অবস্থা সৃষ্টি হ'লো। স্থানীয় শিক্ষিত যুবকগণ কংগ্রেস-কর্ম্মী তরুণ ব্যানার্জ্জির নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। দলবদ্ধভাবে তাঁরা সকলেই তরুণের স্পষ্টভাষিতার পক্ষপাতী হ'য়ে উঠ্‌লেন। সমবেত কণ্ঠে তাঁরাও দাবী জানালেন—'মিঃ ম্যাণিকের পরিচয় জান্‌তে চাই'···'বলুন তিনি কে?'

অন্যদিকে, মিঃ ম্যাণিকের কাছে কৃতজ্ঞ ও অর্থ-সাহায্যে বশীভূত স্থানীয় নমোশূদ্র সম্প্রদায়—তরুণের বক্তৃতার অত্যন্ত বিরোধী হ'য়ে উঠ্‌লেন। চারিদিকে দলগত রেষারেষির উচ্চ চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুইটি প্রবল দলের সংঘর্ষ যেন অনিবার্য্য হ'য়ে উঠ্‌লো। সভাপতি পীরসাহেব ছিলেন—নিতান্ত ভালোমানুষ। নিজেকে তিনি অত্যন্ত বিপন্ন মনে করতে লাগ্‌লেন।

তখন রায়মশাই উঠে দাঁড়ালেন। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে স্থানীয় জনসাধারণ তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। তাঁর বক্তব্য শুন্‌বার জন্যে, সকলেই শান্ত ও সংযত ভাব ধারণ করলেন।

রায়মশাই বল্‌তে লাগ্‌লেন—একজন দাতাকে এই সভাস্থলে অপমানিত করবার উদ্দেশ্যে জনৈক তরুণ-যুবক যে সমস্ত যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন—তার প্রতিবাদে আমি কয়েকটি কথা বল্‌তে চাই, আশা করি আপনারা ধৈর্য্য-ধারণ করে আমার কথাগুলি শুনবেন।

প্রথম কথা হচ্ছে—স্থানীয় যুবকরাও জানতে চেয়েছেন মিঃ ম্যানিক কে? তার উত্তরে আমি বলছি—মিঃ ম্যানিক একজন বাঙালী-খৃষ্টান। খৃষ্টান হ'লেও ধর্ম্ম-বিষয়ে তাঁর কোনো গোঁড়ামি নেই। তিনি তাঁর প্রতিবেশীর ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করেন। শুধু একটি হিন্দু-দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ-সাহায্য করেননি—স্থানীয় মুসলমান-সম্প্রদায়কেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—একটি মসজিদ-নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন তিনি।

যুবক-সম্প্রদায় কি জানেন না—ভারতের সমস্ত গ্লানির মূল-কারণ—দুইটি বিশিষ্ট-ধর্ম্মমতের অহেতুক বিরোধিতা? আজ একজন বাঙালী-খৃষ্টান আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন—তাঁর বুকের অর্দ্ধেক-হিন্দু, আর বাকি অর্দ্ধেক-মুসলমান। আমি আশা করি—তাঁর এই আদর্শের প্রতি আপনারা সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নত করবেন।

সভাপতি করতালি-ধ্বনি করলেন। সমস্ত জনসঙ্ঘও করতালি দিয়ে, তাঁর সে উচ্ছ্বাস সমর্থন করলেন।

একটু থেমে রায়মশাই আবার বলতে লাগলেন—আমার পূর্ব্ববর্ত্তী যুবক-বক্তা দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—তিনি অর্থোপার্জ্জন করেছেন—সাধু পন্থায়, কি অসাধু পন্থায়? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে? মিঃ ম্যানিক যদি চুরি-ডাকাতি করতেন—তা'হলে সে অপরাধে নিশ্চয়ই জেল খাটতেন? কিন্তু ওই যুবক-বক্তার মত তাঁর কপালে তো কোনো জেলের ছাপ নেই?

দেশের আইন-আদালত যাঁকে কোনো দিন 'চোর' বলেনি—তাঁকে 'চোর' বললে মানহানির দায়ে পড়তে হয়—এ কাণ্ডজ্ঞানটুকু সবারই থাকা উচিত।

তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ ক'রলো—দেশের আইন-আদালত বলবেন না, বলুন—বৈদেশিক শাসন-পদ্ধতি ; বলুন—দায়িত্বহীন শাসক-সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণ-চেষ্টার কুৎসিৎ অনাচার......

রায়মশাইও সে প্রতিবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন—তা'হলে যতদিন তোমাদের স্বরাজ-গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত না-হচ্ছে, ততদিন মিঃ ম্যাণিকও চোর নন্! তাকে 'চোর' বলবার দুঃসাহস প্রকাশ করাও কারো পক্ষে সঙ্গত নয়......একথা আমি ব'লবোই......

উত্তেজিত ভাবে তরুণ বললো—মিঃ ম্যাণিকের মত অনাচার-পুষ্ট লাইসেন্স-ওয়ালা চোরকে—চোর বলবার সৎসাহস, যতদিন জন-সাধারণের বুকে না-জাগবে—ততদিন স্বরাজ-গবর্ণমেণ্টও প্রতিষ্ঠিত হবে না। এই সব দেশ-প্রেমের মুখোস্-পরা দেশদ্রোহীরাও শাস্তি পাবে না......

এমন সময় কে যেন পিছন দিক থেকে, একটা গিঁট্‌তোলা মোটা লাঠি দিয়ে—প্রচণ্ড আঘাত করলো তরুণের মাথায়। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো! তরুণ অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেল। রায়মশাই ছুটে এসে, তরুণকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠলেন—ওরে তোরা কী সর্বনাশ করলি? ও লাঠির আঘাতটা আমার মাথায় মারলি না কেন? আমার এই দাদু যে একটা মানুষের মত মানুষ! যার ভিতর কোনো ফাঁকি নাই, মেকি নেই—যার মাথাটাকে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেও—সে তোদের কারো কাছে মাথা-নীচু করবে না। সত্যাশ্রয়ীর উঁচু-মাথা—চিরদিনই উঁচু থাকবে!

হাতে-পায়ে জনতাকে দলিত ও মথিত ক'রে—বহুদূর থেকে তীরবেগে ছুটে এলো অরুণ। অরুণকেও রায়মশাই নিমন্ত্রণের চিঠি

প্রাপ্তিবেছিলেন। সে এসেছিল—সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবে; লীলা ও তরুণের কাছে—আত্মপ্রকাশ করবার ইচ্ছা ছিল না তার। ভেবেছিল—খুব গোপনে এসে, উৎসব দেখে—খুব গোপনেই পালিয়ে যেতে পারবে। সুদূর সিঙ্গাপুরে একটা চাকরী পেয়েছে সে—দু'এক দিনের ভিতর জাহাজে চাপ্‌বে। তার আগে রায়মশাইয়ের সঙ্গে খুব গোপনে একবার দেখা ক'রে—তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে খুব গোপনেই ফিরে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল তার। কিন্তু চোখের উপর হঠাৎ যে দুর্ঘটনা ঘট্‌লো, তার ফলেই অরুণ পারলো না, তার আসা-যাওয়ার গোপনতা রক্ষা করতে। ছুটে এসে তরুণকে জড়িয়ে ধরলো!

কিছু আগে সভা যখন বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছিল, স্থানীয় যুবক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে—নমোশূদ্রদের সংঘর্ষের সম্ভাবনা আসন্ন মনে হয়েছিল, তখন মিসেস্ ম্যানিক লীলাকে ও অন্যান্য স্ত্রী-সভ্যাদিগকে সঙ্গে নিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন—নিকটবর্ত্তী বিদ্যার্থী-ভবনে রায়মশাইয়ের আশ্রমে। হঠাৎ তরুণের আহত-হওয়ার দৃশ্যটা লীলা বা মিসেস্ ম্যানিক দেখ্‌তে পান্‌নি।

মিঃ ম্যানিক যে অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করতেন সে কথা মিসেস ম্যানিকের অজানা ছিল না। কিভাবে বড় বড় সরকারী-কর্ম্মচারীদিগকে ঘুস্ দিয়ে—আর, মাঝে মাঝে টি-পার্টিতে ভূরি-ভোজনের আয়োজন ক'রে, মিঃ ম্যানিক সুকৌশলে নিজের কাজ বাগিয়ে নিতেন—একগুণ ব্যয় ক'রে দশগুণ লাভ করতেন—তা' আর কেউ না জানলেও, মিসেস ম্যানিক নির্দ্দিষ্ট ভাবেই জান্‌তেন। বাইরে কিছু প্রকাশ না-করলেও মনে মনে তিনি তরুণের উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে উঠেছিলেন। হঠাৎ লজ্জিত লীলার হাতটা চেপে ধ'রে বলে উঠ্‌লেন—

আই কন্‌গ্রাচুলেট্ ইউ, মিসেস্ ব্যানার্জি! টু হাব্, সাস্ এ পার্টনার ইন্ লাইফ—হুজ বোল্ড্‌নেস—আই অ্যাড্‌মায়ার! হুজ্ ম্যান্‌লিনেস্—আই অ্যাডোর!

লীলা অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকলো। মনে মনে বুঝলো—কোনো জাতি যখন বড় হ'য়ে ওঠে, তখন সে তার ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে চেয়ে—অনুভূত সত্যকে অস্বীকার করে না। নিজের ক্ষুদ্রতা বা সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ডিঙিয়ে, মানবতার বৃহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'তে চেষ্টা করে ব'লেই—সে তখন জাতি-হিসাবে উন্নত ও সম্মানিত।

অরুণ যখন সংজ্ঞাহীন তরুণের রক্তাক্ত দেহটা কাঁধের উপর ফেলে—উত্তেজিত মত্ত-মাতঙ্গের মত আশ্রমে এসে পৌছালো, তখন লীলাকে সঙ্গে নিয়ে, আশ্রমবাড়ির চারিদিকে ঘুরে এসে—মিসেস্ ম্যাণিক দাঁড়িয়েছিলেন বকুলতায়। বিদ্যার্থী-ভবনের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা, টুপটাপ্ ক'রে ঝ'রে-পড়া সগু-ফোটা বকুলফুল কুড়িয়ে এনে মালা গাঁথ্‌ছিল। তাদের দেওয়া দু'গাছা মালা গলায় প'রে—ফাঁকা-মাঠের দিকে চেয়ে—মিসেস্ ম্যাণিক দেখ্‌ছিলেন—অস্তগামী রক্তবর্ণ সূর্য্যের রং-ফলানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য!

হঠাৎ রক্তাক্ত-তরুণকে দেখে মিসেস্ ম্যাণিক চিৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—ও! ও! হোয়াট্ এ হরিব্‌ল্ সাইট্ ইজ্ ভাট্! হু—দি-ডেভিল্ হাজ্ কিল্‌ড্ হিম্?

লীলা যেন বজ্রাহত। তার হাত-পা অবসন্ন। বার বার তার কানের ভিতর একটিমাত্র ভীতি-বিহ্বল চিৎকার ধ্বনিত হচ্ছিল—'হু—দি ডেভিল্ হাজ্ কিল্‌ড্ হিম্?' অখণ্ড-হিন্দুস্থান যেন অবিকম্পিত সুরে,

সহস্রকণ্ঠে লীলাকে জিজ্ঞাসা করছিল—হু—দি ডেভিল হ্যাজ্ কিল্ড্ হিম্? তরুণও কি আজ ওই রাঙা-রবির মত অস্তগামী?

রায়মশাইয়ের কুটিরের বারান্দায় তরুণের মাথাটা কোলে রেখে—অরুণ ব্যাণ্ডেজ বাঁধ্‌ছিল। লীলার চোখে জল ছিল না। সে শুধু নির্নিমেষ চোখে চেয়েছিল—তরুণের রক্তহীন পাণ্ডুর মুখের দিকে।

হঠাৎ আবেগ-কম্পিত স্বরে লীলা জিজ্ঞাসা করলো—অরুণবাবু! আপনার বন্ধুকে কি বাঁচাতে পারবেন?

—নিশ্চয়ই পারবো। অরুণ দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌লো। আমি যখন এসে পড়েছি—তখন তরুণকে কি এভাবে মরতে দিতে পারি? রক্তস্রাবে হার্টের কন্‌ডিশান্ খুব খারাপ হ'য়ে পড়েছে বটে—কিন্তু, ভয় কি লীলা! তুমি আর আমি, দুজনাই তো রক্ত দেবো? তবু কি তরুণ বাঁচ্‌বে না? নিশ্চয়ই বাঁচ্‌বে······

*   *   *   *   *

অরুণের অক্লান্ত চেষ্টায়—ছ'মাসের মধ্যেই তরুণ সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লো। মাথার ক্ষতটা বাইরে শুকিয়ে গেলেও—ভিতরটাকে ওলট্-পালট্ ক'রে দিয়েছিল সেই লাঠিটার নির্মম আঘাত। তরুণের রাজনৈতিক মতবাদ এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। রায়মশাই অবাক হ'য়ে শুন্‌লেন—একদিন এক জনসভায় তরুণ বক্তৃতা করছে—"বলং বলং—বাহুবলম্! চাই গোলা-বারুদ—চাই ব্লাডি-রিভলিউশান্······

পুলীশ তাকে বেশী সময়—এ মতবাদ-প্রচারের সুযোগ দিল না। হাতে দড়ি-বেঁধে টেনে নিয়ে গেল থানায়। আবার তরুণ শ্রীঘরে। মাস খানেক আগে অরুণও চ'লে গেছে সিঙ্গাপুরে। লীলাও তার পড়ার ঘরে

বসে—তরুণের ফটোগ্রাফার দিকে চেয়ে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে আজ……

এমন সময় মিসেস্ ম্যানিক এসে লীলার পাশে দাঁড়ালেন। আদর ক'রে গায়ে হাত বুলিয়ে, ভাঙা ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন—লীলা-দেবি! আমার সঙ্গে যাবে?

—কোথায়?

—হামি ডাব্‌লিন্ যাচ্ছে—সেখান থেকে বেরিয়ে সারা-ইউরোপ ঘুরবে। তারপর যাবে আমেরিকায়। সভ্যজগতের কাছে পেশ করবে ভারতের দাবী। আমার বিশ্বাস—বাইরের সাহায্য ছাড়া ভারতের মুক্তি ওসম্ভব। যুবকরা জেল খাট্‌ছে—ফাঁসি-কাঠে ঝুল্‌ছে কিন্তু সবই কি ব্যর্থ হোচ্ছে না—'ডিভাইড্‌-এণ্ড-রুল' পলিসির কাছে? ভারতীয়-গৃহ-বিবাদের মধ্যস্থতা করবার সাধু-উদ্দেশ্য নিয়ে যতদিন কোনো তৃতীয় সহৃদয় ব্যক্তি—অভিভাবক সাজ্‌বার সুযোগ পাবেন—ততদিন ভারতের নাবালকত্ব ঘুচ্‌বে না। ভারতের অন্তর্দ্বন্দ্বেরও কোনো মীমাংসা হোবে না……

হঠাৎ লীলা সাগ্রহে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লো—আমি যাবো, আমি যাবো! আমার বুকের জ্বালা নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরবো, আর দেশে দেশে প্রচার করবো—পরাধীন-ভারতের দুর্গতির ইতিহাস! আপনি দয়া করে আমাকেও সঙ্গে নিন্…

মিঃ ম্যানিক প্রতিশ্রুতি দিলেন—লীলা ও মিসেস্ ম্যানিকের এই মিশনের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করবেন তিনি।

কল্‌কাতার কোনো শো-হাউসে তখন—রাজবন্দী তরুণ ব্যানার্জির 'তরুণের স্বপ্ন' দেখানো হচ্ছিল। জাহাজে চাপ্‌বার আগের দিন

ছুটীর শোতে—লীলার সঙ্গে মিসেস্ ম্যানিকও দেখ্তে গেলেন—'তরুণের স্বপ্ন' !

* * * * *

(তরুণের স্বপ্নের প্রথম পর্ব্ব হ'লো—এইখানেই শেষ। দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হ'লো রাণী আর অসীমাকে নিয়ে। কারণ, তরুণ জেলে, লীলা ইউরোপে, আর অরুণ সিঙ্গাপুরে। দ্বিতীয়-পর্ব্বেই তারা ফিরে আসবে, তৃতীয় পর্ব্ব রচনার উদ্দেশ্যে।

